জ্ঞানসম্পূট গ্রন্থমালা

সহজ কথায় বিজ্ঞান

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

সহজ কথায় বিজ্ঞান

জ্ঞানসম্পূট গ্রন্থমালা

সম্পাদনা—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সহজ কথায় বিজ্ঞান

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর ; রেজিস্ট্রার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ; সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ; কন্‌সালট্যান্ট, এন. সি. ই. আর. টি., (নিউ দিল্লী)

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
মাঘ, ১৩৯৫ : জানুয়ারি, ১৯৮৯

মূল্য : **২৫ টাকা**

বাজারের কাগজে ছাপা

মুদ্রাকর
আর. বি. মণ্ডল
ডি. বি. প্রিণ্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দের উদ্দেশে

ভূমিকা

বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রথিতযশা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সহজ কথায় বিজ্ঞান' পুস্তিকার ভূমিকা লেখার জন্য আহূত হয়ে কিছু বিব্রত বোধ করছি। কারণ সাহিত্য ও রসশাস্ত্র নিয়েই আমার জীবন কেটেছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল থাকলেও এ জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র নেই। সম্প্রতি মডার্ণ বুক এজেন্সীর প্রবর্তনায় "জ্ঞানসম্পূট" নামে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভাষা-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে যে গ্রন্থমালার পরিকল্পনা করা হয়েছে, শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি তার অন্তর্ভুক্ত করে আমরা আনন্দিত হয়েছি। এই পুস্তকের ভূমিকা লেখার জন্য আমার ডাক পড়েছে, এ আমার দুর্লভ সৌভাগ্য। এ-ব্যাপারে আমি "অনধিকারী" হলেও রচনার স্বচ্ছগুণের জন্য পাণ্ডুলিপির সবটা পড়ে দেখে যে মানসিক পরিতৃপ্তি পেয়েছি, সেটুকু জানাবার জন্যই এই প্রস্তাবনা। জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক রচনাও রসযুক্ত হতে পারে, যদি তার পরিবেশনার ভার রসিকজনের হাতে পড়ে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়েও শুষ্ক তত্ত্বের কাঠামোয় লাবণ্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন—যেমন পেরেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। সত্যেন্দ্রমোহনের অবলম্বন হচ্ছে যন্ত্রতন্ত্র, হিসাবনিকাশ, সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা—তারই সাহায্যে তিনি বস্তুবিজ্ঞানের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেন, এবং পাঠককেও সেই রহস্য-রোমাঞ্চপূর্ণ জগতে নিয়ে গেছেন।

প্রাচীন ভারতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, প্রায়োগিক বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। উচ্চতর গণিত, জ্যামিতি-পরিমিতি, বীজগণিত—এ-ধরনের বহু বিষয় সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এমন কি পশুচিকিৎসা সম্বন্ধেও একাধিক আয়ুর্বেদ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের পালকপ্য ঋষির 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' হস্তী চিকিৎসার জন্য লেখা হয়েছিল। ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই বিশালকায় জীবটি যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে বিশেষ প্রয়োজনে লাগত। সুতরাং তাকে সুস্থ নিরাময় করে রাখা মালিকের কর্তব্য ছিল। তাই এই গ্রন্থে (সম্প্রতি এটি অসম সরকার প্রকাশ করেছেন) হাতীর অসুখ-বিসুখ ও তার চিকিৎসাপ্রণালী বর্ণিত হয়েছে। এখানে আর একটি কৌতূহলজনক সংবাদের উল্লেখ করি। অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশক থেকে কলকাতায় ইংরেজপ্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রের কাজ শুরু হয়। ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে কলকাতা থেকে *Saloter* নামে অশ্ব সম্বন্ধে

একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রাচীনযুগে সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতগণ 'শালিহোত্র' নামে যে অশ্ববিদ্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখেছিলেন, সম্রাট শাহ্‌জাহানের এক সভাসদ আবদাল্লা খান ফ্রিরোজ জঙ্গ, সংস্কৃত থেকে ফারসিতে এটির অনুবাদ করেন। জোসেফ আর্লস্ (Joseph Earles) সেটির যে ইংরেজি অনুবাদ করেন সেটি ১৭৮৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এর প্রথম পর্বে ঘোড়ার আকৃতি-প্রকৃতি এবং দ্বিতীয় পর্বে তার রোগ ও ঔষধের বর্ণনা আছে। গ্রন্থটি যে কলকাতার 'অশ্বপতি' সাহেব মহলে জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ ১৭৯৯ সালে এটির পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রথম সূত্রপাত করেন শ্রীরামপুরের মিশনারি-সম্প্রদায়। ফেলিক্স্ কেরীর (ডঃ উইলিয়াম কেরীর পুত্র) 'বিদ্যাহারাবলী' (অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা) ১৮২০ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। এটি এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার 'Anatomy' অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। ভাষা ও পরিভাষা মাঝে মাঝে অতি বিকট মনে হলেও বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা বলে এটি স্বীকৃতির যোগ্য। তিনি 'রসায়নবিদ্যা', 'ঔষধ-চিকিৎসা-বিদ্যা', 'ঔষধ-নির্মাণবিদ্যা', 'অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা' প্রভৃতি বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের নানা শাখা সম্পর্কে বাংলায় গ্রন্থ লিখবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যুর জন্য তাঁর সঙ্কল্প অপূর্ণ রয়ে গেছে। শ্রীরামপুর মিশনারি কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক জন ম্যাক্ বাংলা ভাষায় রসায়ন সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেন, সেটি 'কিমিয়াবিদ্যা-সার' (১৮৩৪) নামে প্রকাশিত হয়। আরবি 'আল্ কিমিয়া', ইংরেজিতে 'alchemy' (অর্বাচীন গ্রীক্ ভাষায় 'chemia', প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় 'khemia') থেকে বোধ হয় জন ম্যাক্ 'কিমিয়া' শব্দটি চয়ন করেছিলেন। রসায়নশাস্ত্রকে জনপ্রিয় করবার জন্য তিনি যন্ত্রাদির সাহায্যে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেনের 'ঔষধসারসংগ্রহ' (১৮১৯-২০), মধুসূদন গুপ্তের ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার বাংলা অনুবাদ (১৮৪৯), 'এনাটোমী' (শারীরবিদ্যা—১৮৫৩) প্রভৃতি পুস্তকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসাপদ্ধতি কোথাও সরল বাংলায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কোথাও-বা সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্তের 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬), ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' (১ম—১৮৫৮, ২য়—১৮৫৯), রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'প্রাকৃত ভূগোল' (১৮৫৪) প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকাও উল্লেখযোগ্য। এমন কি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ-

ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন, তার প্রমাণ 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' (১৮৯১)। ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনায় মগ্ন থাকলেও তিনি এই পুস্তিকায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও পৃথিবীর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সরল ভাষায় আলোচনা করেছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ তিনি কনিষ্ঠ পুত্র বালক রবীন্দ্রনাথের মনেও সঞ্চার করেছিলেন। প্রোক্টরের জ্যোতিষ-গ্রন্থের মূল বিষয় তিনি বালক রবীন্দ্রনাথকে মুখে মুখে শেখাতেন, ভূ-বৃত্তান্তও শেখাতেন। বালকবয়সী রবীন্দ্রনাথের এমন দু-একটি রচনা কিছু সংশোধিত হয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁর নাম ছিল না—পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিশুদ্ধ সাহিত্যিকও বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছিলেন—'বিজ্ঞানরহস্যে' (১৮৭৫) তার চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে। বিজ্ঞানের নানা শাখার প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর কৌতূহল ক্রমেই বর্ধিত হচ্ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বৃদ্ধ বয়সে 'বিশ্বপরিচয়ে' তাঁর বিশেষ আকর্ষণ রেখে গেছেন। জগদানন্দ রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—এঁরা বৃত্তিতে বিজ্ঞানের শিক্ষক ও গবেষক হলেও বৈজ্ঞানিক রচনায় সাহিত্যের রস ফুটিয়ে তুলেছেন। ক্রমে একালে বিজ্ঞানে-আকৃষ্ট অনেক লেখক বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে ছোটবড়ো পুস্তক লিখছেন—অবশ্য তার অধিকাংশই স্কুল-কলেজের পাঠার্থীদের দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত। এখনও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা ও মৌলিক রচনা শুরু হয়নি। গবেষণাদি যাও হয় তাও ইংরেজিতে। ফলে বাংলা যাঁর মাতৃভাষা এবং যিনি ইংরেজিতে ততটা দক্ষ নন, তাঁকে বিজ্ঞানের আলোচনায় বড়োই বিব্রত হতে হয়। যে সমস্ত বালপাঠ্য বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তিকা লেখা হচ্ছে তার থেকে এখনো স্কুলঘরের শাসন ঘোচেনি। পরীক্ষা-বৈতরণী পার করানো ছাড়া তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ও উদ্যোগে বিশ্বভারতী থেকে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের যে আয়োজন করা হয়েছিল এখন তার গতিবেগ স্তিমিত হয়ে এসেছে, অনেক পুস্তিকার আর নতুন সংস্করণও প্রকাশিত হয় না। ফলে উৎসাহের অভাবে সহজ ও সরল ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ রচনায় বড়ো কেউ উৎসাহিত হন না। যাও-বা হন, তাও ইংরেজি পপুলার সায়েন্সের অনুকরণ বা অনুসরণ। অতিশয় অসার 'কমিক্‌স্'-এর মতো বিজ্ঞানকেও যদি 'অরণ্যদেবের' পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয় তা হলে এই সমস্ত "সরল তরল অতীব প্রাঞ্জল" অপদার্থ রচনা শিশুপালবধের উপযুক্ত মুষল বলেই পরিগণিত হবে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ আপাতত তোলা থাক।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও মানবিকী বিদ্যাকে দুই গ্রহের পৃথক্ জীব বলে

ধরা হয়ে থাকে। ফলে যিনি সাহিত্যরসে মগ্ন, তিনি বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীন। অথচ একালে আমরা বিজ্ঞানরাজের খাস তালুকের প্রজা। তাই সাধারণ কৌতূহলী পাঠকের মনের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় 'সহজ কথায় বিজ্ঞান' শীর্ষক স্বল্পায়তন পুস্তিকায় বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বগুলিকে সহজ কথায় বিবৃত করেছেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিজ্ঞানের পরিভাষা, সংখ্যাতত্ত্বের জটিলতা, অঙ্কের হিসাবনিকাশ, চালচলন আয়ত্ত করা সহজ ব্যাপার নয়। পদার্থবিজ্ঞান আজ এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও তাত্ত্বিকেরাও সব সময়ে তার নাগাল ধরতে পারছেন না। স্মতরাং সাধারণ পাঠকের কাছে বিজ্ঞান যদি বিভীষিকার বেশে উপস্থিত হয় তা হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় যেভাবে বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তাঁকে শুধু একজন বিজ্ঞানতাত্ত্বিক লেখক বললেই তাঁর সম্বন্ধে সব কথা বলা হল না, তাঁর রচনার রমণীয় গুণের জন্য তাঁকে "রূপদক্ষ" বলতেও আপত্তি নেই।

বিজ্ঞান একান্তভাবে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তির কার্যকারণাত্মক শৃঙ্খলে বিজ্ঞানের সব শাখাই বাঁধা, এবং এই যুক্তিবাদ গড়ে ওঠে বিশ্ববীক্ষার দ্বারা। অভিজ্ঞতাই সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের আদি উৎস। অবশ্য শুধু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারাই বিশ্ববস্তুর মর্মমূলে প্রবেশ করা যায় না। অভিজ্ঞা, সজ্ঞা, অনুমিতি ও কল্পনার সাহায্য ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের মৌলিক রহস্য সব সময়ে ধরা পড়ে না। তাই বিজ্ঞান সম্পর্কীয় লেখককেও কিয়দংশে শিল্পী হতে হয়। গুহাহিত তত্ত্বকথায় সাধারণ পাঠকের আকর্ষণ থাকার কথা নয়—যদি তাকে মনোহারী করে না বলা যায়। তত্ত্বের ভাবমূর্তি সৃষ্টি না হলে তা মানুষের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বিজ্ঞানীর মধ্যে যে শিল্পীসত্তা আছে, তার কাজ হচ্ছে তত্ত্বকে রূপময় করা, নির্বস্তুকে বস্তুপ্রতীতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সে দুর্লভ শক্তি সব বিজ্ঞান-লেখকের থাকে না। বলা বাহুল্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীমুখে তত্ত্বের সঙ্গে শিল্প-চেতনাও জড়িয়ে গেছে। ফলে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিজ্ঞানতত্ত্ব উপলব্ধিগোচর হতে পেরেছে। কিন্তু সেজন্য তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে কবিত্ব করতে হয়নি। তাঁর কলম স্বাভাবিক-ভাবেই তত্ত্বের কাঁটাবন ছেড়ে কল্পকাননে প্রবেশ করেছে। এইটি পাঠকের উপরি পাওনা, তা সে চন্দ্রাভিযান, আলোক-বিজ্ঞান, শক্তি, তরঙ্গপ্রবাহ, বিদ্যুৎ—যাই হোক না কেন। ব্যাখ্যার জল মিশিয়ে কখনো কখনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সহজ করার দিকে কোনো কোনো লেখকের বিশেষ ঝোঁক থাকে। তাতে তত্ত্বের গুরুত্ব

হ্রাস পায় এবং ব্যাখ্যাও তীক্ষ্ণতা হারায়। আমাদের সৌভাগ্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় সে রকম কোনো 'সহজিয়া' পন্থা গ্রহণ করেননি।

সর্বশেষে আর একটি কথা উল্লেখ করি। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় পদার্থবিজ্ঞানের অনেক জটিল তত্ত্ব এমন সহজ ও সরসভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যার সামান্যতম কৌতূহল আছে, সে-ও অজ্ঞাত ব্যাপার সম্বন্ধে প্রশ্নমনস্ক হয়ে উঠবে। সংশয় থেকেই সিদ্ধান্তের জন্ম। মনে যথার্থ প্রশ্ন জাগলে যথার্থ উত্তরও মিলে যায়। পুস্তকটি পাঠকের মনে নিশ্চয় নানা প্রশ্ন জাগিয়ে তুলবে, এবং প্রশ্ন জাগিয়ে তুললেই লেখক সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু যে-বিষয়টি আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে তা হচ্ছে পাশ্চাত্য মতের জ্ঞানময় বিজ্ঞান ও ভারতীয় অধিবিদ্যাজাত বিজ্ঞানময় সত্তাকে মিলিয়ে দেবার অসাধারণ দূরদৃষ্টি। উপনিষদ ও অন্যান্য মোক্ষশাস্ত্রে 'পরাবিদ্যা' ও 'অপরাবিদ্যা'র উল্লেখ আছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে —"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"—অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু পার হয়ে বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করতে হবে। অবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল **profane knowledge**, অর্থাৎ ভৌমজ্ঞান, যে-জ্ঞান ভূমিকেই চেনায়, ভূমাকে চেনাবার তার কোনো সামর্থ্য নেই। বিদ্যা বা পরাবিদ্যা হচ্ছে রাজবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মসাযুজ্যই জীবের লক্ষ্য। কিন্তু অপরাবিদ্যাকেও পরিত্যাগ করা যায় না। জীবন-ধারণের জন্যই অপরাবিদ্যার অনুশীলন প্রয়োজন। যেমন—চিকিৎসাশাস্ত্র, পূর্তবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান—এসবই জড়বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং এদের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার আত্মিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু পঞ্চভূতাত্মক দেহ যতই ষড়ায়তনবন্দী হোক না কেন, তাকে বাদ দিয়ে কোনো সাধনাই চলতে পারে না—না ধর্ম, না মোক্ষ। শরীরটিই সর্বসাধনার মূল ভূমি, ধর্মসাধনা তার পরে—উপবাসক্ষীণ বুদ্ধদেব সেই সত্যটি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, এবং সুজাতাপ্রদত্ত পরমান্ন আহার করে শরীরে বল পেয়েছিলেন, তার পর ব্রহ্মবিহারে স্থিত হয়েছিলেন। সেই দেহকে সুস্থ ও নীরোগ না রাখলে ব্রহ্মসাধনাই বা কীভাবে সম্ভব হবে ? তাই মৃত্যুকে জয় করতে হলে অবিদ্যার অস্ত্রাঘাতেই তাকে বিবশ করতে হবে।

আসলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে আবরণ ভঙ্গ করতে করতে ভারতীয় মতের 'বিজ্ঞানে' পৌঁছে যায়, বস্তুদর্শন আত্মদর্শনে পর্যবসিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজা বস্তুতত্ত্ববিদ্যাবাগীশকে বলেছিলেন, "তোমার বিদ্যে তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে আর একটা দেয়াল বের করেছে। কিন্তু প্রাণপুরুষের অন্দরমহল কোথায় ?" পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেন চীনে ছুতোরের তৈরি কাঠের বাক্স, একটা ডালা

খুললে আর একটা ডালা, সেটি খুললে আর একটি ডালা। শেষ ডালাটা খুলে "প্রাণপুরুষের অন্দরমহল" আবিষ্কার করেছেন ভারতের ক্রান্তদর্শী ঋষিগণ, যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি বস্তু ও অবস্তুর প্রাচীর ভেদ করতে পেরেছে। বিজ্ঞানী যখন দেখেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি বিশিষ্ট ছন্দের বন্ধনে চলেছে, রবি-শশী ছন্দের তারেই বাঁধা, তখন তিনি এই ভেবে আশ্বস্ত হন যে, বিজ্ঞান ও দর্শন পৃথক্ কোনো ব্যাপার নয়, পদার্থ-বিদ্যাই অ-পদার্থবিদ্যায় পরিণত হয়। এইখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন। একালে বিজ্ঞান-দার্শনিকগণ বিচিত্র বস্তুপুঞ্জের মধ্যে সেই ঐক্যকেই খুঁজছেন, উপনিষদের ঋষিরা যাঁকে স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে ওষধি-বনস্পতিতে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়েছিলেন—যিনি একাধারে অন্তর্নিবিষ্ট ও বহির্ব্যাপ্ত, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ, স্থূল ও সূক্ষ্ম, অণুর চেয়েও অণু, বৃহতের চেয়েও বৃহৎ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বোধহয় বস্তুসাগর মন্থন করে এতদিনে কৌস্তুভ রতনটিকে খুঁজে পেয়েছে। Physics ক্রমে Metaphysics এবং সেখান থেকে আত্মদর্শনে (রাধাকৃষ্ণন যাকে বলেছেন 'soul sight') পৌঁছে যায়, যেমন হয়েছিল রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মনোলোকে। বর্তমান আলোচনায় অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় সেই দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করেছেন। বস্তুতঃ বস্তুতত্ত্ব থেকে চৈতন্যে পৌঁছাতে গেলে যে অন্তশ্চেতনার প্রয়োজন শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন গ্রন্থসমাপ্তির দিকে। জিজ্ঞাসু পাঠক যদি ঘূর্ণির মাঝখানে স্থিরবিন্দুটি আবিষ্কার করতে পারেন তা হলেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে, সুকৃতিবান পাঠকও ধন্য হবেন।

১৩৯৫/১৯৮৯ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নকালে আমাদের দেশে science education বা বিজ্ঞানশিক্ষার গুরুত্বের কথা বারংবার আলোচিত হয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনার প্রসারকল্পে কিছু কিছু প্রকল্পও রচিত হয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলি তেমন প্রলপ্রসূ হয়েছে কিনা তা ভেবে দেখা উচিত।

ভারতীয় ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনার সঙ্গে প্রকৃত বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই, তা থাকতেও পারে না। তথাপি একদিকের বৃথা অহঙ্কার অন্যদিকে অকারণ মতানৈক্য সৃষ্টি করে। ফলে, আধুনিক বিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল তা তেমন গড়ে ওঠেনি। কোন্ উপায়ে এই আপাত-বিরোধের অবলুপ্তি ঘটে এবং জনমানসে বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বিত রূপটি পরিস্ফুট হয় সেবিষয়ে অনুশীলনের প্রয়োজন আছে।

স্কুলকলেজে প্রচলিত পাঠক্রমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু যেহেতু বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় পঠনপাঠন অনেকাংশে পরীক্ষা-মুখী অর্থাৎ পরীক্ষায় পাশ করাটাই বড় কথা, সেজন্য মৌলিক ধারণা সঞ্চয়ে বা উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে তেমন গুরুত্ব আরোপিত হয় না। ফলে খণ্ড তথ্য, ফর্মুলা, পারিভাষিক শব্দ ইত্যাদির ভিড়ে বিজ্ঞানচিন্তার মূল স্রোতটি যেন চাপা পড়ে যায়। অথচ খণ্ড জ্ঞানের অন্তরালে প্রকৃতিপরিচয়ের যে ধারাবাহিকতা বিরাজমান, তার সন্ধান না পেলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে কয়েকটি বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে সেগুলিকে যথাসম্ভব সহজ কথায় প্রকাশ করতে চেয়েছি এই গ্রন্থে। স্বল্প পরিসরে বিভাগ-বিশেষের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভবপর নয়, সে-চেষ্টাও করিনি। স্বল্পসংখ্যক তথ্য ও অনুমান সহায়ে বিজ্ঞান-বিকাশের একটা পথরেখা মাত্র উপস্থিত করেছি। গ্রন্থ-রচনার কাজে কোনো বাঁধা-ধরা ছকে অগ্রসর হইনি। তার পরিবর্তে আলোচ্য বিষয়বস্তুমধ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণের পথ বেছে নিয়েছি। জানি না, এই ব্যতিক্রম সকলের কাছে ভাল লাগবে কিনা। তবে দীর্ঘ অধ্যাপক-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবেশ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা অনেক ক্ষেত্রে উপভোগ্য হয় এবং ধারণা সঞ্চয়ে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞানকে কয়েক টুকরো অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায় না, আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেটি অনুচিতও

১

প্রস্তাবনা

—আগ্রহবোধ ও জিজ্ঞাসা—

বর্তমান যুগে মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে যে-সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে, সেগুলির অধিকাংশের মূলে আছে বিজ্ঞান। প্রচলিত অর্থে বিজ্ঞান হচ্ছে ইংরেজি 'সায়েন্স' নামক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ, যদিও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রাদি অনুযায়ী বিজ্ঞানের অর্থ ও তাৎপর্য অন্যরূপ।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে-অগ্রগতি প্রায় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, তা অনেকাংশে ঐ সায়েন্স বা বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক বিকাশ সাধনের জন্য নব নব উপায় উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার সুদূর অতীতকাল থেকেই ঘটে আসছে সত্য, কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে সেই প্রসারগতি যেন অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে মূলতঃ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের প্রভাবে। সুতরাং সমাজ-সচেতন মানুষের পক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ধারণা সঞ্চয়ে আগ্রহান্বিত বোধ করা খুবই স্বাভাবিক।

এই আগ্রহবোধের মাত্রা কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। কারো কম, কারো বেশী। এমন অনেকে আছেন, যাঁদের কাছে বিজ্ঞানের কাণ্ড-কারখানা একটা বিস্ময় মাত্র। দেখে শুনে তাঁরা অবাক হন, এই পর্যন্ত। নিত্যনূতন বিস্ময়ের দিগন্তপানে তাঁরা তাকিয়ে থাকেন বটে, কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি সৃষ্ট হয় না তাঁদের মনে। আবার, অন্য এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁদের মধ্যে জাগে কৌতূহল। ঔৎসুক্যের বশবর্তী হয়ে তাঁরা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পরিচিত হতে চান। এঁদের আগ্রহ একটা সহজলভ্য জ্ঞানের পরিসীমায় নিবদ্ধ। কিভাবে কী হয় এটুকু জানতে পারাটাই যেন তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। সংখ্যায় স্বল্প হলেও আরেক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁদের আগ্রহবোধ গভীরতর এবং তা মননশীলতাকে স্পর্শ করে। জাগতিক ঘটনা ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লব্ধ জ্ঞান তাঁদের মনে নিরন্তর জিজ্ঞাসা জাগায়। পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাঁরা জগৎ-পরিবেশকে ঠিকমত জানতে চান, বুঝতে চান জাগতিক কার্য-কারণ সম্পর্ক। এখানেই বিজ্ঞানের সূত্রপাত।

আগ্রহবোধের এই ত্রিবিধ প্রকাশ যথা বিস্ময়, কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসার সঙ্গে

আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। একই মানুষের মধ্যে অনেক সময় একসঙ্গে এই তিনের খেলা চলে। ফলে বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণ ঘটতে দেখা যায়। এগুলিকে এক অর্থে বলা চলে স্বভাবজ সংস্কার। এদের মধ্যে যে-কোনো একটির আধিক্য বা প্রবণতা হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সূচক।

প্রবৃত্তিগত এই বিষয়টি বুঝবার জন্য একটা উদাহরণের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। রেডিও বা বেতার যন্ত্র আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মতো এই যন্ত্র। গান গল্প সংবাদ ইতাদি শুনতে শুনতে কেউ বলে ওঠেন, বাঃ বেশ! কোথায় কলকাতা, কোথায় দিল্লী, কোথা হতে কোথায় ভেসে আসছে কথা! কি মজার কল করেছে সায়েন্স! এর নাম বিস্ময়।

দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি যন্ত্রটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন এবং ভাবেন, দেখি তো কিসে কী হয়। সুইচটা কখনো 'অন' কখনো 'অফ্' করতে করতে তিনি লক্ষ্য করেন, রেডিও চালাতে হলে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। ইলেকট্রিক সেট হলে লাগে বিদ্যুতের 'লাইন', ব্যাটারী সেট হলে লাগে 'ব্যাটারী'। বেতার যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে তিনি অবগত হন, (১) বিদ্যুৎ ছাড়া রেডিও চলে না, (২) একটা ঘোরানো চাকি বা 'নব' দিয়ে কাঁটাটি সরালে নড়ালে এক একরকম 'সেণ্টার' ধরা যায়, (৩) একটা 'সুইচের' সাহায্যে রেডিওর 'ব্যাণ্ড' পাল্টানো যায়, যথা 'মিডিয়ম', 'শর্ট-১', 'শর্ট-২' ইত্যাদি। (৪) একটা গোলাকার 'নবে'র সাহায্যে আওয়াজ বা শব্দের মাত্রা বাড়ানো কমানো যায়, যাকে বলা হয় ভল্যুম কণ্ট্রোল। (৫) আকাশে মেঘগর্জন হলে বা বিদ্যুৎ চমকালে অনেক সময় তা ধরা পড়ে রেডিওতে, একটা আচম্‌কা আওয়াজ বা কড়কড় শব্দ জানিয়ে দেয় সেই ঘটনা।

বেতার যন্ত্রের এইসব খুঁটিনাটি বা ব্যবহার-কৌশল অবগত হবার অপর নাম কৌতূহল নিবৃত্তি। বুদ্ধিযুক্ত মানুষের মধ্যে এই ঔৎসুক্য অনেকটা স্বভাবগত। এরূপ সচেতনতার মধ্য দিয়ে জড়বস্তুর সঙ্গে সাধারণভাবে মানুষের পরিচয় ঘটে, বাস্তব জ্ঞানের উন্মেষ হয়। কে না জানে নিত্যব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র ব্যবহারেরও একটা সায়েন্স আছে, আছে জানবার অনেক কিছু? কোনো কেতাবী বিদ্যা দিয়ে নয়, নিছক সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই আয়ত্ত করা যায় এ-সব কলাকৌশল, যদি থাকে একটুখানি আগ্রহ, যৎকিঞ্চিৎ কৌতূহল।

আরেক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁদের চিন্তাভাবনা একটু স্বতন্ত্র। ভাবুক প্রকৃতির এইসব মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হয়? তাঁরা ভাবেন, রেডিওর প্রেরক-যন্ত্র বা ট্রান্সমিটার তো আছে অনেক দূরে কোনো কেন্দ্রে, আর গ্রাহক-যন্ত্র

বা রিসিভার আছে নিকটে ঘরে ঘরে। স্থানের এই ব্যবধান বা দূরত্বকে অতিক্রম করছে কে? সে কি শব্দ, না অন্য কিছু? যদি শব্দটাই এত দূরে ভেসে আসত তাহলে কি সেটি এমনভাবে শোনা যেত? শব্দ দূর থেকে আসতে আসতে তো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যায়। বেশী দূরের আওয়াজ আদৌ শোনা যায় না। তাছাড়া, স্থানান্তরে পৌঁছাতে শব্দের সময় লাগে। যে মুহূর্তে কোথাও কাঠের উপর কুঠারাঘাত হয় তন্মুহূর্তে তার শব্দ দূরান্তে শোনা যায় না। অথচ রেডিওতে ইংলণ্ড আমেরিকার মতো দূরবর্তী দেশের গান গল্প নিমেষের মধ্যে শোনা যায় (সময়ের ব্যবধান অতি নগণ্য)। সুতরাং প্রেরক-যন্ত্র থেকে যা বের হয়ে আকাশ বেয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে উপস্থিত হয়, তা শব্দতরঙ্গ হতে পারে না। তাহলে সেটি কী? কেনই-বা তড়িৎ-গতিতে তার আগমন সম্ভবপর? এ-সব প্রশ্ন সেই চিন্তাশীল মানুষটির মনকে আলোড়িত করে।

শব্দ একটি শক্তিবিশেষ। অতএব শব্দের রূপান্তর অর্থে শক্তির রূপান্তর। শক্তি কি স্থান হতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করতে পারে? পারে বৈকি, নতুবা দূরান্ত থেকে বেতার যন্ত্রে শব্দশক্তি ধরা পড়ে কেন? কেনই-বা সেই শক্তি শ্রোতার কর্ণমূলে শব্দ সঞ্চার করতে সমর্থ হয়? কর্ণযন্ত্রটির কোনো বৈশিষ্ট্য আছে নাকি? নতুবা কর্ণকুহরে অবস্থিত কোনো পর্দার সূক্ষ্ম স্পন্দন স্নায়ুবাহিত হয়ে শ্রোতার শ্রবণবোধকে জাগ্রত করে কেন?

এরূপ চিন্তাসমূহ যে-মানুষটির মনে উদিত হয় তিনি হয়ত বৈজ্ঞানিক নন, তাঁর হাতের কাছে হয়ত তেমন কোনো যন্ত্রপাতি নেই যা দিয়ে তিনি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনে যে-জিজ্ঞাসার উদয় হয় তার নাম বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা।

আগ্রহবোধের তারতম্য অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর মানুষ বিস্ময়-বিমুগ্ধ! প্রকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় অনেকটা বাহ্যিক এবং তা শুধু ভাষাভাষা দেখাশুনোর মধ্যেই নিবদ্ধ। সংখ্যায় এরাই বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ যাদের কৌতূহল অনেকটা ব্যবহারিক বুদ্ধি চালিত এবং যন্ত্রাদির উপযোগিতাটুকু যাদের বেশী আকৃষ্ট করে, তারাও সংখ্যায় কম নয়। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ নিঃসন্দেহে সংখ্যাল্প। পারিপার্শ্বিক জগতের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নানাবিধ জিজ্ঞাসার টানে জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে চান তাঁরা। বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত যেন হাতছানি দিয়ে তাদের ডাকে আর বলে, দেখো আমার সীমাহীন বৈচিত্র্য, আর তারই মাঝে অন্তহীন শৃঙ্খলা।

সত্যই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও শৃঙ্খলা, বিভিন্নত্ব ও একত্ব, স্বতন্ত্রতা ও সঙ্গতি

অতীব বিস্ময়কর। এ রহস্য উদ্ঘাটনে শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষ যতই অগ্রসর হতে থাকেন ততই যেন নূতনতর দিগন্ত উন্মোচিত হয় তাঁর সম্মুখে। ফলে অনুশীলনের যেন আর অন্ত থাকে না। প্রাকৃতিক প্রকৃতি-নিরূপণে বৈজ্ঞানিকদেরও অবস্থা অনুরূপ বলা চলে। যতই তাঁরা এগিয়ে যান ততই যেন মনে হয়, পথ এখনো অনেক বাকী!

পদার্থের স্বরূপ-নির্ণয়ে বিগত শতাব্দীসমূহে বৈজ্ঞানিকগণ যখন একে একে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সোনা, রূপা, লোহা, তামা, পারদ ইত্যাদি মৌল বা element-গুলিকে সুচিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন তখন তাঁদের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছিল যে, পদার্থের বিভাজ্যতার শেষ সীমানায় পৌঁছানো গেছে, এবং এটম (atom) বা পরমাণু হচ্ছে পদার্থসমূহের সেই অন্তিম রূপ। বাস্তবিক পক্ষে জন ডাল্টন নামক বিজ্ঞানী (১৭৬৬-১৮৪৪) তাঁর বিখ্যাত atomic theory বা পরমাণুবাদ সাহায্যে তৎকাল অবধি জ্ঞাত তথ্যাদির এমন সুন্দর ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদানে সমর্থ হয়েছিলেন যে, সকলেই সেকালে ভেবেছিলেন পদার্থনিচয়ের জড়ধর্ম সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে। এটম বা পরমাণুর অবিভাজ্যতা হচ্ছে তার ভিত্তি।

কালক্রমে সেই ভিত্তি শিথিল হয়েছে। পরমাণু অবিভাজ্য নয়, তাকে ভেঙে চুরমার করা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কারসমূহ সেকথা সপ্রমাণ করে। লর্ড রাদারফোর্ড (১৮৭১-১৯১৭), নিয়েল বোর (Niels Bhor, ১৮৮৫-১৯৬২) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকবৃন্দ পরমাণু জগতের অন্তঃপুরের সন্ধান দিয়েছেন। আবিষ্কৃত তথ্যরাজি হতে জানা যায়, ডাল্টন-কল্পিত নিরেট ও অচ্ছেদ্য এটমের পরিবর্তে এমন একটি পরমাণুর অস্তিত্ব কল্পনা করতে হবে যার মধ্যে আছে এক বস্তুপিণ্ড (atomic nucleus) এবং সেই পিণ্ডের বহির্দেশে পরিভ্রমণশীল এক বা একাধিক ইলেকট্রনের সমাবেশ।

পরবর্তী কালে বাস্তব পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে, ঐ বস্তুপিণ্ড বা নিউ-ক্লিয়াসও অবিভাজ্য নয়। বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরে নানাবিধ মূলকণা বা elementary particle-এর সন্ধান পেয়েছেন। ঐসব কণার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে এবং একেক রকম কণার ভর (mass), বিদ্যুৎপরিমাণ (charge), ঘূর্ণন (spin) ইত্যাদি নিরূপিত হওয়ায় সেগুলির স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। সেই-সব মিলেই আধুনিক কালের পরমাণুজগৎ—একদিকে জমাট-বাঁধা অণু, পরমাণু ও 'আয়ন' (ion)গুচ্ছের খেলা, অন্যদিকে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থিত মূলকণাসমূহের

বৈচিত্র্যময় আচরণ! এ সবের গুণাবলী বা তাদের বিভিন্নতা স্থূলদৃষ্টিতে তেমন সহজবোধ্য না হলেও সামগ্রিকভাবে বস্তুজগতের যে রূপটি বিজ্ঞানের আলোকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তা থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে,

(১) বস্তুজগতের মূল উপাদান হচ্ছে নানাবিধ মৌলিক পদার্থ (বিজ্ঞানের ভাষায় elements)। একাধিক মৌলিক পদার্থ রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হলে তৈরী করে যৌগিক পদার্থ (compounds)। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের সংযোগ বা সংমিশ্রণে গঠিত হয় বস্তুখণ্ডের পদার্থ অংশ।
[মৌলিক পদার্থের পরিচিত উদাহরণ, সোনা, রূপা, লোহা, তামা, পারদ, অঙ্গার, গন্ধক, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি। যৌগিক পদার্থের উদাহরণ, জল, কার্বন ডাইয়োক্সাইড, লবণ, চূণ, চিনি ইত্যাদি।]

(২) এক একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু-সংগঠন এক এক রকমের। (প্রকৃত-পক্ষে পরমাণু সংগঠনে বিভিন্নতাই রচিত করে মৌলিক পদার্থসমূহের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য।)

(৩) প্রত্যেক পরমাণুতে একাধিক শ্রেণীর 'কণা' বিদ্যমান। কণাসমূহের সাধারণ নাম elementary particle, বিশেষ নাম ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি।

(৪) প্রত্যেক শ্রেণীর কণার গুণাগুণ এক এক ধরনের। অর্থাৎ প্রত্যেক কণার একটি শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য আছে। সেই স্বাতন্ত্র্য দিয়েই সূচিত হয় কণার স্বরূপ।

(৫) কণাসমূহের গুণাগুণ বা আচরণ কিছুটা প্রত্যক্ষভাবে, কিছুটা পরোক্ষভাবে এবং কিয়দংশ কল্পনা সহায়ে নির্ণয়যোগ্য।

(৬) পদার্থের আত্যন্তিক স্বরূপ বা ultimate nature সম্বন্ধে শেষ কথা এখনো বলা যায় না। কেননা, এতৎবিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণার পরিবর্তন অতীতে অবিশ্বাস্যভাবে ঘটেছে, বর্তমানে ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা ঘোষণা সম্ভবপর নয়।

শেষোক্ত সিদ্ধান্ত চাঞ্চল্যকর, সন্দেহ নেই। প্রকৃত বিজ্ঞানীদের মধ্যে যদিও কোনো 'সব-জান্তার' অহংকার নেই, আধুনিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট সচেতন, তথাপি সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণাটি বেশ প্রচলিত যে, বিজ্ঞান দিয়ে জগতের সবকিছুর সবটুকু নির্ভুলভাবে জানা যায়। বস্তুকণার আত্যন্তিক সত্তা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর জ্ঞান আজও সীমিত। অন্যান্য তাত্ত্বিক বিষয়েও

'**not yet understood**' বা এখনো-অজানা অংশের বহর কম নয়। তাই এই পরিস্থিতি সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানীকে একদিকে যেমন অহংকারশূন্য বা আস্ফালনহীন করে, অন্যদিকে তেমনি তাকে প্রকৃতির রহস্যভেদে প্রতিনিয়ত ধাবমান রাখে। যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এই উভয়মুখী সচেতনতা থেকেই সঞ্জাত হয়। সুতরাং পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটি অস্থিরতাসূচক হলেও যথেষ্ট ফলপ্রসূ।

বদ্ধধারণা বা **prejudice** মুক্ত মন নিয়ে, নিবিড় অনুশীলনের পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছেন এ যুগের বৈজ্ঞানিকবৃন্দ। উদ্দেশ্য, বস্তুবিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্যের অনুসন্ধান। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের নিকষ পাথরে বারংবার যাচাই করে নেন তাঁরা আপন আপন ধারণার সত্যতাকে। এইভাবে প্রাপ্ত তথ্য বা ঘটনাবলীর সঙ্গে কিছু গণনা, কিছু অনুমান এবং কিছুটা কল্পনার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের ইতিহাস। সে-ইতিহাস কম চমকপ্রদ নয়। প্রকৃতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হতে আকস্মিক-ভাবে চোখে-পড়া অনেক ঘটনা, অথবা চিন্তাকুল মনে হঠাৎ-জেগে-ওঠা অনেক 'আইডিয়া' আবিষ্কারসমূহের পথকে সুগম করেছে সত্য, কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, মূলতঃ বিজ্ঞানের অগ্রগতি অনেক পরিমাণে তাত্ত্বিক অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল।

যে-সকল বৈজ্ঞানিকের কর্মক্ষমতা, দূরদৃষ্টি এবং সর্বোপরি বুদ্ধিমত্তার ফলে আধুনিক বিজ্ঞান এতখানি সমৃদ্ধ, তাঁরা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন মানবের ইতিহাসে। যে-বিদ্যুতের ব্যবহার আজ পৃথিবী-ব্যাপী ও যুগান্তসৃষ্টিকারী সেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপায়পন্থা নিরূপণের মূলে আছে মাইকেল ফ্যারাডের (১৭৯১—১৮৬৭) তাত্ত্বিক অনুশীলন। জড় ও শক্তি, **matter and energy**, এ দুয়ের যে পারস্পরিক সম্পর্ক এককালে মনীষী আইনস্টাইনের তাত্ত্বিক কল্পনায় সঞ্জাত হয়েছিল। তারই ভিত্তিতে মানুষ পেয়েছে আণবিক শক্তির উৎস। আপাতদৃষ্টিতে সেদিন আইনস্টাইনের অনুমানসমূহ ও অঙ্কপাত নেহাত কল্পনা-বিলাস মনে হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর ধারণাগুচ্ছ শুধু বাস্তব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রমাণিত হয়নি, তা দিয়ে সমগ্র পদার্থবিদ্যায় এক উচ্চাঙ্গ ভাবান্তর ঘটেছে, স্থান ও কালবিষয়ে অভিন্নত্ব স্থাপিত হয়েছে এবং এক কথায় তা বিজ্ঞানদর্শনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের এইসব কথা ও ইতিবৃত্ত জানবার আগ্রহ অনেকের মনে জাগে। কিন্তু এ-বিষয়ে অগ্রসর হবার পথে একাধিক বাধা উপস্থিত হয়। প্রথমত, স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সকলে পায় না। দ্বিতীয়ত, ঐসব শিক্ষায়তনে বিজ্ঞান বিষয়ে যেটুকু শেখানো-পড়ানো হয় তা অনেকাংশে শুধু পরীক্ষা

পাশের বাঁধাধরা পাঠক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে, গভীরতর জিজ্ঞাসা পূরণের বা মৌলিক তত্ত্ববিকাশের দিকটি শিক্ষার্থীর কাছে ঠিকমত উন্মোচিত হয় না। তৃতীয়ত, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের পক্ষে বৈজ্ঞানিক ভাষা ও শব্দসমূহ বড়ই দুরূহ মনে হয়। এ-সব যেন সাধারণের বোধগম্য নয়, এরূপ একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায়।

এই ভ্রান্তি নিরসনের জন্য অতীতে অনেকেই চেষ্টিত হয়েছেন। বিজ্ঞান বিষয়ে সুলেখক বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকবৃন্দের রচনাসম্ভার একদিকে যেমন বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করেছে, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান-চিন্তার প্রসার ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস সেই দৃষ্টিতে অনুধাবনযোগ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আমাদের দেশে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে বিদেশী মিশনারীগণ নানাবিধ পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে-ছিলেন সত্য, কিন্তু এ-বিষয়ে প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)।

জনপ্রিয়তা সৃষ্টির অন্যতম উপায় হচ্ছে জাতীয় জীবন ও দেশীয় ভাষার সঙ্গে আলোচ্য বিষয়বস্তুর ও ভাবধারার সংযুক্তিকরণ। এ-বিষয়ে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সূত্র ও তথ্যসমূহকে শুধু যে ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি সুনিপুণভাবে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন তাই নয়, পরন্তু তাঁর প্রতিভাস্পর্শে বিজ্ঞানচিন্তা যেন সাহিত্যচর্চার নামান্তর হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞানসাহিত্য রামেন্দ্র-রচনাবলী যেমন সুখপাঠ্য তেমনি ভাব-গম্ভীর, যেমন তথ্যনিষ্ঠ তেমনি সাহিত্যরসপুষ্ট।

আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বাদি পরিবেশনে ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একটা মিলনক্ষেত্র রচনার খুবই প্রয়োজন ছিল তৎকালে। কেননা, জড় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিগত দুই শতাব্দীতে অসামান্য সাফল্যলাভের ফলে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে এমন একটা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বা mechanical view গড়ে উঠেছিল যার প্রভাবে ভারতীয় দর্শনচিন্তা বা আত্মিক প্রত্যয়াদি বিষয়ে ভারতবাসীর মনে যেন একটা সংশয় ও হীনমন্যতা এসে পড়েছিল। সায়েন্স বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র যে সীমাবদ্ধ, জড়-জগৎ ও মানবজীবনের সব কিছু যে যন্ত্রবৎ বোধগম্য হতে পারে না, এই মৌলিক সত্যটুকু বিস্মৃত হয়ে সে-সময় এদেশের অনেকে পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক অগ্রগতিতে মোহিত হয়ে পড়েছিলেন এবং ভাবতে শুরু করেছিলেন ঐ দৃষ্টিভঙ্গিই সঠিক, আর দর্শনাদি বিচার অলীক। সুতরাং এই বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য অর্থাৎ জড়-

বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে দার্শনিক চিন্তাভাবনা দিয়ে পরিমার্জিত করে নেবার জন্য সেকালে লেখনী ধারণের প্রয়োজন ছিল। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর সেই কর্তব্য পালন করেছিলেন সমুচিতভাবে।

আজও সে-প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। বহুমুখী যান্ত্রিক সাফল্যের উল্লাসে বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য থেকে যাতে বিচ্যুতি না ঘটে, প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের তাত্ত্বিক অভিপ্রায়টুকু যাতে অবহেলিত না হয় তার জন্য সতর্কবাণী অবশ্যই উচ্চারিত হওয়া উচিত। প্রযুক্তি-সাফল্য ও তাত্ত্বিক-বিকাশ যে এক কথা নয় এবং সেই কারণে science ও technology সমার্থক নয়, এটি বুঝতে হবে ও বোঝাতে হবে। যান্ত্রিক চমৎকারিত্ব কখনোই সূক্ষ্ম বিচারের বিকল্প হতে পারে না। প্রকৃত বিজ্ঞান-চর্চায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সহায়ক হতে বাধ্য।

গ্যালিলিও-নিউটনের যুগ হতে অদ্যাবধি বিজ্ঞানের চিন্তাজগতে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্লাঙ্কের কোয়াণ্টাম তত্ত্ব, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, হাই-সেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ প্রভৃতি বহুবিধ তত্ত্বের সমাহারে বিশ্ব পরিচয় নূতন আলোকে উদ্ভাসিত। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে প্রচুর। ফলে বস্তুকণার গতিপ্রকৃতি নিরূপণ, শক্তির বিকিরণ, স্থান ও কালের আপেক্ষিক সম্পর্ক, কণাবৎ ও তরঙ্গবৎ সত্তার বিচার ইত্যাদি শুধু বৈজ্ঞানিকের নয় পরন্তু সকল চিন্তাশীল মানুষের কাছে এক চ্যালেঞ্জ বা আকর্ষণীয় অভিযান স্বরূপ। বস্তুজগতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এসে পড়েছে দার্শনিক বিচার, concepts বা ধারণাসমূহের পুনর্মূল্যায়ন।

সেই অভিযানের সহায়তাকল্পে বুদ্ধিযুক্ত মানুষের মধ্যে সঠিক বিজ্ঞান চেতনার প্রসার ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। স্কুল-কলেজের বাঁধাধরা ছকে নয়, উচ্চাঙ্গ গবেষণার গলিপথেও নয়, এক অনুভবমূলক সাধারণ বুদ্ধির ভিত্তিতে বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বসমূহ পরিবেশিত হওয়া উচিত। বর্তমান গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়সমূহ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচিত।

২

একটি সফল অভিযান

—চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ—

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে যখন চন্দ্রাভিযান সফলতা লাভ করে, অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ আকাশ-ভেলায় চড়ে মহাশূন্যে বিচরণপূর্বক চাঁদের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করতে সমর্থ হয়, তখন সঙ্গত কারণেই সারা পৃথিবীতে ধন্যধন্য রব উঠেছিল। এতদিন যা ছিল কল্পনায় নিবদ্ধ, মানুষের বুদ্ধিবলে তা বাস্তবে পরিণত হয় ঐ সময়ে। এর ফলে একদিকে যেমন আকাশ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল প্রবল আত্মবিশ্বাস, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মানুষের মনে জেগে উঠেছিল আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রচুর ঔৎসুক্য।

মনে পড়ে, সে-সময় জনৈক পরিচিত ব্যক্তি একদিন বিস্ময়-ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এত বড় ব্যাপার ঘটে গেল, আমরা কি এর কিছুই জানতে বা বুঝতে পারব না? উত্তরে বলেছিলাম, আগে মনস্থির করুন, জানতে চান, না, বুঝতে চান। শুধু জানার জন্য হলে কোনো সমস্যা নেই। সাময়িক পত্রপত্রিকায় এই রোমাঞ্চকর অভিযানের অনেক গল্পবিবরণ পাবেন। সেগুলো থেকে অনেক **information** বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান মিলবে। তবে যদি ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে চান তাহলে একটু গভীরতর মনোনিবেশের প্রয়োজন আছে।

ব্যক্তিটি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। জানার আগ্রহ ও চিন্তাশীলতা তাঁর যথেষ্ট ছিল। কিন্তু স্কুল-কলেজে কোনোদিন তিনি সায়েন্স পড়েননি। সুতরাং তাঁর মনে দ্বিধা সংকোচ, তাঁর পক্ষে কি এ-সব বিজ্ঞানের ব্যাপার বুঝতে পারা সম্ভব? কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত ক'রে তাঁকে সেদিন বলেছিলাম, পর্যবেক্ষণ-প্রবণতা ও মননশীলতা যার আছে তার কাছে বিজ্ঞান দুর্বোধ্য হতে পারে না।

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় গণিত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা অমূলক ভীতি শিক্ষার্থীর মনকে আক্রান্ত করে। অথচ জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সম্মুখে বিজ্ঞানের সদর দরজা সর্বদা উন্মুক্ত। বিজ্ঞানের অন্দরমহলের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেবার পথে গণিত হচ্ছে একটা গাইড বা সহায়ক মাত্র। সুতরাং গণিতকে বাধা বা বিপত্তি রূপে ভাবার কোনো কারণ নেই। তাকে যতটুকু কাজে লাগানো যায় ততটুকুই স্বস্তি। গণিতের প্রয়োগে বিজ্ঞান-সম্পর্কিত ধারণাকে মার্জিত ও সুসংহত করে নেওয়া চলে। কিন্তু

তার অর্থ এই নয় যে, গণিতের ঝামেলা সকল ক্ষেত্রে পোহাতেই হবে। যার যতটুকু গ্রহণ-শক্তি সে ততটুকু আহরণ করবে গণিতরূপী গাইডের সাহায্য নিয়ে বা না নিয়ে। বিজ্ঞানের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায়, প্রকৃতি ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বহু তথ্যের সন্ধান মেলে যেগুলির বৈজ্ঞানিক মূল্য যথেষ্ট। তথ্যলব্ধ জ্ঞানকে গণিতের সাহায্যে সুসংবদ্ধ আকারে বিন্যস্ত করা যায় এবং তাই দিয়ে তাত্ত্বিক বিকাশের পথকে প্রশস্ততর করা চলে। অতএব যথার্থ অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কাছে বিজ্ঞান ও তৎসংলগ্ন গণিত কখনোই ভয়োৎপাদক হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি বিষয় ঠিকমতো উপস্থাপিত বা পরিবেশিত হলে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক ও জ্ঞান আহরণে লাভজনক হতে পারে।

মনে পড়ে, আগন্তুক ব্যক্তিটি চন্দ্রাভিযানের গল্প শুনতে শুনতে সহজেই গতিবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ গ্রহণে সমর্থ হয়েছিলেন। খাড়া উপরের দিকে vertically upward, কোনো বস্তুখণ্ডকে বেগযুক্ত ক'রে ছুড়ে দিলে সেটি উপরে উঠতে থাকে বটে, কিন্তু ক্রমশঃ তার বেগ মন্দীভূত হয়ে আসে এবং ক্ষণেকের জন্য সেটি উপরে স্থির হয়ে পুনরায় নীচের দিকে ত্বরিতগতিতে নামতে থাকে, এ দৃশ্য বা ঘটনার ছবি হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর আদৌ কষ্ট হয়নি। উৎক্ষেপণের ফলে বস্তুখণ্ডের এই যে ওঠা-নামা, বেগের পরিবর্তন, খাড়া উঁচুদিকে না ছুড়ে অন্যদিকে ছুড়লে গতিপথের বক্রতা (parabolic) এসবের মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক যে নিহিত আছে, একথা অনুমান করতে তাঁর এতটুকু অসুবিধা হয়নি।

উৎক্ষিপ্ত বস্তুর গতিবিধি, পথ-পরিক্রমা ইত্যাদি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হলে অবশ্য নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও অঙ্কপাতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে-সব বিস্তারিত গণিত-প্রয়োগের মধ্যে প্রবেশ না করেও এটুকু সাধারণভাবে বোঝা যায় যে, বস্তুটির ওঠা বা নামা উভয় ক্ষেত্রেই 'মাটির টান' বা পৃথিবীর টান সমভাবে কার্যকরী। মহামতি নিউটন এ-সম্পর্কে একটি সূত্র আবিষ্কার করেন। সেটি Law of Gravitation নামে বিখ্যাত। এই মাধ্যাকর্ষণের ফলে যে-কোনো বস্তুখণ্ড অপর বস্তুখণ্ডকে প্রতিনিয়ত টানছে। টানের পরিমাণ নির্দিষ্ট ; আকৃষ্যমাণ বস্তুদ্বয়ের পারস্পরিক দূরত্বের উপর তা নির্ভর করে। আর নির্ভর করে তাদের mass বা ভরের উপর।

গাছে ঝুলন্ত আপেল ফলটি বৃন্তচ্যুত হলে এবং অন্য কোনোভাবে তার গতি বাধাপ্রাপ্ত না হলে সেটি সোজা নীচের দিকে পড়তে থাকে। মেঘের কোলে জমে থাকা জল-বিন্দু অন্য কোনোভাবে তাড়িত না হলে মাটির টানে সেগুলি মাটিতে পড়তে থাকে। এখানে মাটি অর্থে পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জের সমষ্টি। অঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ

করা যায়, ঐ বস্তুপুঞ্জ যেন পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে অধিগত হয়ে সেই দূরত্ব থেকে অপর জড়খণ্ডকে টানছে। কেন টানে অর্থাৎ কেন এমন আকর্ষণ সঞ্জাত হয় সে কৈফিয়ত নিউটন সাহেব দেননি। তিনি এটিকে পদার্থের ধর্ম (স্বভাব) বলেই চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তী কালে মহামতি আইনস্টাইন এই ব্যাপারের একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত আপেক্ষিকবাদ সহায়ে। ঐ তত্ত্বে পদার্থ-ধর্মের পরিবর্তে কল্পিত হয়েছে স্থান-কাল-সমন্বিত ব্যাপ্তির গুণধর্ম। বস্তুর অবস্থানজনিত বক্রতা সৃষ্টির ফলে বস্তুটি আপনা হতেই পতনশীল হয়।

সে-সব তত্ত্বকথার বিস্তার আগন্তুক ব্যক্তিটির কাছে আদৌ করিনি প্রথম দিকে কেননা, যে-কোনো বিষয় বুঝবার এক একটা ক্রম আছে। এক লাফে যেমন ছাদে ওঠা যায় না, তেমনি প্রথম পদক্ষেপেই তত্ত্ববোধ সম্পূর্ণ হয় না। প্রাথমিকভাবে মাধ্যাকর্ষণ বুঝবার জন্য নিউটন সূত্রই যথেষ্ট। সূক্ষ্ম বিচারের পথে প্রয়োজনবোধে ধারণাগত পরিবর্তন নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তারও একটা পর্যায় আছে, আছে ধারণা সঞ্চয়ের জন্য প্রস্তুতি।

নিউটনের সূত্রের রেশ ধরে একটু ভাবলেই বোঝা যায়, অঙ্ক কষেও নির্ণয় করা যায়, কতো প্রচণ্ডবেগে কোনো বস্তু উৎক্ষিপ্ত হলে সেটি পৃথিবীর টান অতিক্রম করে চলে যেতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় সেই বেগকে escape velocity বলে। আঞ্চলিক ভাষায় একটি কথা আছে, 'পগার-পার'। পগার অর্থে বেষ্টনী বা সীমানা। কোনো কিছুকে এতো জোরে ছুড়ে দেওয়া যায় যার ফলে বস্তুটি পগার পার হয়ে অর্থাৎ সীমানা পার হয়ে যেতে পারে। মাধ্যাকর্ষণের বেলায় এমন ঘটনা ঘটতে পারে। পৃথিবী যাবতীয় বস্তুখণ্ডকে প্রতিনিয়ত টানছে। মাধ্যাকর্ষণ নামক এই টানের ফলে কোনো পার্থিব বস্তুর পরিত্রাণ নেই। যতই উঁচুতে উঠুক না কেন, তাকে আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু এমন তো হতে পারে যখন বস্তুটি অতিমাত্রায় বেগযুক্ত হয়ে উৎক্ষিপ্ত হবার ফলে সেটি অনন্ত দূরত্বের যাত্রী হয়ে পড়বে। উৎক্ষিপ্ত বস্তুটি যতই এগিয়ে যায় ততই পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং সেই কারণে পৃথিবীর টানের পরিমাণ (নিউটন সূত্র অনুযায়ী) কমতে থাকে। এইভাবে ক্ষীণায়মান টানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হতে ঐ বস্তু এমন অবস্থায় পৌঁছাতে পারে যখন ঐ টান নামমাত্র বিদ্যমান অথচ চলন্ত বস্তুটির গতিশক্তি তখনো নিঃশেষ হয়নি। সুতরাং ঐ অবস্থায় কে তার গতি রোধ করবে? সেটি এগিয়েই যাবে। এর নাম অনন্ত যাত্রা। অঙ্কের সাহায্যে এহেন উৎক্ষেপ গতি বা পলায়ন-বেগ (escape velocity) নির্ণয় করা যায়। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই

বেগের পরিমাণ হচ্ছে ঘণ্টায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) মাইল। চন্দ্রের বেলায় escape velocity অনেক কম, ঘণ্টায় মাত্র ৫,৩০০ মাইল (তা তো হবেই হবে, কেননা, পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্রের ভর (mass) ও আয়তন অনেক কম। কোনো গ্রহ বা উপগ্রহের mass ও diameter-এর উপর নির্ভরশীল হচ্ছে তার পলায়ন-বেগ।

এখন, চন্দ্রাভিযানের জন্য অর্থাৎ সশরীরে চাঁদে পেঁছানোর জন্য মানুষকে আকাশ-ভেলায় চড়ে পাড়ি দিতে হবে। কিভাবে এরূপ যাত্রা সম্ভবপর? পৃথিবীর টানকে অগ্রাহ্য করে, পিছুটান মুক্ত হয়ে শূন্যে বিচরণপূর্বক চাঁদের রাজ্যে উপনীত হবার কলাকৌশল মানুষ কি আয়ত্ত করতে পেরেছে? বিজ্ঞানী অঙ্কপাতের সাহায্যে হিসাবনিকাশ করে দেখিয়েছেন, এটি সম্ভবপর। কিন্তু শুধু তাত্ত্বিক কথায় তো কাজ হবে না। বাস্তব প্রয়োগের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখতে হবে। সাফল্য-লাভের সেই সুযোগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন এযুগের প্রযুক্তিবিদ্যাবিশারদগণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সমন্বয়ে বর্তমান শতাব্দীর মানুষ কৃতকার্য হয়েছে দূরত্বের পরাভব ঘটাতে। আকাশ-পরিক্রমার কৌশল তার হাতের মুঠোয় এসেছে যন্ত্র-গণকের সহায়তায়।

যন্ত্রবিদ্যার অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারসমূহের আভাসমাত্র দিয়েছিলাম আগন্তক ব্যক্তিটিকে। কেননা, মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত হতে চাইনি আমরা। তাঁর জিজ্ঞাস্য ছিল, মানুষ পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদে উপনীত হল কিভাবে? সেখানে পৌঁছে চাঁদের মাটিতে ঘোরাফেরার পর আবার পৃথিবীতে ফিরে এলই বা কেমন করে? তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে যথাসম্ভব সহজ কথায় তাঁকে সে-সময় যা বলেছিলাম তার সারাংশ এইরূপ:

মনে করুন, চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের জন্য কৃতসংকল্প হয়ে আপনি একটা আকাশ-ভেলায় (space craft-এ) চড়েছেন। একই উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গী বা সহচর হয়েছেন দুজন। ভেলাটি খুবই মজবুত; নানারকম কলকব্জা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দিয়ে রীতিমত সজ্জিত। আপনি প্রস্তুতিও নিয়েছেন যথেষ্ট। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে উঁচু আকাশে না আছে বাতাস, না আছে অক্সিজেন। তাই শ্বাস নেবার জন্য অক্সিজেন জোগানের ব্যবস্থা আছে ভেলার মধ্যে। আকাশ থেকে ছড়িয়ে-পড়া কিরণসমূহ (radiation) আপনাকে আহত করতে পারে, তাই উপযুক্ত protection বা সংরক্ষণ চাই। পৃথিবীর বায়ু-চাপে অভ্যস্ত আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি যাতে বায়ুহীন ও চাপহীন মহাকাশে বিকল না হয়ে পড়ে তার জন্য চাই

সবরকম সতর্কতা ও সংরক্ষণ। আপনার অবস্থা যেন কবচেনাবৃতো সর্বং। এটি সম্ভব হয়েছে একাধারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্থক সমাহারে।

আকাশ-ভেলাটি উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হবে রকেটের সাহায্যে। একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কোনো কিছুকে ছুড়ে দেওয়া যায়। আতশবাজি হাউই ইত্যাদি হচ্ছে তার পরিচিত উদাহরণ। অনেকটা সেই প্রক্রিয়ায়, উৎক্ষেপণ-স্তম্ভের (projection tower-এর) মাথায় আকাশ-ভেলাটিকে বসিয়ে তারপর পিছু থেকে রকেট ফাটিয়ে তাকে প্রচণ্ড গতিযুক্ত করা হয়।

পিছু থেকে ধাক্কা দিয়ে কোনোকিছুকে গতিসম্পন্ন করার বিদ্যাটা তেমন অভিনব নয়। গুলতির টানা-রাবারে 'জোরসে' টান দিয়ে ঘুঁটি ছোড়া, কার্তুজের বারুদে আচমকা আঘাত হেনে গুলি ছোড়া, ধনুকের 'জ্যা'তে টঙ্কার দিয়ে তীর নিক্ষেপ করা, এ-সবেরই কৌশলনীতি প্রায় এক। তফাত শুধু বেগ-সঞ্চারের উপ-করণে এবং প্রযুক্তির উন্নততর ব্যবস্থাপনায়।

আকাশ-ভেলাটিকে অতি তীব্র বেগে পাঠাতে হবে উপরের দিকে, কেননা, সেটি বহুদূরের যাত্রী। পৃথিবীর টানকে কাটিয়ে মহাকাশে উপস্থিত হবার জন্য তার চাই পলায়ন-বেগ যার পরিমাণ হচ্ছে ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল। কিন্তু প্রথম ধাক্কাতেই কি এতটা বেগ দেওয়া চলবে? ভেবে দেখুন, তা চলবে না। পৃথিবীকে আবেষ্টন করে অনেক দূর পর্যন্ত যে-বায়ুমণ্ডল আছে সেখানকার বাতাসের সঙ্গে প্রচণ্ড ঘর্ষণের ফলে এতো তাপ সৃষ্টি হতে পারে যে, উঠ্‌তিমুখেই আকাশ-ভেলাটি তাতে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

তাহলে উপায় কি? বিজ্ঞানীরা বললেন, পৃথিবী থেকে যতো উপরে ওঠা যায় ততই বাতাসের ঘনত্ব কমে আসে। সুতরাং ঘর্ষণের মাত্রাও কমতে থাকে। তাই, আকাশ-ভেলাতে এক ধাক্কায় উঠ্‌তি মুখেই প্রচণ্ড বেগ সঞ্চার না ক'রে যদি ধাপে ধাপে অর্থাৎ stage by stage রকেট ফাটিয়ে উপযুক্ত বেগসম্পন্ন করা যায় তাহলে একদিকে ঘর্ষণজনিত তাপকে ভেলার সহ্যসীমার মধ্যে রাখা যায়, অন্য-দিকে পৃথিবীর টানকে অতিক্রম করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু শক্তি ঠিক-মতো সঞ্চারিত করা চলে।

হিসাব ভুল হলে চলবে না। সবই নিখুঁত হওয়া চাই। নতুবা আকাশপথে নিরালম্ব অবস্থায় ভেলাটি দিশেহারা ও নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। অতএব কোন্ সময়ে কোন্ অবস্থায় কতো শক্তিসম্পন্ন রকেট ফায়ার করতে হবে, এ-সবই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় হতে হবে। শুধু তাই নয়, ভেলার গতিপথ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে

module. একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহ দুজন অভিযাত্রী এতে চড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবেন, এটাই পরিকল্পিত হয়ে আছে। আপনার সঙ্গে যে দুজন সহযাত্রী আছেন তাদের একজনকে ডেকে বললেন, ভাই তুমি মূলভেলায় অবস্থান করে অপেক্ষারত থাকে, আমরা দুজন ঐ lunar module বা চন্দ্রশকটে চড়ে চাঁদের দেশ থেকে ঘুরে আসি। অপেক্ষমান সহযাত্রী চন্দ্রে পদার্পণের কৃতিত্ব অর্জন থেকে বঞ্চিত থাকবেন বটে, কিন্তু তাঁরও কর্তব্য ও কৃতিত্ব কম নয়। মহাকাশ থেকে চন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রবেশমুখে মূল ভেলা থেকে চন্দ্রশকটকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং সেটি ফিরে আসার পর আবার সেটিকে যথাস্থানে সংযুক্ত করা এই উভয়বিধ কাজ কল্পনাতীত কৌশলের অপেক্ষা রাখে। এ যেন চলন্ত রেলগাড়ী থেকে একটা rake (কামরা) কেটে নেওয়া এবং ফিরতি পথে আবার জুড়ে দেওয়া। সবটাই সম্পূর্ণ নিখুঁত হওয়া চাই, নতুবা সব শেষ! তাই অপেক্ষমান সহযাত্রী একাধারে চালক ও গার্ডসাহেব, ইংরেজিতে একটি প্রবাদ বাক্য, they also serve who stand and wait. আজ্ঞাবাহী হয়ে যে দাঁড়িয়ে থাকে ও অপেক্ষা করে, সেও কিন্তু পরিসেবায় কোনো অংশে কম নয়। 'দাঁড়িয়ে-থাকা' শব্দটি এখানে রূপক মাত্র, কেননা চন্দ্রক্ষেত্রে প্রবেশের পর আকাশচারীর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকার অবকাশ কোথায়? চন্দ্র থেকে কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করতে হলে চাঁদের টানকে (মাধ্যাকর্ষণকে) প্রতিহত করতে হবে। তাই সেই যাত্রীকে একটা lunar orbit বা চন্দ্রাবর্তন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান থাকতে হবে যাতে তজ্জনিত কেন্দ্রাতিগ বল বা centrifugal force দিয়ে চাঁদের টানকে ঠিকমতো balance (প্রতিহত) করা যায়। এ যেন আকাশ-পথে দ্বৈত সমরে প্রবৃত্ত হয়ে তাল সামলানো! সেই অবস্থায় আপনার সহযাত্রী মূল ভেলাটিকে নিয়ে অপেক্ষারত থাকবেন, কখন আপনারা দুজন সফলকাম হয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ফিরে আসবেন, সেই প্রতীক্ষায়।

মনে হতে পারে, এ এমন কি কাজ! কিন্তু ভেবে দেখুন মধ্যাকাশে না আছে কোনো স্টেশন, না প্লাটফর্ম, না কোনো স্থির আশ্রয়। সেখানে এরূপ গাড়ী বদল বা কামরা-পরিবর্তন করার কতো ঝুঁকি নিতে হয়, কতো নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়! নিজদেহের ভর, বাইরে বায়ুমণ্ডলের চাপ, সহনীয় পরিবেশ ইত্যাদির সঙ্গে আজন্ম-অভ্যস্ত মানুষের পক্ষে একটা ভরহীন চাপহীন অজানা পরিবেশ কতো ভয়ঙ্কর, কতো অস্বস্তিকর!

চন্দ্রশকটে চড়ে আপনারা দুজন সকল বাধা অতিক্রমপূর্বক চন্দ্রক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। ধাপে ধাপে উল্টো মুখে রকেট এঞ্জিন চালিয়ে শকটটিকে যথাপ্রয়োজন

মন্দগতি করে নিয়েছেন যাতে সুস্থস্বস্থভাবে চাঁদে নামতে পারেন। কিন্তু অবতরণ করবেন কোথায় ? এরোপ্লেন থেকে নীচের দিকে তাকালে নীচের মাটি, মাঠ, মানুষ ইত্যাদি যেমন দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি আপনারা চন্দ্রশকটবাহিত অবস্থা থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। দেখছেন, কি ভয়ানক crater বা ফাটল-যুক্ত গর্তসমূহ ! এরা যেন মুখব্যাদান ক'রে আপনাদের ভয় দেখাচ্ছে। কোথায় পৃথিবী-থেকে-দেখা সেই সুমনোহর চাঁদ, আর কোথায় এই অতি-কাছ-থেকে-দেখা অমসৃণ, গিরিগহ্বরে ভর্তি চন্দ্রপৃষ্ঠ ! আপনার পূর্বসূরিগণ বলে দিয়েছেন, সাবধানে নামতে হবে sea of tranquility বা অপেক্ষাকৃত শান্ত চন্দ্রপ্রদেশে। গ্রাউণ্ড-কণ্ট্রোল থেকে সেইভাবে পরিচালিত হচ্ছে আপনার শকট নির্ভরযোগ্য স্থান অভি-মুখে। ধন্য এই remote control বা দূরশাসন, যার দ্বারা চলিত হয়ে প্রায় যন্ত্রবৎ আপনারা চলেছেন অজানাকে জানতে ও জয় করতে !

শুভ মুহূর্ত এসে গেছে। চন্দ্রশকটখানি চন্দ্রপৃষ্ঠকে স্পর্শ করেছে। এবার আপনারা দুজন একে একে পদার্পণ করবেন বহুবাঞ্ছিত চাঁদের মাটিতে। প্রস্তুত হয়ে আছেন সর্বভাবে, যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক রেখে, যাতে চলাফেরার কোনো অসুবিধা না হয় অথচ পূর্বনির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুযায়ী চাঁদের ধুলা, চাঁদের মাটি, চাঁদের ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করতে এতটুকু ভুল না হয়ে যায়। পৃথিবীর সংগ্রহশালায় ও পরীক্ষাগারে এ-সবেরই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হবে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধতর করার জন্য। সফল চন্দ্রাবতরণ রচনা করবে বিজ্ঞান সাধনার এক উজ্জ্বল ইতিহাস।

এই অভিযান সাফল্যের সাক্ষ্যস্বরূপ নিজদেশের পতাকা প্রোথিত রেখে এবং সংকেতপ্রেরক যন্ত্রাদি ওখানে ঠিকমত বসিয়ে দিয়ে এখন আপনাদের প্রত্যাবর্তনের পালা। সেই চন্দ্রশকটে পুনরায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে উঠ্‌তি মুখে রকেট এঞ্জিন চালিয়ে প্রয়োজন মতো গতিসঞ্চারপূর্বক ফিরে আসছেন অপেক্ষমান সহযাত্রীর দিকে, যিনি আপনাদের আকাশ-ভেলাটিকে সযত্নে ঠিক জায়গায় উপস্থাপিত রেখেছেন আপনাদের আবাহন করার জন্য।

চন্দ্রশকটের কাজ শেষ হয়েছে। মহাকাশে সেটির থেকে বেরিয়ে এসে শকটকে শেষ বিদায় জানিয়ে আপনারা দুজন পুনরায় চড়লেন আকাশ-ভেলায় এবং প্রতীক্ষা-রত সহযাত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়ে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসার জন্য আবার নিলেন প্রস্তুতি। পরিত্যক্ত চন্দ্রশকটখানি আকাশে নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেল আপন কর্তব্য সমাপনের পর। কিন্তু আপনাদের কাছে সযত্নে রক্ষিত রইল ঐ শকটবাহিত

চাঁদের ধুলা ও প্রস্তরখণ্ড, আর থাকল এক অপূর্ব স্মৃতি পৃথিবীর মানুষকে উপহার দেবার জন্য।

আবার সেই পথপরিক্রমা। মহাকাশ ছাড়িয়ে আবার সেই পরিচিত পৃথ্বীর আকর্ষণ। দুর্বার গতিতে নেমে আসছেন পৃথিবীর দিকে। Soft landing বা স্বস্থ অবতরণের জন্য সব ব্যবস্থাই ঠিক রেখেছেন গ্রাউণ্ড-কণ্ট্রোলের সহায়কগণ। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে কেননা, চাঁদের দেশে ছিল না কোনো বায়ুমণ্ডল, কিন্তু পৃথিবীতে আছে। প্রচণ্ড গতিতে নামবার মুখে বায়ুঘর্ষণজনিত তাপ এতো প্রখর হতে পারে যাতে ভেলাসহ আপনারা নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন। সুতরাং উল্লম্বভাবে (vertically downward) অবতরণ পরিহার করতেই হবে। দ্রুতগামী যানের আরোহী মাত্রেই জানেন, খাড়া উঁচু বা খাড়া নিচু পথে চলবার সময় ঝুঁকি এড়ানোর জন্য অনেক সময় 'টেরছা' পথে (angular cut দিয়ে) নামা-ওঠা করতে হয়। অনেকটা সেই প্রক্রিয়ায় অতি সাবধানে চালাতে হবে ভেলাটিকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর একদিকে যেমন তাকে প্রদক্ষিণরত রাখা চাই অন্যদিকে তেমনি atmospheric layer বা বায়ুস্তরকে পাশ কাটানোর জন্য কোণাচিভাবে এগুতে হবে যাতে ঘর্ষণের মাত্রা কমে যায়। সুদক্ষ পাইলটগণ এ কাজ করতে পারেন, তাছাড়া প্রতি মুহূর্তের গতি অবস্থান ইত্যাদির হিসাবনিকাশ অনুযায়ী যথোপযুক্ত নির্দেশ তো দিয়েই যাচ্ছেন গ্রাউণ্ড কণ্ট্রোলের অধিকারিবৃন্দ। তাঁদের ও আপনাদের মিলিত প্রচেষ্টায় আকাশ-ভেলা নিরাপদে এসে পড়েছে পৃথিবীর সন্নিকটে। এবার অবতরণের পালা। উৎকণ্ঠা মিশ্রিত উল্লাস মানুষের মধ্যে, কখন কোন্ মুহূর্তে ধরণীস্পর্শ করবে আপনাদের module বা ভেলাখানি।

কোথায় নামবেন ? আকাশচারী মানবত্রয়কে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে বিশাল সমুদ্র, বুক পেতে ভেলাটিকে ধরে নেবার জন্য তার শায়িত অঙ্কে, তার প্রচণ্ড গতিকে সামলানোর জন্য আছে অতল নীর। ঝলাৎ করে এসে পড়বে যাত্রীবাহী সেই শকট, তাই এই reception বা অভ্যর্থনার নামকরণ হয়েছে splash down বা ঝম্প-পতন। আপনাদের শকটখানি সমুদ্রজলে তলিয়ে যাবে না তো ? সে ভয় হতে পরিত্রাণের জন্য সবরকম নিরাপত্তা-ব্যবস্থা অবলম্বিত আছে, আছে সহস্র মানুষের সতর্ক দৃষ্টি, উদ্ধারকার্যে ব্যবহৃত সুদক্ষ ডুবুরীর দল। অবতরণের আনুমানিক এলাকার সবটুকুই আগে হতে আছে সুরক্ষিত।

ঝম্প-পতন, শকট-উদ্ধার, আপনাদের নির্গমন, দিনকয়েকের জন্য পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ, কোয়ারেণ্টাইন বা বীজাণু-মুক্তিকরণ ইত্যাদি পর্বের পরিশেষে আপনারা

স্বচ্ছন্দে পুনর্মিলিত হলেন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে। আপনাদের সমবেত চেষ্টায় সফল হল চন্দ্রাভিযান। গতিবিজ্ঞানের মূলসূত্র অবলম্বনে কল্পিত ও প্রযুক্তিবিদ্যা সহায়ে রচিত এই কর্মযজ্ঞ এনে দিয়েছে এক অভূতপূর্ব সাফল্য, উন্মুক্ত করেছে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির নূতন পথ।

সেই পথ ধরে আজও বহু অভিযান অব্যাহত আছে। আকাশ-মিছিলের এই মানব-তৎপরতা একদিকে যেমন রোমাঞ্চকর অন্যদিকে তেমনি ভয়ঙ্কর। আনন্দ-পুলক এইজন্য যে, নিত্যনূতন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জ্ঞানবিজ্ঞানের সীমানাকে সম্প্রসারিত করতে সমর্থ হচ্ছে। আর ভীতি আতঙ্ক এইজন্য যে, বিজ্ঞান-লব্ধ বিদ্যার অপব্যবহারে সেই মানুষই দিন দিন সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠছে। অণুশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান যিনি দিলেন তত্ত্বসহায়ে, তিনি হলেন জগদ্বরেণ্য। আর সেই অণুশক্তিকে মারণাস্ত্রে শাণিত করল যারা, তারা হল বিশ্বশান্তির শত্রুস্বরূপ। একই মানবকুল এক ভূমিকায় দেবতুল্য, অন্য ভূমিকায় দানবতুল্য। মানুষের মধ্যে দেবপ্রকৃতির ও দানবপ্রকৃতির সংঘাত কোনো নূতন কথা নয়, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি যেন সেই সংঘাতকে তীব্রতর করেছে কি শাসনে, কি শোষণে, কি রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তাই বিভিন্ন স্তরে সংযম ও সতর্কতা অবলম্বনের গুরুত্ব বেড়েছে অনেক। যে-বুদ্ধি দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে, সেই বুদ্ধির অপব্যবহারে প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয় ঘটতে পারে, সোনার পৃথিবী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে। এরূপ দুর্বুদ্ধি অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু সেই কারণে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অগ্রগতি বর্জনীয় হতে পারে না। রামের দোষে শ্যামকে দায়ী করা চলে না। হিরোসিমা-নাগাসাকির জন্য পরমাণু-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তাকে অভিযুক্ত করা যায় না। তেমনি 'অন্তরীক্ষ যুদ্ধে'র বিভীষিকার জন্য মহাকাশ অভি-যানের বিজ্ঞানকে অভিশপ্ত করা চলে না।

প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞান-বিকাশ ও প্রয়োগ সাফল্য, সায়েন্স ও টেকনোলজির মধ্যে পার্থক্যটুকু বুঝে নিতে হবে। জ্ঞানের পরিধি বিস্তার, পদার্থের গুণধর্মের বিচার-বিশ্লেষণ এক কথা, আর অর্জিত জ্ঞানকে ভালো অথবা অনিষ্টকর কাজে লাগানোর আয়োজন আরেক কথা। প্রথমটি হচ্ছে শুদ্ধ বিজ্ঞান, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রযুক্তি-বিদ্যা। দেহের অঙ্গসজ্জা ও অলঙ্করণ হচ্ছে প্রযুক্তি, আর সেই দেহের প্রাণস্পন্দন হচ্ছে বিজ্ঞান। সেই স্পন্দনকে কান পেতে শুনতে বা অনুভব করতে প্রয়াসী হন যিনি, তিনি যথার্থ বিজ্ঞানসাধক। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত নিয়মনীতি

অনুধাবনের অপর নাম সত্যানুসন্ধান। নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও গভীর মননশীলতার প্রয়োজন হয় এই পথে। বিজ্ঞানের ইতিহাস সেই সাক্ষ্য বহন করে।

অতীতকালে এক যুগে বিজ্ঞানচর্চার অপর নাম ছিল প্রকৃতি পরিচয়। জড় পদার্থের গুণাগুণ, জড় শক্তির রূপান্তর ইত্যাদির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় লাভই ছিল তখনকার দিনে বিজ্ঞানচর্চার মুখ্য উদ্দেশ্য। পরীক্ষণ লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানো হোত দুইভাবে। এক, প্রকৃতি-বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে কিছুটা অনুমান মিলিয়ে নানাবিধ তত্ত্ব উদ্ভাবনে। দুই, ঐ জ্ঞানের সাহায্যে কৌশলগত প্রযুক্তির বিস্তারে, অর্থাৎ আবশ্যক মতো যন্ত্রাদি নির্মাণে।

বিজ্ঞানের এই দ্বিমুখী ব্যবহার প্রায় সমান্তরালভাবে চলে এসেছে। কেউ ভালবাসেন বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক রূপটিকে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে বিজ্ঞানকে স্বাগত জানানো হয়, যেহেতু প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ যথেষ্ট সহায়ক। কেউ ভালবাসেন বিজ্ঞানের ব্যবহারিক রূপটিকে। প্রাকৃতিক শক্তিকে করায়ত্ত করতে সাহায্য করে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল। তাই শক্তি সম্পদ আহরণের হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয় বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে কোন্‌টি মান্যতর, এ বিতর্ক নিরর্থক। কেননা, এটি নির্ভর করে আপন আপন মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গির উপর। যার যেটি ভাল লাগে। তবে একথা নিঃসন্দেহ যে, প্রকৃতির রহস্য নিরূপণে নিবেদিত প্রাণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক রূপটি প্রিয়তর। স্থূল থেকে সূক্ষ্মে পৌঁছানোর জন্য যারা নিরন্তর চেষ্টিত থাকেন তাঁদের কাছে বিজ্ঞান-দর্শন অধিকতর মনোগ্রাহী।

আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের উপর কতো যে নির্ভরশীল তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে মহাকাশ-পরিক্রমার কর্মসূচী। তাই চন্দ্রাভিযানের যৎসামান্য বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে এখানে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বহুলাংশ ব্যবহৃত হয় আকাশ-ভেলা বা space craft-এর নির্মাণে, উৎক্ষেপণে ও পরিচালনায়। এক কথায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্মিলিত অবদানে গড়ে উঠেছে মহাকাশ-পরিক্রমা প্রকল্প—চন্দ্রাভিযান তারই অংশবিশেষ।

তাছাড়া, বিজ্ঞানের ক্ষেত্র কতদূর যে সম্প্রসারিত হতে পারে তারও এক চমৎকার নিদর্শন জোগায় চন্দ্রাভিযান। স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে স্বচ্ছন্দ পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে পরিচিত হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানাবিধ ক্ষেত্র। অণু পরমাণু থেকে সুদূর নক্ষত্র নীহারিকা পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় স্মরণাতীত কাল থেকে স্থান পেয়েছে মানুষের

কল্পনার আকাশে, কিন্তু আরো কাছে, আরো নিবিড়ভাবে সেগুলির অস্তিত্ব অনুভব করার অসামান্য সুযোগ এনে দিয়েছে মহাকাশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।

এ-সব বিষয়ে স্পষ্টতর জ্ঞানলাভের উপায় কি, এ প্রশ্নের উত্তরে সেই উৎসুক ব্যক্তিটিকে বলেছিলাম, প্রকৃতি-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে হাতে-খড়ি নিতে হবে। তারপর বাকীটুকু হবে উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ, গণিত-প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে। এই রাজপথ সৃষ্টি করে গেছেন বিশ্বের সেকালের ও একালের মনীষিবৃন্দ। তাঁদের ভাবতরঙ্গ বারংবার স্পর্শ করেছে ও প্রভাবিত করেছে অনুসন্ধিৎসু মানবকুলকে। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সীমারেখার সংকীর্ণতা অর্থহীন। একই সূর্য-কিরণ, একই নভোমণ্ডল দেশ, জাতি ও ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে আলোকিত করে ও অনুপ্রেরণা জোগায়। বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানসম্পদকে আমরা সকলেই পেয়েছি মানবের উত্তরাধিকার সূত্রে অগ্রগতির মূলধন রূপে—চন্দ্রাভিযান তারই একটুকরো নিদর্শন।

৩
বিজ্ঞানের ভাষা
—সংখ্যা ও সংকেত—

কালক্রমে বিজ্ঞানের একটা নিজস্ব ভাষা গড়ে উঠেছে। আধুনিক বিজ্ঞানকে বুঝতে হলে ঐ ভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। কেননা, বিজ্ঞানিগণ সেই ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি ও তত্ত্বসমূহ তাঁরা পরিবেশন করেন এমন একটি ভাষার মাধ্যমে যাতে পারস্পরিক ভাববিনিময় ঘটে অবাধে।

প্রচলিত সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক ভাষার তারতম্য শুধু যে স্টাইল বা রচনাভঙ্গিতে, তা নয়। বিশেষ বিশেষ অর্থজ্ঞাপক শব্দ চয়নে এবং নব নব ধারণা (concept) বহনকারী শব্দ গঠনে এই ভাষা যেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তেমনই প্রগতিশীল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গবেষণা ও অনুশীলনরত বৈজ্ঞানিকগণ যে-সকল কর্মবিবরণ, গবেষণাপত্র ইত্যাদি প্রকাশ করেন সেগুলি অনুধাবন করলে বেশ বোঝা যায়, ব্যবহৃত অক্ষর (alphabet) বা বাক্যসমূহের (sentence) মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের ভাবপ্রকাশের কাঠামোতে একটা মূলগত ঐক্য আছে।

প্রগতিশীল এরূপ বৈজ্ঞানিক ভাষার লক্ষণ কি, এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়,

(১) ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বাক্য হবে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত, সরল এবং সুনির্দিষ্ট। সংক্ষিপ্ত অর্থে বাগাড়ম্বর-বর্জিত। সরল অর্থে বক্রতাশূন্য। সুনির্দিষ্ট অর্থে দ্ব্যর্থহীন। কোনো কোনো রচনায় অলঙ্কার, বিস্তার, উপমা, শব্দঝঙ্কার ইত্যাদি বেশ উপভোগ্য এবং সেই কারণে আকর্ষণীয় বিবেচিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এগুলি বাহুল্যবোধে বর্জনীয়।

সংবিধান, আইন, আইনানুগ বিধিনিয়ম ইত্যাদির ভাষার সঙ্গে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। ঐসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ভাষায় বাক্যসংযম একান্ত প্রয়োজন। একটি অনাবশ্যক কথার উপস্থিতি, অথবা বাক্যগঠনে একটু এদিক-ওদিক অনেক অনর্থ ঘটায়, অবাঞ্ছিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং ভাষ্য ও ব্যাখ্যায় নানাবিধ বিতর্কের ইন্ধন যোগায়। তাই আইনপ্রণেতাদের পক্ষে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক বিধানরচনার কাজে। তবু ফাঁক থেকে যায়। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত এইসব ত্রুটির সুযোগ নিয়ে সারা পৃথিবীতে কতো মামলা-মকদ্দমার উৎপত্তি!

গণিতের ক্ষেত্রে পালনীয় বাক্যসংযম আরও কঠোর। একটুকু ফাঁক-ফোকরের অবকাশ নেই সেখানে। চিন্তা করুন ইউক্লিডের উপপাদ্যসমূহের ভাষা ও বাঁধন।

জ্যামিতির ঐসব সূত্রাবলী ধ্রুব সত্য না আপেক্ষিক সত্য সে-বিচার এখন করছি না, কিন্তু কে অস্বীকার করবে ওই বাক্য-বিবৃতিসমূহ সংযত ও দৃঢ়বদ্ধ ভাষার গুণে চিন্তা-জগতে এক অনন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে আছে?

প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্য উদ্ঘাটন যদি বিজ্ঞানের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার ভাষাকে এমন একটি ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যেটি হবে ত্রুটিবিহীন, সুসংবদ্ধ ও সত্যানুগ।

(২) বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ হবে নির্দিষ্ট অর্থবহনকারী। নির্দিষ্ট অর্থাৎ পূর্ব-নির্ধারিত। কোন্ শব্দের কি অর্থ ধরা যাবে, তা আগে হতে স্থিরীকৃত থাকতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শব্দের অর্থজ্ঞাপন সুনির্দিষ্ট না হলে vagueness বা ভাবের অস্পষ্টতা এসে যেতে পারে। তাই অস্পষ্ট ও অসঙ্গত শব্দের ব্যবহার বৈজ্ঞানিক ভাষায় সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

এই প্রসঙ্গে, দুয়েকটি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথম কথা, এতো কঠোর অনুশাসন মেনে শুধুমাত্র স্পষ্টীকৃত শব্দের ব্যবহার ক'রে কি সম্পূর্ণভাবে ভাবপ্রকাশ বা ভাষার বিস্তার করা যায়? আমরা জানি, ভাববাহী এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলির সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ আদৌ সম্ভবপর নয়। বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ শব্দের প্রয়োগ আমরা করে থাকি, সেগুলি শুনতে অভ্যস্ত এবং মোটামুটি বুঝে নিতেও সক্ষম, তথাপি সে-সকল শব্দের formal definition বা শাব্দিক সংজ্ঞা প্রদান সুকঠিন। তার কারণ ক-এর সংজ্ঞাবাচক শব্দের মধ্যে খ-এর সংজ্ঞাসূচক শব্দগুলি এসে পড়ে। আবার খ-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ক-এর কথা এসে যায়। অনুরূপভাবে গ, ঘ প্রভৃতি শব্দের ভেজালে শেষ পর্যন্ত একটা ন্যায়ের গোলক-ধাঁধায় ঘোরপাক খেতে হয়। শব্দসমূহের এই limitation বা সীমাবদ্ধতার কথা তর্কশাস্ত্রে সুবিদিত। অথচ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাচনিক অস্পষ্টতা তো পরিহার করতেই হবে। তাহলে উপায় কি? উপায়পন্থা আছে নিশ্চয়, নতুবা thought process বা চিন্তাপ্রক্রিয়ায় অগ্রগতি সম্ভব হল কেমন করে? গণিতে, দর্শনশাস্ত্রেও এরূপ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। তাই defined elements-এর পাশাপাশি স্থান পেয়েছে বহুসংখ্যক undefined elements এবং তাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে তর্কশাস্ত্রের ও গণিতশাস্ত্রের অংশবিশেষ। বিষয়টি বিজ্ঞান দর্শনের অঙ্গীভূত।

দ্বিতীয় কথা, যে-কোনো শব্দের দুরকম অর্থ হতে পারে, এক ব্যুৎপত্তিগত, দুই প্রয়োগগত। প্রথমটি ধাতু প্রত্যয়াদিজনিত বা ব্যাকরণসম্মত, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঐ শব্দের প্রচলিত বা ব্যবহারসম্মত অর্থ। এই দুরকম অর্থের মধ্যে যদি কোনো

তারতম্য না থাকে, তাহলে অসুবিধা নেই। নতুবা বেছে নিতে হয় কোন্‌টি বিজ্ঞানের ভাষায় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। সাধারণতঃ প্রচলিত অর্থই প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংজ্ঞার সাহায্যে শব্দটিকে সেইভাবে ব্যবহার করতে বাধা নেই।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক ইংরেজি শব্দ **atom** যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে পরমাণু। **Atom** শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হচ্ছে যাকে আর কাটা বা খণ্ডিত করা যায় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী জন ডাল্টন (১৭৬৬—১৮৪৪) যখন তাঁর পরমাণুবাদ (atomic theory) উপস্থিত করেন তখন তিনি নিশ্চয়াত্মকভাবে ধরে নিয়েছিলেন যে, পদার্থকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করতে করতে সেটি এমন এক কণিকায় পরিণত হয় যার পর আর তাকে ভাঙা যায় না। সুতরাং ক্ষুদ্রতম এই পদার্থ-কণিকাকে আক্ষরিক অর্থে অবশ্যই atom নামে অভিহিত করা চলে। পরবর্তী কালে বিজ্ঞানিগণ আবিষ্কার করলেন, ঐ এটমকে আরো ভাঙা যায়। সুতরাং বহুবিধ পদার্থাংশের সমাবেশে গঠিত সেই এটমকে আর আক্ষরিক অর্থে atom বলা উচিত নয়। তবু নামটি রয়ে গেছে, পরিত্যক্ত হয়নি বিজ্ঞানী মহলে। বর্তমান ধারণা অনুযায়ী পদার্থ-পিণ্ড (নিউক্লিয়াস) ও তার চারিপাশে আবর্তন-রত এক বা একাধিক ইলেকট্রন মিলিয়ে যে-পরমাণু, তাকে আজও এটম বলা হয়, যদিও শব্দটির ব্যাকরণগত অর্থ লোপ পেয়েছে। অর্থাৎ বিভাজ্যতা সত্ত্বেও পরমাণুর নাম-করণে পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

প্রচলিত ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে গরমিল থাকলে কেমন গোলমাল বাধে তার একটি উদাহরণ হচ্ছে 'গ্রহ'। শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। গ্রহ্‌ ধাতুর সঙ্গে একটা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গ্রহ নামক শব্দের উৎপত্তি। অতএব আক্ষরিক অর্থে যে-জ্যোতিষ্কসমূহ বিভিন্ন তারা ও নক্ষত্রের স্থানে গমন করে, অথবা গৃহ্ণাতি গতি-বিশেষান্‌ ইত্যর্থে বিভিন্ন তারা, নক্ষত্র, রাশিতে অবস্থান করার পর গতিযুক্ত হয়ে চলে যায়, তাদের 'গ্রহ' বলা যায়। এই দুই অর্থেই সূর্য ও চন্দ্র গ্রহস্বরূপ। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র মতে নয়টি গ্রহের অন্যতম হচ্ছে রবি ও সোম (চন্দ্র)। রাহু ও কেতু যদিও জ্যোতিষ্ক নয় তবু তারা গ্রহরূপে স্বীকৃত হয়েছে যেহেতু ঐ দুটি সম্পাত বিন্দু (রবিকক্ষ ও চন্দ্রকক্ষের ছেদবিন্দু) অন্যান্য গ্রহের মতো তারকা নক্ষত্রাদির ক্ষেত্রে গমন ও অতিক্রমণ করে। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহ নয়। সূর্যের চারিদিকে পরিভ্রমণরত বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদিকে গ্রহ বলা যায় পূর্বোক্ত 'গৃহ্ণাতি গতি-বিশেষান্‌' অর্থে। চন্দ্র হচ্ছে

পৃথিবীর উপগ্রহ, যেহেতু পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্র আপন কক্ষপথে আবর্তনরত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গ্রহ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রহ বলা চলে, কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ ধরলে ঐ দুটিকে গ্রহ বলা চলে না। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় গ্রহ শব্দের শেষোক্ত অর্থই স্বীকৃত।

(৩) বৈজ্ঞানিক ভাষার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সংখ্যা (number), সংকেত (symbol) ও সমীকরণের (equation) বহুল ব্যবহার। সাহিত্যের ভাষায় সংখ্যা ও সংকেতবাচক শব্দের প্রয়োগ যে নেই, তা নয়, তবে তা অতি সীমিত। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় সংখ্যা ও সংকেতের ব্যবহার আজ এতই ব্যাপক যে সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাবপ্রকাশের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ বলা চলে। পরিমাপের সাহায্যে প্রকৃতিকে জানতে চাওয়া এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে পরিমাপযোগ্য সত্তা (entity)-সমূহের ক্রিয়াকলাপ রূপে চিহ্নিত করতে পারাটা যেন বৈজ্ঞানিক সাফল্য অর্জনের নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রবণতা অল্পবিস্তর আগেও ছিল, কিন্তু সেটি অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে বিগত শতাব্দীতে। বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের সমীকরণসমূহ আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, গাণিতিক সমীকরণ সহায়ে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান নিশ্চিতভাবে সম্ভবপর। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল (JC Maxwell 1831—1879) গর্ব সহকারে বলেছিলেন, একটা set of equations বা সমীকরণগুচ্ছ দিয়ে প্রকৃতিকে আবদ্ধ করা গেছে। এহেন determinism বা নির্ণয়বাদের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তুঙ্গে অবস্থিত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু নিশ্চয়তার সেই দুর্গে অব্যবহিত পরবর্তী কালে আঘাত হেনেছিল এমন কতকগুলি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার, যার ফলে অনেক প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

এই পরিবর্তনের মুখে নব নব ধারণা বা concept-এর উন্মেষ যেমন ঘটেছিল, তেমনি বিজ্ঞানের ভাষায় ঐ সকল ধারণা-জ্ঞাপক শব্দেরও উদ্ভব হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে। বৈজ্ঞানিক ভাষার এই রূপান্তর, বর্ণনামূলক বিস্তারের পরিবর্তে সারাংশসূচক সংকেত বাক্যের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই প্রবণতা ভালো, কি মন্দ, সে-বিচার কিছুটা নিরর্থক। তবে একথা নিশ্চয় সকলকে ভেবে দেখতে হবে যে, ভাষাকে যদি ভাবপ্রকাশ ও ভাবপ্রসারের যথার্থ মাধ্যমরূপে কার্যকরী হতে হয় তাহলে তাকে সরল ও সাবলীল হতেই হবে। নতুবা জ্ঞান-বিস্তারের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আধুনিক বিজ্ঞান বহুলাংশে গণিত-মুখী হয়েছে সত্য। কিন্তু তাই বলে

বিশ্বপ্রকৃতির গুণধর্ম, বিভিন্ন ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত ছন্দোবদ্ধতা ও নিয়মনিষ্ঠার পরিচয় কয়েকটি দুর্বোধ্য পারিভাষিক শব্দের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে কেন ? কেনই বা বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বাদি পরিবেশনে শব্দগত কাঠিন্য বা ফরমূলার নিগূঢ় বন্ধন একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে ? অঙ্কে সকলে সুপণ্ডিত হয় না, গণিতের মূল স্রোতের সঙ্গে সকলের সুপরিচয় ঘটে না, ঠিক কথা। কিন্তু সেই কারণে চিন্তাক্ষেত্রে সূক্ষ্মতার রসাস্বাদন থেকে তারা বঞ্চিত থাকবেন কেন ? শিক্ষানায়ক ও বিজ্ঞানপ্রেমিকদের এবিষয়ে নিশ্চয় ভেবে দেখতে হবে, কিভাবে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলা যায়, কি উপায়ে বিজ্ঞানের ভাষাকে অধিকতর উপভোগ্য ও সহজবোধ্য করা যায়। সুখের বিষয়, খ্যাতনামা একাধিক বিজ্ঞানী একাজে পথপ্রদর্শন করেছেন। একদিকে উচ্চাঙ্গ গণিত-প্রয়োগে তাঁরা বিজ্ঞানকে উন্নততর মার্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অন্যদিকে নব-লব্ধ জ্ঞানকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সহায়ে চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তৎপর হয়েছেন। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের সমবেত উদ্যোগে এইভাবে যথার্থ বিজ্ঞানচেতনা প্রসার লাভ করুক, জ্ঞানপন্থী মানুষের এই হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা।

৪
জ্ঞান-বিজ্ঞান
—প্রকৃতি পরিচয়ে হাতেখড়ি—

প্রারম্ভিক কয়েকটি কথার পুনরুল্লেখ করছি। যে-সকল ব্যক্তি স্কুল-কলেজে মামুলি প্রথায় সায়েন্স পড়েননি অথচ বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু ধারণা সঞ্চয়ে আগ্রহী অর্থাৎ ঘরে বসে অবসর সময়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে একটু পরিচিত হতে চান, মূলতঃ তাদের জন্য এই পরিবেশন।

বর্তমান বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। এক একটি বিভাগের বিচার-বিবরণ নিয়েই এক এক খণ্ড মহাভারত হয়ে যায়। অথচ যে-সকল মূলনীতি অবলম্বনে আধুনিক বিজ্ঞান গঠিত, সেগুলি সংখ্যায় অধিক নয়। যথাসম্ভব স্বল্পসংখ্যক মূলনীতি বা সূত্র সহায়ে যাবতীয় physical phenomena বা জড়জাগতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা প্রদানে তাবৎ বৈজ্ঞানিকবৃন্দ তৎপর। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত তাঁদের এই প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ডকে শুধু কি বাহবা দিয়েই ক্ষান্ত থাকবে সাধারণ মানুষ, না তারা চাইবে এহেন উদ্যোগের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পরিচিত হতে?

অধ্যায়ের শিরোনামে জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয়বিধ শব্দের প্রয়োগ করেছি, শুধু বিজ্ঞানের নয়। তার কারণ বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আগে জ্ঞানসঞ্চয়, পরে বিজ্ঞান-বোধ। আগে প্রকৃতি পরিচয় তারপর সূত্রানুসন্ধান। পর্যবেক্ষণ দিয়ে হাতে খড়ি, অনুশীলন ও উদ্ভাবনে তার পরিসমাপ্তি।

প্রচলিত অর্থে জ্ঞান ও বিজ্ঞান হচ্ছে কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে যথাক্রমে তথ্য-আহরণ ও তত্ত্ব-বিকাশ। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝবার জন্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে দুয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করছি। ধরুন, শুনেছেন apple falls, নিজে দেখেছেন গাছের উঁচু ডাল থেকে বৃন্তচ্যুত হয়ে পাকা ফলটি মাটিতে পড়ে। লক্ষ্য করেছেন, সেই ফল যতোই পড়তে থাকে ততই সেটি দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়। অনুমান করতে পেরেছেন, উপরিস্থিত যে-কোনো বস্তুখণ্ড কোনো বাধা না পেলে এইভাবে নীচের দিকে উলম্ব পথে (vertically downward) পড়তে থাকে। হাল্কা জিনিসের তুলনায় ভারী জিনিস কি বেশী জোরে অর্থাৎ অধিকতর বেগে পড়বে? না, তা নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, একটুকরো তুলো বা পাখির পালক আর একটা ঢিল বা মুদ্রা (coin) উঁচু থেকে একসঙ্গে ছেড়ে দিলে একই সময়ে মাটিতে পৌঁছাবে,

যদি না বাতাসের ধাক্কায় তাদের পতন ব্যাহত হয়। একটা বায়ুহীন চোঙে পালক ও coin নিয়ে যে-পরীক্ষা করা হয়েছিল তা বিজ্ঞানে guinea feather experiment নামে খ্যাত হয়ে আছে। তার সারমর্ম, ভারী হাল্কা সব-বস্তুই পৃথিবীর টানে পতনশীল অবস্থায় একই গতিসম্পন্ন হয়, একই ত্বরণ বা acceleration-এর ফলে।

জড়বস্তুর এইসব আচরণ বা গুণাগুণ ঠিকমত জানার নাম জ্ঞান। সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে কার্য-কারণ ব্যাখ্যায় যে তত্ত্ব গড়ে ওঠে তার নাম বিজ্ঞান। মহামতি নিউটন উদ্ভাবিত আকর্ষণতত্ত্ব এইভাবে রচনা করেছিল সে যুগের বিজ্ঞানের বুনিয়াদ। তিনি অনুমান করেছিলেন, গোলাকার পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ (matter) যেন পৃথিবীর কেন্দ্রগত হয়ে অপর বস্তুকে প্রতিনিয়ত টানছে। আমরা যে ভর (ওজন) অনুভব কর যে ঐ টানের ফল। ধারণাটিকে সম্প্রসারিত ক'রে নিউটন আরও অনুমান করেছিলেন যে, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে অনুরূপ আকর্ষণ বিদ্যমান। তার ফলে সূর্যের টানে আবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণরত—ছিটকে যাবার বা এলোমেলো ভাবে ঘুরবার কোনো সম্ভাবনা নেই (একটা লম্বা সুতোয় ঢিল বেঁধে সেটিকে জোরে ঘোরালে ঢিলটি চক্রাকারে ঘুরতে থাকে ; ছিটকে পড়ার tendency বা উপক্রমকে প্রতিহত করে সুতোর টান। অনেকটা সেই রকম)।

বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহসমূহ সূর্যের টানে তার চারিদিকে একই নিয়মে আবর্তনরত। উপগ্রহ চন্দ্র পৃথিবীর টানে তার চারদিকে ঘুরতে থাকে একই নিয়ম শৃঙ্খলায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পার্থিবক্ষেত্রে বস্তুখণ্ডের পৃথিবীর কেন্দ্রমুখী টান, সৌরক্ষেত্রে গ্রহসমূহের সূর্যাভিমুখী টান এ-সবই ব্যাখ্যাত হয় একটি আকর্ষণসূত্রের সাহায্যে। বিজ্ঞানের ভাষায় এর সাধারণ নাম মহাকর্ষ বা universal gravitation। মাধ্যাকর্ষণ হচ্ছে বিশেষ নাম (সচরাচর যাকে gravity বলা হয়ে থাকে)।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিউটনের গতিসূত্রাবলী ও আকর্ষণতত্ত্বের প্রয়োগ সাফল্য তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। পরীক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান থেকে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে উপনীত হবার প্রয়াসে তিনি এতই সাফল্য অর্জন করেছিলেন যে, তৎকালে তাঁর ধারণাসমূহ অভ্রান্ত সত্যরূপে পরিগণিত হোত। কিন্তু জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানে উত্তরণের অভিযান সেখানে থেমে যায়নি। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে মহামতি আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) এক নূতন জিজ্ঞাসা উপস্থিত করলেন। তাঁর প্রশ্ন, এক জড়বস্তু অপর জড়বস্তুকে টানবে কেন? কেনই-বা এই টান আকৃষ্যমান বস্তুদ্বয়ের পদার্থপরিমাণ (mass) ও পারস্পরিক দূরত্বের উপর নির্ভরশীল। তাঁর এই মৌলিক জিজ্ঞাসা

তাঁকে প্ররোচিত করেছিল এক নূতনতর তত্ত্ব উদ্ভাবনে। পতনশীল জড়বস্তু বা আবর্তনশীল গ্রহ-উপগ্রহ এ-সবকে তিনি বললেন জ্ঞাতব্য ঘটনামাত্র। অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষ হচ্ছে পরীক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান মাত্র। এর অন্তরালে আছে স্থান-কাল বিষয়ক বিজ্ঞান। স্থানে অবস্থিত জড়পদার্থ ঐ স্থান ধর্মের বশীভূত হয়ে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ নিউটন যুগে যা ছিল বিজ্ঞান তা জ্ঞান পর্যায়ে চিহ্নিত হল এবং জড় ধর্মের পরিবর্তে স্থান-ধর্মই যথার্থ বিজ্ঞান রূপে বিবেচিত হল আইনস্টাইনের অভিমত অনুযায়ী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই সীমান্ত পরিবর্তন লক্ষণীয়, কেননা, তাদের বিভেদ-রেখার অগ্রগতিতে সূচিত হয়েছে বিজ্ঞানের প্রগতি। আজ যেটি তত্ত্ববিজ্ঞান নামে অভিহিত, আগামী কাল তা জ্ঞাতব্য তথ্যের পর্যায়ে অবনমিত হয়ে নূতনতর বিজ্ঞানের পথ প্রশস্ত করেছে, এ ঘটনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে বারংবার ঘটেছে। বস্তুত পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমারেখা আদৌ স্থাণু নয়। তাদের স্থান পরিবর্তন অবাঞ্ছিতও নয়। মানুষের চিন্তা-ভাবনা তো এগিয়েই যাবে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান সহায়ে বিজ্ঞানের চরম সত্যে পৌঁছানো যায় কিনা। অথবা আদৌ সেটি সম্ভবপর কিনা এ বিচার স্বতন্ত্র। দার্শনিকদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে।

যাই হোক, অজানাকে জানবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের উদ্যম অবশ্যই প্রশংসনীয়। তাঁরা নিরীক্ষণ-পরীক্ষণের সাহায্যে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলেন। আহৃত জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে একটা সুসংবদ্ধ তত্ত্বের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করেন। এইভাবে গড়ে ওঠে বিজ্ঞান। কালক্রমে সেই বিজ্ঞান নূতনতর জিজ্ঞাসার উদ্ভব ঘটায়। সেই জিজ্ঞাসার ফলে এমন অনেক তথ্যের সন্ধান মেলে যেগুলির ব্যাখ্যাপ্রদানে পুরানো বিজ্ঞান অপ্রতুল বা অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। তখন পুরানো ধারণাসমূহ সংশোধিত বা পরিত্যক্ত হয়ে নূতনতর বিজ্ঞানের পথ প্রশস্ত করে।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরূপ বিবর্তন আদৌ বিরল নয়। আলোক বিজ্ঞান এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোনো কিছু দেখবার জন্য আমরা চোখ মেলে তাকাই ও বস্তুটিকে দেখতে পাই। এই তাকানো ও দেখতে-পাওয়া, অর্থাৎ দৃষ্টিপাত ও দৃষ্টিবোধের মধ্যে কতো যে ব্যাপার আছে, কতো ঘটনা যে ইতিমধ্যে ঘটে যায় তা সহসা টের পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃতি-রহস্যের মূল অন্বেষণে যারা উৎসুক তাদের মনে এই নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া অফুরন্ত জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে। রজনীর অন্ধকার অপগত হলে দিনের আলো ফুটে ওঠে, দৃশ্যপটের পরিবর্তন হয়। কেন, কোন্ শক্তির সাহায্যে? চন্দ্রকিরণে ধরণীতল উদ্ভাসিত হয়, নভোমণ্ডল আলোকিত রূপ ধারণ করে। কেন,

কার প্রভাবে? প্রজলিত প্রদীপ গৃহাভ্যন্তরকে পরিদৃশ্যমান করে তোলে। ঐটুকু শিখা, তবু তার আলোতে ঘরের অন্ধকার দূরীভূত হয় কিভাবে?

Effect of Light বা আলোকসম্পাতের ফলাফল সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয় এমন একটি সহজ বিজ্ঞান যার সারমর্ম এইরূপ,

(১) দীপ্তিমান উৎস থেকে আলোকরশ্মি নির্গত হয়।

(২) সেই রশ্মি প্রকৃতপক্ষে কী তা না জানলেও ধরে নেওয়া যায়, আলোকের রেখাগতি আছে অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত না হলে রশ্মি সরলরেখা পথে প্রসারিত হয়।

(৩) ঐ রশ্মি প্রভাবে অন্য বস্তুসমূহ আলোকিত হয়।

(৪) উৎস হতে অথবা আলোকিত বস্তু থেকে নির্গত রশ্মি এক বা একাধিক স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে দর্শকের চক্ষুগোলকে প্রবেশ করে।

(৫) চক্ষুগোলকের কাজ অনেকটা চশমার কাচ বা লেন্সের মতো। আলোক-রেখাগুলি ঠিকমত তার মধ্যে প্রতিসরিত ও মিলিত হয়ে চক্ষুগোলকের পিছন দিকে অবস্থিত পর্দার উপর একটা ছবি প্রস্তুত করে।

(৬) সেই ছবির হুবহু ধারণা (impression) স্নায়ুবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে উপনীত হয়।

(৭) মনঃসংযোগের ফলে সেই ধারণাসমূহ এক অজ্ঞাত উপায়ে ছবিতে রূপান্তরিত হয় এবং দৃষ্টিবোধ জাগ্রত করে।

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, প্রথম পাঁচটি ধাপ বা ক্রম হচ্ছে বস্তুগত, কিন্তু ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্রম একান্তই মনোগত অর্থাৎ দর্শকের মন ও চেতনশক্তির উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, স্নায়ুর মধ্য দিয়ে কিভাবে optical impression বা আলোকসঞ্জাত ধারণাসমূহ মানসপটে উপস্থিত হয়, কিভাবেই বা চোখের পর্দার উপর গঠিত উল্টো ছবি (inverted image) মনোমধ্যে সোজা (erect) ছবির আকার ধারণ করে, তা একান্তভাবে দর্শকের অভিজ্ঞতা ও ধারণাশক্তির উপর নির্ভর করে।

প্রাথমিক জ্ঞানভিত্তিক এই আলোকবিজ্ঞান কালক্রমে বহুভাবে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে, মূল অনুমানগুলির সত্যতা সম্বন্ধে বহু জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত হয়েছে। তথাপি প্রাথমিক জ্ঞান সঞ্জাত সহজ বিজ্ঞান আজও আদরণীয়, কেননা, সহজভাবে উৎপন্ন ধারণাসমূহ দিয়ে তৈরী হয় উচ্চাঙ্গ বিচারবুদ্ধির বুনিয়াদ।

উদাহরণ স্বরূপ ধরুন 'আলোকরশ্মি'র কথা। দীপ্তিমান উৎস বা আলোকিত বস্তু থেকে একটা কিছু বেরুচ্ছে এই জ্ঞান প্রায় intuitive বা তৎক্ষণাৎ সঞ্জাত। কী

নির্গত হচ্ছে তা সঠিক না বুঝলেও সহজাত বুদ্ধিতে মানুষ তাকে বলে আলোক। কাব্যে-সাহিত্যে এই আলোক কতো নামেই না বর্ণিত! জ্যোতি, রশ্মি, কিরণ ইত্যাদি শব্দ তার দৃষ্টান্ত। যেহেতু আলোকের উৎসের বা আলোকিত বস্তুর দিকে তাকানো মাত্রই সেটিকে দেখতে পাওয়া যায় সেইহেতু স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হয়, ঐ আলোক স্থান হতে স্থানান্তরে আসতে কোনো সময় নেয় না অর্থাৎ তার বেগ অসীম। আলোকের সামনে কোনো অস্বচ্ছ বস্তু রাখলে বস্তুটির একটা ছায়া উৎপন্ন হয় এবং সেই ছায়ার জ্যামিতিক আকৃতি দেখে মনে হয় আলোক সোজাপথে (সরলরেখা পথে) আসতে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং অনুমান করা হয় আলোক সরলরেখা পথে অগ্রসর হয়।

স্বাভাবিভাবে উৎপন্ন জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ঐ জ্ঞান ভ্রমাত্মক হতে পারে। তাই প্রাথমিক জ্ঞানের সত্যাসত্য ঠিকমত পরীক্ষা করে দেখে নিতে হয়। বৈজ্ঞানিকগণ সেকাজ করে থাকেন। প্রাথমিক জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা আলোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। তাই এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে প্রচুর। তদনুযায়ী ধারণাগত পরিবর্তনও ঘটেছে অনেক।

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে আমরা সহজেই বুঝি দূরে উৎপন্ন কোনো শব্দ আমাদের কানে পৌঁছাতে একটু সময় নেয়। কিন্তু দূরের বস্তু দেখতে পাবার জন্য কোনো সময়ই লাগে না, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুটি থেকে নির্গত আলো চক্ষুগোলকে উপস্থিত হয়। মনে করুন, একটু দূরে কেউ কুঠার দিয়ে কাঠ কাটছে। কুঠারাঘাত তৎক্ষণাৎ দেখতে পাবেন, কিন্তু তার আওয়াজ শুনতে পাবেন একটু পরে। সুতরাং ধারণা হবে, আলোকের বেলায় বেগ বা গতির কোনো ব্যাপার নেই, আলোক-অনুভবটা যেন ঘটে 'তৎক্ষণাৎ' (কোনো সময় অতিবাহিত না হয়ে)।

এই ধারণার সত্যতা যাচাই ক'রে দেখতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (১৫৬৪—১৬৪২), কিন্তু তিনি যে পরীক্ষণের ব্যবস্থা করেন তাতে কোনো ফললাভ হয়নি। দুই ব্যক্তিকে বেশ একটু দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের হাতে ঢাকনা-দেওয়া একটি করে ল্যাম্প ও ঘড়ি। প্রথম জন আলোর ঢাকনা খুলল এবং টাইম দেখে রাখল। দ্বিতীয় জন (দূরে অবস্থিত) যখনই প্রথম জনের আলোটি দেখতে পেল তখনই নিজের আলোর ঢাকনা খুলে দিল। প্রথম জন দ্বিতীয় জনের আলোটি দেখামাত্র ঘড়িতে টাইম দেখে নিল। যদি আলোকের

কোনো নির্দিষ্ট বেগ থাকে তাহলে এই দুই টাইম বা সময়ের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু, হায়, কোনো পার্থক্যই ধরা পড়েনি। ধরা পড়ার কথাও নয়। কেননা, এটুকু পার্থিব দূরত্ব অতিক্রম করতে আলোকের যেটুকু সময় লাগবে ততটুকু সময়ের ব্যবধান রেকর্ড করার মতো কোনো ঘড়ি ছিল না। তাই এবিষয়ে ফললাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি।

ধারণাভ্রান্তির অবসান ঘটেছিল কিছুকাল পরে। আলোক প্রবাহের যে একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ (velocity) আছে, যদিও তা অতি প্রচণ্ড, একথা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করতে সমর্থ হন 'রোমার' নামক এক ডেনমার্কদেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ১৬৭৫ অব্দে। পৃথিবীর যেমন চাঁদ আছে, বৃহস্পতির তেমনি কয়েকটি চাঁদ (উপগ্রহ) আছে। পৃথিবীর ছায়ায় গ্রাসপ্রাপ্ত হলে যেমন চন্দ্রগ্রহণ হয়, তেমনি বৃহস্পতির ছায়ায় (সূর্যালোক ঘটিত) ঢুকে পড়লে তাঁর চাঁদেরও হয় গ্রহণ। সে গ্রহণ পৃথিবী থেকে দেখা যায় দূরবীণ দিয়ে। গ্রহণ যখনই ঘটে তখনি কি তা দেখা যাবে পৃথিবী থেকে? স্থান থেকে স্থানান্তরে পেঁছাতে আলোক প্রবাহ যদি একটু সময় নেয় তাহলে উক্ত গ্রহণের নির্ধারিত সময় আর পরিলক্ষিত সময়ের মধ্যে একটু ব্যবধান থাকবে বৈকি। রোমার (Romer) সাহেব এ-সব লক্ষ্য করেন সুনিপুণ ভাবে। বৃহস্পতি ও পৃথিবী উভয়েই ঘুরছে সূর্যকে আবর্তন করে। কিন্তু তাদের আবর্তনকাল এক নয়। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে যেখানে পৃথিবীর লাগে একটি বৎসর, সেখানে বৃহস্পতির লাগে প্রায় ১২ বৎসর (১১·৮৬)। সুতরাং এই অসম গতির জন্য পৃথিবী ও বৃহস্পতির মধ্যে দূরত্ব কম-বেশী হতে বাধ্য। তদনুযায়ী বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের গ্রহণ যে সময় ঘটবে আর যে সময়ে পৃথিবীতে তা দেখা যাবে এই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কখনো কম, কখনো বেশী হবে। রোমার সাহেবের পর্যবেক্ষণে এ-সব ধরা পড়ে এবং তিনি গণিতের সাহায্যে সহজেই প্রমাণিত করেন যে ঐরূপ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ব্যবধানের পার্থক্য হচ্ছে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাস (diameter) অতিক্রম করতে আলোকপ্রবাহের যেটুকু সময় লাগে তার সমান। এইভাবে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে (১) আলোক প্রবাহের একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ (velocity) আছে, (২) সেই গতিবেগের পরিমাণ হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ সাতাশি হাজার মাইল (১,৮৭,০০০ মাইল/সেকেণ্ড)।

বিজ্ঞানের দিক থেকে আলোকের গতিবেগ নির্ণয় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু আলোকবিজ্ঞানে নয়, বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আলোকের গতি-পরিমাণ এক ধ্রুবক (constant) রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। সেই কারণে, নানাবিধ উপায়ে

নির্ভুলভাবে ঐ গতিবেগের পরিমাণ নির্ণয়ে যত্নবান হয়েছেন একাধিক বিজ্ঞানী। ফিজ্ (Fizeau), ফুকো (Foucault), মাইকেলসন (Michelson) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পথিকৃৎ রোমারের পরীক্ষণ ছিল আকাশে গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি নিয়ে। আর, শেষোক্ত বিজ্ঞানিগণ এ-কাজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন পার্থিব সাজ-সরঞ্জাম। তাঁদের গণনা অনুযায়ী বর্তমানে আলোকের গতিবেগ ধরা হয় প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,২৮১ মাইল (শূন্য মাধ্যমে বা in empty space)।

আলোকের গতিবেগের পরিমাণ কি প্রবাহ মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল? পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, হাঁ নির্ভরশীলতা আছে। পদার্থবিহীন বা শূন্য মাধ্যম অপেক্ষা বাতাসের মধ্যে আলোক প্রবাহের গতিবেগ একটু কম হয়। জল বা অন্য কোনো ঘনতর মাধ্যমে আলোকের গতিবেগ আরও কম হয়। সুতরাং শূন্য মাধ্যম বা empty space-এর মধ্যে প্রবাহিত হবার সময় আলোকের গতিবেগ হয় সর্বোচ্চ ও অপরিবর্তনীয়। পরীক্ষণলব্ধ এই জ্ঞান আলোকবিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি।

আলোকের স্বরূপ কী, উৎস থেকে রশ্মির আকারে যা নির্গত হয় প্রকৃতপক্ষে সেটি কী, এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসু মনকে আলোড়িত করে। আলোক সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান সঞ্চয়ের পর যে-ধারণা সহজেই উৎপন্ন হয় তা হচ্ছে, আলোকের কণাবৎ আচরণ। কল্পনা করা হয়, উৎস থেকে অসংখ্য আলোককণা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে, মাধ্যম দিয়ে সেগুলি প্রবাহিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত দর্শকের চক্ষুগোলকে উপস্থিত হয়ে আলোক-বোধ সৃষ্টি করে। আলোক অর্থে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আলোক-কণিকার সমষ্টি, এই হচ্ছে মূলকথা। কণাসমূহ উৎস থেকে কিভাবে উৎসারিত হয়, কোন্ শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তারা প্রচণ্ড বেগে বাহিত হয় ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্ন উহ্য রেখে কল্পিত হয় যে ঐগুলি আপনা হতেই সরলরেখা পথ ধরে এগিয়ে যায়, দর্পণের উপর আপতিত হলে জ্যামিতিক নিয়মে প্রতিফলিত হয়, এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করার মুখে দিক্ পরিবর্তন করে (যার নাম প্রতিসরণ), স্বচ্ছ মাধ্যম পেলে তার মধ্য দিয়ে আলোককণার প্রবাহ চলতে থাকে, অস্বচ্ছ মাধ্যমে বাধা পেলে তারা অবরুদ্ধ হয়ে যায়, উৎসের সামনে কোনো বাধা থাকলে ছায়া তৈরী হয়, ইত্যাদি।

আলোকের সত্তা সম্বন্ধে ধারণার কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলেও যেহেতু কণাতত্ত্বের (Corpuscular Theory) সাহায্যে আলোকের প্রতিফলন, প্রতিসরণ ইত্যাদি

সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়, সেই হেতু এই তত্ত্বটি গ্যালিলিও-নিউটনের যুগে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ দৃঢ়মূল হয়েছিল। স্বয়ং নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) এই তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। আলোককণার রকমারি সাইজ (ছোট, বড়, মাঝারি ইত্যাদি) কল্পনাপূর্বক আলোকের বিভিন্ন রঙের ব্যাখ্যা প্রদান করতেও সমর্থ হয়েছিলেন তাঁরা।

কিন্তু নিরীক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও কল্পনাপ্রসূত বিজ্ঞানের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আলোকবিজ্ঞানের বেলায় অনেকটা ঘটেছিল তাই। উৎস থেকে যেটি নির্গত হয় তা কণা না হয়ে তরঙ্গও তো হতে পারে। জলের ঢেউ, শব্দের ঢেউ ইত্যাদির মতো আলোকের ঢেউ কল্পিত হলে ক্ষতি কি ? আলোকের বেলায় অবশ্য একটু বিশেষত্ব আছে। জল ব্যতীত জলের ঢেউ হয় না। শব্দের ঢেউ প্রবাহিত হতে হলে চাই একটা জড় মাধ্যম। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পদার্থহীন শূন্য মাধ্যমেও আলোক স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হতে পারে। নতুবা সূর্য থেকে মহাশূন্য ভেদ ক'রে আলোক পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে কেমন কোরে ?

ঢেউয়ের সামনে ছোটখাটো কোনো বাধা থাকলে অনেক সময় ঐ ঢেউ বাধাটির গা বেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। সূক্ষ্ম পরীক্ষার সাহায্যে দেখা যায় আলোকের বেলায় এরূপ ঘটনা ঘটে ; অতি ক্ষুদ্র সাইজের বাধাকে পাশ কাটিয়ে গা-বেয়ে আলোক এগিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া, দুটি সর্বসম উৎসবিন্দু থেকে উৎসারিত আলোক পরস্পরের প্রভাবকে খণ্ডিত ক'রে অদূরে আলোর পরিবর্তে অন্ধকার সৃষ্টি করতে পারে। কণাতত্ত্বে এরূপ ঘটনার (interference-এর) ব্যাখ্যা মেলে না।

তাই, কণাতত্ত্বের পাশাপাশি আলোকের তরঙ্গ-তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল। মহামতি এরিস্টটলের যুগ থেকে আলোকের তরঙ্গপ্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা প্রচলিত থাকলেও এটির একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করেন Huygens (১৬২৯-১৬৯৫) নামক এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তরঙ্গ-শীর্ষ বিষয়ে তাঁর কল্পনা সেযুগে সত্যই অভিনব ছিল। আলোকপ্রবাহকে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন তরঙ্গশীর্ষের নৃত্যছন্দে অগ্রগামিতা রূপে। ঢেউ-এর মাথাগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন একটি কাল্পনিক প্রচ্ছদ (envelope) সৃষ্ট হয়। সেই প্রচ্ছদ বা চাদরের প্রত্যেকটি বিন্দু যেন আলোকের নবতর উৎস বা নবতরঙ্গের প্রেরক। ঐসব ছোট ঢেউগুলি পরস্পর কিছুটা কাটাকাটি করে তৈরী করে নূতন একটি তরঙ্গশীর্ষ যা থেকে আবার একই প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে আসে নূতন নূতন ঢেউ। একেই তিনি বলতেন, আলোক-প্রবাহ।

আলোকের কণা-প্রকৃতি ও তরঙ্গ-প্রকৃতির মধ্যে কোন্‌টি সত্য, এ-প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন ছিল সে-যুগে। আজও সে-প্রয়োজন একেবারে ফুরোয়নি, যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সে-ব্যাপারে অনেক কিছুই আলোচ্য। গুরুত্বপূর্ণ সেই তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ (কণাবৎ আচরণ ও তরঙ্গবৎ আচরণের সহাবস্থান) বিজ্ঞান-দর্শনের অঙ্গীভূত।

আলোক সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানে উপনীত হবার পথে কয়েকটি বিষয় জ্ঞাতব্য—

(১) কণাতত্ত্ব অনুযায়ী আলোকপ্রবাহ হচ্ছে প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন অসংখ্য আলোক-কণার অগ্রগতি। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করার মুখে আলোক-প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয়, কণাসমূহের গতিবেগ পরিবর্তনের ফলে। এই ঘটনার পারিভাষিক নাম প্রতিসরণ (refraction)। [প্রতিসরণের ফলে যা ঘটে তার সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত। এক গামলা জলে একটা লম্বা কাঠির কিছুটা ডুবিয়ে রেখে উপর থেকে দেখলে মনে হয় জলে-ডুবে-থাকা অংশটা যেন মূল কাঠি থেকে ভেঙে একটু উপরে উঠে গেছে। প্রতিসরণের ফলে জলে-ডুবে-থাকা অংশের ছবি এবং বাকী অংশের ছবি এক লাইনে থাকে না। একটা জলপূর্ণ পাত্রে নিজের হাতের আঙুলগুলো ডুবিয়ে রেখে উপর থেকে দেখলে মনে হয় যেন সেগুলো লম্বায় ছোট হয়ে গেছে। এও প্রতিসরণের ফল। লেন্সের মধ্য দিয়ে কোনো বস্তুর যে-ছবি প্রতিভাত হয় তা একই কারণে। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময়ে গোলাকার সূর্যকে কিছুটা 'থ্যাবলা' দেখায় সে ঐ দিগন্ত সন্নিকটে বায়ুমণ্ডলে আলোকের প্রতিসরণ জন্য।]

(২) লঘু থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করার মুখে আলোকরেখার দিক্ পরিবর্তন কতটুকু হবে তা নির্ধারণের জন্য কণাতত্ত্বের প্রবক্তাগণ একটা হিসাব-নিকাশ করেছিলেন। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন ঘনতর মাধ্যমে যাবার মুখে আলোকের গতিবেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বাতাসের তুলনায় জলে আলোকের বেগ বেশী।

(৩) তরঙ্গতত্ত্ব অনুযায়ী আলোকের প্রতিসরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানি-গণকে যে-অনুমান করতে হয়েছিল তা কিন্তু ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ তাঁদের হিসাবে, বাতাস থেকে জলে প্রবেশের মুখে আলোকের গতিবেগ কমে যাবে। বেগ কতোটা কম হবে তারও একটা সুনির্দিষ্ট হিসাব আছে। সেটি নির্ভর করে refractive index বা প্রতিসরণাঙ্কের উপর।

(৪) যেহেতু একই ঘটনার ব্যাখ্যায় তৎকালে প্রচলিত কণা-তত্ত্ব ও তরঙ্গ-তত্ত্বে

আলোকের বেগ সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী অনুমান করতে হয়েছিল সেইহেতু দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তা ঠিক করার জন্য বাস্তব পরীক্ষার আশ্রয় নিতেই হয়। হাতে-কলমে পরীক্ষা অন্তে দেখা গেল, বাতাসের তুলনায় জলে আলোকের গতিবেগ কম। সুতরাং পরীক্ষণলব্ধ জ্ঞানের ফলে আলোকবিজ্ঞানে সে-যুগের কণাতত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়েছিল এভাবে এবং পরিবর্তে এসেছিল তরঙ্গতত্ত্ব। কিন্তু বিজ্ঞান সেখানে থেমে থাকেনি। এক প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে বহু প্রশ্নই অনুচ্চারিত থেকে গিয়েছিল সে-যুগে। আজও তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি।

কিসের তরঙ্গ, কেমন তরঙ্গ, তরঙ্গ-ভঙ্গিই বা কেমনতর এ-সব প্রশ্ন উঠতেই পারে। বিজ্ঞানী Huygens (যাঁর নাম পূর্বে উল্লেখ করেছি) তাঁর তরঙ্গ-পরিকল্পনায় আলোক তরঙ্গের যে মডেল বা চিত্র উপস্থিত করেছিলেন, কালক্রমে বাস্তববিচারে তার অনেক পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। আলোকের উৎস থেকে নির্গত রশ্মি যে-আকারে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয় তা আসলে কোনো জড়তরঙ্গের বিস্তার নয়, প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে মাধ্যমের বিভিন্ন বিন্দুতে বিদ্যুৎ-চুম্বকক্ষেত্রের এক ছন্দোবদ্ধ পরিবর্তন মাত্র। উৎসজনিত শক্তিপ্রবাহ এইভাবে এগিয়ে যায়। আলোকের এই **electromagnetic theory** বা বিদ্যুৎ-চুম্বকক্ষেত্র তত্ত্ব উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানজগতে এক অভিনব উদ্ভাবন, যার ফলে আলোক সম্পর্কিত পূর্বেকার ধারণাসমূহ সমূলে পরিবর্তিত হয়েছে। তাপ প্রবাহ, দৃশ্যমান আলোক ও অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ (যথা এক্স-রে, আলট্রাভায়োলেট ইত্যাদি) এ-সব যে একই গোষ্ঠীভুক্ত **radiation** (পার্থক্য শুধু তরঙ্গদৈর্ঘ্যে), পরীক্ষণলব্ধ এই জ্ঞান যথার্থই এক বিস্ময়কর আবিষ্কার।

আলোকের তরঙ্গপ্রকৃতি বিষয়ে এরূপ ক্ষেত্রতত্ত্বের উৎপত্তির ফলস্বরূপ আলোকের কণা-প্রকৃতি সম্বন্ধে মূল ধারণাটি সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও বিজ্ঞানীদের মন থেকে সেটি অবলুপ্ত হয়নি। কেন তা হয়নি, আলোক-কণিকার ধারণা কেন পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল সে-ইতিহাস কিঞ্চিৎ জটিল হলেও যথেষ্ট চমকপ্রদ। কোনো ধাতব পদার্থের উপর উপযুক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকসম্পাত হলে ঐ পদার্থটির উপরিভাগ (surface) থেকে ইলেকট্রন নির্গমন ঘটে। এই ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে কয়েকটি নূতন ধারণার উদ্ভব হয়, 'ফোটন' তাদের অন্যতম। এই ফোটনের গুণধর্ম বিচারে সেটিকে আলোক-কণিকা নামে অভিহিত করা চলে, যদিও প্রকৃতপক্ষে ফোটনের স্বরূপ কী, বা তার মধ্যে তরঙ্গপ্রকৃতি ও কণাপ্রকৃতি এই উভয়ের সহাবস্থান

লুকিয়ে আছে কিনা অর্থাৎ তরঙ্গভঙ্গি ও কণা-ভঙ্গির দ্বৈত সত্তা অন্তর্নিহিত আছে কিনা এ-বিচার অনিবার্যভাবে বিজ্ঞানরাজ্যে এসে পড়ে।

আলোকের কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, ঐ ফোটন হচ্ছে আলোকের ক্ষুদ্রতম অংশ। আলোকসম্পাতের অর্থ হচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক ফোটনের আবির্ভাব ও অভিঘাত। তাহলে কি ফিরেঘুরে আবার আমরা নিউটন-কল্পিত আলোক-কণার (light corpuscles) ধারণায় উপনীত হচ্ছি? না, তা নয়। ফোটন হচ্ছে electromagnetic radiation-এর ক্ষুদ্রতম অংশ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় light quantum বা আলোক-কণিকা। পদার্থ ও বিদ্যুতের ন্যায় আলোকেরও ক্ষুদ্রতম অংশ (কোয়াণ্টাম) আছে, পরীক্ষণলব্ধ এই জ্ঞান হচ্ছে নবতম আলোক-তত্ত্বের মূল অনুমান। বিভিন্ন রঙের আলোকে কি ভিন্ন ভিন্ন আলোক-কণিকা (কোয়াণ্টাম) বিদ্যমান থাকে? হাঁ, তাই। আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যতো বেশী (অর্থাৎ frequency যতো কম) ততই কম হয় তার শক্তি। বেগুনি আলোর তুলনায় লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় ডবল (দ্বিগুণ)। অতএব প্লাঙ্কের ফরমূলা অনুযায়ী ($e=h\nu$) লাল আলোক-কণিকার শক্তি বেগুনির তুলনায় প্রায় অর্ধেক।

পুরানো প্রশ্নে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা জাগে, আলোক কি তরঙ্গ, না কণিকা? ফোটনের দ্বৈত আচরণ এ-প্রশ্নকে পুনর্জীবিত করে। কতকগুলি ঘটনা যথা interference, diffraction অঙ্গুলি নির্দেশ করে তরঙ্গের দিকে, আবার ধাতব বস্তুর উপর আলোকসম্পাতের দরুন যে photo-electric effect হয়, তার ব্যাখ্যায় আলোক-কণিকার ধারণা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

একটা যুগ ছিল যখন বিজ্ঞানে নির্ণয়বাদ অতিমাত্রায় প্রত্যয়িত ছিল। কোনো একটি বস্তু বা সত্তার স্বরূপ একরকমই হবে, রকমারি হবে না, এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল uniqueness বা ঐকৈকতা। পদার্থ যে বহুরূপী হতে পারে, কখনো তা কণারূপে কখনো বা তরঙ্গরূপে প্রতিভাত হতে পারে এ-ধারণা বিজ্ঞান-বিগর্হিত বিবেচিত হোত।

কিন্তু যুগের পরিবর্তন হয়েছে। গণিতে, বিজ্ঞানে, দর্শনে পদার্থের সূক্ষ্ম সত্তা সম্বন্ধে দ্বিমুখী বা বহুমুখী স্বভাবধর্ম স্বীকৃতি লাভ করেছে। অর্থাৎ এখন 'একবস্তু, এক মডেল' নামক ঐকৈক চিন্তা আর বাধা সৃষ্টি করে না।

কথায় কথায় কোথায় এসে পড়েছি ! তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে অবশ্য এরূপ চিন্তা-বিস্তারের ঠাঁই আছে। কল্পনার জাল বুনে মানুষ সত্যে উপনীত হতে চেষ্টা করবে, এতে ক্ষতি কি? এক বাস্তব থেকে অন্য বাস্তবে উপস্থিত হওয়াটা কম লাভের নয়।

আলোক-বিজ্ঞানের সূত্র ধরে তড়িৎ-বিজ্ঞানে বা কম্পন-বিজ্ঞানে পৌঁছানো, অথবা তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের রেশ ধরে পরমাণু বিজ্ঞানের অন্দরমহলে প্রবেশ, এ-সবেরই একটা বৈজ্ঞানিক তৃপ্তি আছে। প্রকৃতির রাজ্যে সবই যে একসুরে বাঁধা, এক নিয়মের অনুবর্তী, এ প্রত্যয় কি দার্শনিক বিচারে অমূল্য নয় ?

সঙ্গত কারণে আলোক সম্পর্কিত জ্ঞানসঞ্চয়ের নাম দিয়েছি 'বিজ্ঞানে হাতে খড়ি'। বর্ণপরিচয়ের প্রথম উদ্যমকে যেমন বলা হয় হাতে খড়ি, তেমনি যে-আলোক নিজে অদৃশ্য থেকে অপরকে আলোকিত তথা দৃশ্যমান করে তোলে, যে-আলোকের রশ্মি উৎস-নির্গত হয়ে নানাভাবে শক্তির পরিচয় প্রদান করে, পরমাণুর অভ্যন্তরে অবস্থিত ইলেকট্রনসমূহের ঝম্পপ্রদানের খবরাখবর জোগায়, সেই আলোক সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন বিজ্ঞানরাজ্যে উপনীত হবার প্রথম সোপান।

সঙ্গত কারণেই সাহিত্যে, দর্শনে, জীবনযাত্রায় আলোক বিষয়ক জ্ঞান ও উপলব্ধি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে উত্তীর্ণ হবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয় একই কারণে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। উপনিষদের ঋষি আরও গভীরে গিয়ে প্রকৃত বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। কেণেষিতং বাচমিমাং বদন্তি। চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ (—কেনোপনিষদ ১/১) কার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে লোকসকল কথা বলে, কার দ্বারা নিয়োজিত হয়ে চক্ষু কর্ণ আপন আপন বিষয়ে যুক্ত হয় ? প্রশ্নটি সুগভীর সন্দেহ নেই। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, তত্ত্ববেত্তা সকলেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন সদুত্তর পাবার জন্য। তাঁদের পথ পৃথক হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য একই—যার নাম সত্যানুসন্ধান।

৫

পরিমাপ বিজ্ঞান

—একক ও মাত্রা—

সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ধারণের নাম পরিমাপ। এটি একটি পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া, যার সঙ্গে আমরা দৈনন্দিন জীবনে অল্পবিস্তর পরিচিত। কোনো বস্তু-খণ্ডের আকার, আয়তন, অবস্থান ইত্যাদি জানার জন্য আমরা space measurement বা স্থান-পরিমাপের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকি। space বা স্থান প্রকৃতপক্ষে কী, দূরত্ব কাকে বলে, এটি আপেক্ষিক কিনা এ-সব তাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও আমরা ব্যবহারিক বুদ্ধি সহায়ে অগ্রসর হই এবং দূরত্ব নিরূপণের চেষ্টা করি। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এগুলি আসলে দূরত্বের নামান্তর মাত্র। কোনো বিন্দুর অবস্থান বর্ণনায় যে স্থানাঙ্ক (co-ordinates) ব্যবহৃত হয় তাও ঐ দূরত্বের পরিচায়ক। সেই কারণে, length বা দূরত্ব পরিমাপ বিজ্ঞানে এক মৌলিক মাত্রা (dimension) রূপে পরিগণিত।

অনুরূপভাবে আরো দুটি মাত্রার কথা এসে পড়ে। একটি হচ্ছে mass বা কোনো বস্তুতে অবস্থিত পদার্থের পরিমাণ (quantity of matter)। অন্যটি হচ্ছে time বা কাল। যেহেতু কোনো বস্তুতে পদার্থের পরিমাণ বেশী হলে তার ওজন সেই অনুপাতে বেশী হয় সেজন্য mass-এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয় 'ভর' নামক শব্দটি। কিন্তু বুঝে নিতে হবে কোনো বস্তুর ওজন এবং তার ভর (পদার্থের পরিমাণ) একার্থজ্ঞাপক নয়। প্রথমটি নির্ভর করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণজনিত টানের উপর, অপরটি নির্ভর করে কতোটা পদার্থ বস্তুটিতে নিহিত আছে তার উপর। পৃথিবীর টান কোনো কারণে কমবেশী হলে বস্তুটির ভর কমবেশী হবে, যদিও তাতে পদার্থ-পরিমাণের কোনো হেরফের হবে না। দৈর্ঘ্যের ন্যায় ভর বা mass হচ্ছে একটি মৌলিক মাত্রা। তৃতীয় মৌলিক মাত্রা হচ্ছে time বা কাল। এই তিনটি মৌলিক মাত্রা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে পরিমাপ বিজ্ঞান।

সময় বা কাল কাকে বলে? কাব্যের ভাষায় আমরা বলে থাকি, 'সময় বহিয়া যায়'। কিন্তু কী বয়ে যায়, কিসের প্রবাহ তা জেনেও যেন সঠিক জানি না। সময়-জ্ঞাপক ঘড়ি দেখে বলে উঠি, এতটা বাজল অথবা এত ঘণ্টা এত মিনিট অতিবাহিত হয়েছে। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, আমরা দেখছি চলমান ঘড়ির দুটো

কাঁটার স্থান-পরিবর্তন, অন্য কিছু নয়। দৈর্ঘ্য পরিমাপের বেলায় যেমন দুটি বিন্দুর অবস্থানের ব্যবধান মেপে থাকি, তেমনি দুটি ঘটনার ব্যবধানে 'একটা কিছু' অতিবাহিত হচ্ছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা করে থাকি সময়-নির্ণয়। আসলে সময়ের কোনো বস্তুগত অস্তিত্ব নেই, এটি আমাদের কল্পনাপ্রসূত বলা চলে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত নামক দুটি প্রত্যক্ষ ঘটনা অবলম্বনে আমরা সময়ের ব্যবধান অনুমান করি, কল্পিত দিনমানকে সমভাবে ভাগ করে নিয়ে 'ঠাহর' করি প্রহর, দণ্ড ইত্যাদি। আবার সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পৌনঃপুনিক আবর্তন লক্ষ্য করে ধরে নিই সৌরবর্ষের অস্তিত্ব। প্রকৃত সূর্যের পরিবর্তে এমন এক মন-গড়া সূর্য কল্পনা করি, যার বার্ষিক গতিতে কোনো হেরফের নেই। এহেন সূর্যের পারিভাষিক নাম Mean Sun, যার গতি অবলম্বনে আমরা নির্ণয় করে থাকি অনুমান ও Mean Solar Time. কেন এমন কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়, সে-আলোচনা সময় বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত।

মোটকথা, দৈর্ঘ্য, ভর ও কাল নামক যে তিনটি উপাদান নিয়ে পরিমাপের যা-কিছু ব্যবস্থা, সেগুলির প্রত্যেকটির অস্তিত্ব অনেকটা কল্পনার আশ্রয়ে। তাতে অবশ্য ক্ষতি নেই। সুসংবদ্ধ ও পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুমানগুচ্ছ দিয়ে বিজ্ঞান রচিত হতে পারে, যদি সেই অনুমান-লব্ধ ফলসমূহের সঙ্গে বাস্তবের কোনো গরমিল পরিলক্ষিত না হয়। বিজ্ঞানে এই অনুমান-নির্ভরতা মনে রেখে অগ্রসর হলে, অর্থাৎ limitation বা সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন থাকলে বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ সহজতর হয়ে আসে।

কোনো কিছু মাপতে হলে একটা মাপকাঠি মেনে নিতে হয়। ইংরেজিতে এই মাপকাঠিকে unit বলে, বাংলায় তাকে 'একক' বলা চলে। চলনসই এককের উদ্ভাবন আমরা করে থাকি দৈনন্দিন জীবনে। এক-কাপ চা, এক-চামচ চিনি, এক-বাটি দুধ, এক-থালা ভাত, এক-ফোঁটা মধু, এক-হাত জমি, এক-হাঁটু জল, এক-প্রহর বেলা, এক-পলক চাহনি ইত্যাদি কথার ব্যবহার প্রচলিত। পরিমাণ প্রকাশের জন্য কাপ, চামচ, বাটি, থালা, ফোঁটা, হাত, হাঁটু, প্রহর, পলক শব্দগুলি ব্যবহৃত। উল্লেখ্য নিষ্প্রয়োজন, এই মাপগুলি চলনসই হলেও আদৌ সুনির্দিষ্ট নয়। আমার বাড়ীর কাপ, চামচ, থালা, বাটির আয়তন বা বস্তুধারণ ক্ষমতা আপনার বাড়ীতে ব্যবহৃত ঐগুলির সঙ্গে সমান নাও হতে পারে। সেজন্য সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্বত্র সমান এককের প্রচলন থাকা উচিত, যদি আমরা সঠিকভাবে পরস্পর-বোধ্য হতে চাই।

দৈর্ঘ্যের জন্য ফুট-ইঞ্চি বা মিটার-সেন্টিমিটার, ভরের জন্য পাউণ্ড-আউন্স বা কেজি-গ্রাম দেশবিদেশে প্রচলিত। সময় পরিমাপের জন্য ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত। আমাদের দেশে এককালে মন-সের-ছটাক, অঙ্গুলি-বিঘৎ-হাত, প্রহর-দণ্ড-পল এ-সবের ব্যবহার ছিল। বর্তমানে ঐসব এককের স্থান অধিকার করেছে কেজি-গ্রাম, মিটার-সেন্টিমিটার ও ঘণ্টা-মিনিট সেকেণ্ড। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট একক নির্ধারণ অতীব প্রয়োজন। এই কারণে দেশবিদেশের বিজ্ঞানিবৃন্দ মিলিত-ভাবে স্থির করেছেন এ-বিষয়ে এক একটা International Standard বা আন্তর্জাতিক মান, যার ভিত্তিতে চলে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদান-প্রদান।

দৈর্ঘ্যের এরূপ এককের নাম হচ্ছে মিটার, তার এক শতাংশের নাম সেন্টি-মিটার। ইঞ্চি মাপে এক মিটার সমান ৩৯·৩৭০১ ইঞ্চি অর্থাৎ ১ গজ বা দুই হাতের চেয়ে একটু বেশী। মিটারের মান কিভাবে নিরূপিত হয়েছিল বা হচ্ছে? উত্তরে বলা যায়, ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমি (French Academy of Science) স্থির করেছিলেন যে, পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে বিষুববৃত্ত (equator) পর্যন্ত দূরত্বের (আপাতদৃষ্টিতে অপরিবর্তনীয়) কোটি ভাগের এক ভাগকে বলা হবে এক মিটার। জ্যোতির্বিজ্ঞান পদ্ধতিতে নিরূপিত হয়েছিল ঐ দূরত্ব এবং তদনুযায়ী একটা প্লাটি-নাম-ইরিডিয়ম মিশ্রধাতু নির্মিত রডের উপর দাগ কেটে স্থিরীকৃত হয়েছিল এক মিটার দৈর্ঘ্য। ধাতব রড ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল যাতে এটির কোনো ক্ষয়-ব্যয় না হয়। তাছাড়া শতকরা ৯০ ভাগ প্লাটিনাম ও ১০ ভাগ ইরিডিয়ম দিয়ে তৈরী শংকর ধাতুর (alloy-এর) আরো অনেকগুলি গুণ বর্তমান থাকায় স্থিরতা দিক দিয়ে এরূপ মানদণ্ড বিশেষ উপযোগী।

এহেন মানদণ্ডের কোনো পরিবর্তন হবে না, এই ঠিক ছিল। কিন্তু প্রগতিশীল বিজ্ঞানজগতে নব নব ধারণার উন্মেষের অন্ত নেই। বৈজ্ঞানিকদের মনে হতে লাগল, স্থিরতার দিক্ দিয়ে ধাতুনির্মিত দৈর্ঘ্যের চেয়ে আরও বেশী নির্ভরযোগ্য হচ্ছে 'তরঙ্গদৈর্ঘ্য'। কোনো মৌলিক পদার্থ (element) উত্তেজিত অবস্থায় যখন আলোক বিকিরণ করে তখন সেই আলোক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পদার্থটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এক-একটি অতি-নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক তার বর্ণালীতে বিদ্যমান। সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিমাপ যেন ঐ পদার্থের অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় চিহ্ন বিশেষ। সুতরাং এরূপ একটা তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে অবশ্যই standard length বা 'প্রমাণ দৈর্ঘ্য' ধরা যায়। এই মতবাদ অনুযায়ী ক্রিপ্টন (Krypton) নামক মৌলিক পদার্থের একটি আইসোটোপ (isotope) বেছে নেওয়া হয়।

(আইসোটোপটির পরমাণু সংখ্যা atotmic number হচ্ছে ৩৬, পরমাণুভর হচ্ছে ৮৬)।

এই আইসোটোপ নির্গত আলোকের 'তরঙ্গদৈর্ঘ্য' এমনই, যার এতটুকু হেরফের হয় না। সুতরাং এটিকে স্বচ্ছন্দে দৈর্ঘ্যের একক রূপে পরিগণিত করা চলে। এরূপ ১,৬৫০,৭৬৩·৭৩ সংখ্যক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমতুল হচ্ছে এক মিটার।

এতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাপের কি প্রয়োজন আছে ? আছে নিশ্চয়, নতুবা এ নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ এত সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কেন ? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু মধ্যে আবর্তনশীল ইলেকট্রনের কক্ষপথের পরিমাপ যদি করতে হয়, এবং দৈর্ঘ্য নামক মাত্রার মৌলিক ধারণাকে যদি যথার্থই সুস্পষ্টতম করে তুলতে হয় তাহলে দৈর্ঘ্যের মানকে সুনির্দিষ্ট করতেই হবে। ১৯৬০ সালে SI unit of length স্থিরীকৃত হয়েছিল এইভাবে।

ভর বা mass-এর একক নির্ধারণ অনুরূপভাবে করা হয়। এককটির নাম 'কিলোগ্রাম' যা সাধারণভাবে 'কেজি' নামে পরিচিত। ফ্রান্স দেশের প্যারিস শহরে বিজ্ঞান একাডেমি কর্তৃক সংরক্ষিত আছে প্লাটিনাম-ইরিডিয়ম ধাতুনির্মিত এক কেজি ওজনের একটি 'বাটখারা' যেটিকে ধরা হয় প্রমাণ কেজি রূপে। ভারতবর্ষে সের-ছটাকের পরিবর্তে কেজি, গ্রাম ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন হয়েছে প্রায় তিন দশক আগে হতে। পুরাতন মাপের বদলে নূতন মাপ যথা সেন্টিমিটার-মিটার, গ্রাম-কিলোগ্রাম ইত্যাদি প্রবর্তনের মুখে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন, বেশ তো ছিল, এ-সব আবার কেন ? অর্থাৎ পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধনের এমন কি প্রয়োজন ছিল ? উত্তরে সে-সময় নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল নূতন পদ্ধতিটি more scientific বা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। পুরনো প্রথা কি তাহলে unscientific বা অবৈজ্ঞানিক ছিল ? ঠিক তা নয়। কেননা, চতুর্গুণ করে এগিয়ে যাওয়া যথা পয়সা-আনা-সিকি-টাকা অথবা ছটাক-পোয়া-সের, এরও একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। সহজ উপায়ে হিসাব-নিকাশ করতে পাটিগণিতের আর্যা, ছড়া ইত্যাদি যথেষ্ট বিজ্ঞানবোধের পরিচয় বহন করে। সেইসব মৌখিক সূত্রগুলি আজও মানসাঙ্ক সমাধানের সহায়ক,—যেন এক একটি calculator।

পুরাতন পদ্ধতিতে একআধটুকু অসুবিধা যা ছিল, তা হচ্ছে লঘুকরণের বেলায় গুণক নিয়ে। যেমন, মনকে সেরে পরিণত করতে হলে ৪০ দিয়ে গুণ করতে হয়, সেরকে ছটাকে আনতে হলে ১৬ দিয়ে, ছটাককে তোলায় আনতে হলে ৫ দিয়ে। গজকে ফুটে পরিণত করতে ৩ দিয়ে, ফুটকে ইঞ্চিতে আনতে ১২ দিয়ে গুণ করতে

হয়। গুণকের এই বিভিন্নতা অনেক ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি হিসাব করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

মেট্রিক পদ্ধতিতে গুণক একটাই—সেটা হচ্ছে সংখ্যা ১০। ছোট একক থেকে বড় এককে পৌঁছাতে হলে ভাগ করে যেতে হয়। এই পদ্ধতিতে ভাজক একই সংখ্যা ১০। সুতরাং হিসাব করতে কোনো অসুবিধা নেই। সংখ্যাগণনা পদ্ধতিতে সংখ্যা ১০-এর স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দশমিকের গুণে বা ভাগে দশমিক বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় যেমন সহজ, তেমনি সুবিধাজনক। তাই এই সহজ প্রণালীটির সদ্ব্যবহার করা হয়ে থাকে পরিমাপ পদ্ধতিতে। Metric System এই কারণে বিজ্ঞানিমহলে সমাদৃত। সংখ্যা গণনায় যেমন এক, দশ, শত, সহস্র ইত্যাদি তেমনি পরিমাপে ব্যবহৃত হয় unit, deca, hecto, kilo ইত্যাদি। আবার ১-কে ক্রমাগত ১০ দিয়ে ভাগ করে গেলে যেমন পাওয়া যায় দশমাংশ, শতাংশ, সহস্রাংশ ইত্যাদি তেমনি পরিমাপে পাই deci, centi, milli ইত্যাদি।

অঙ্কের ভাষায় তালিকাটি এইরূপ :—

milli (এক সহস্রাংশ) $= \cdot 001 = \frac{1}{1000} = 10^{-3}$

centi (এক শতাংশ) $= \cdot 01 = \frac{1}{100} = 10^{-2}$

deci (একক দশমাংশ) $= \cdot 1 = \frac{1}{10} = 10^{-1}$

unit (একক) $= 1 \cdot 0 = 1 = 10^{0}$

deca (দশগুণ) $= 10 = 1 \times 10 = 10^{1}$

hecto (শতগুণ) $= 100 = 1 \times 10^{2} = 10^{2}$

kilo (সহস্রগুণ) $= 1000 = 1 \times 10^{3} = 10^{3}$

তালিকায় লক্ষণীয় এই যে, ১০-এর power যথাক্রমে $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ হয়ে অর্থাৎ ধাপে ধাপে ১ বেড়ে 'মিলি' থেকে 'কিলো' পর্যন্ত প্রকাশ করে। এই sequence বা ক্রম একান্তই গণিতসম্মত এবং সংখ্যা গণনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কোনো বড় বা ছোট রাশিকে সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য বিজ্ঞানে একটি প্রথা প্রচলিত আছে। তাকে বলা হয় exponential form বা সূচকের আকার। তাতে সংখ্যার পরিমাণ সহজেই বোঝা যায়। এই প্রথা অনুযায়ী (উদাহরণস্বরূপ)

$$৫৩৪ = ৫ \cdot ৩৪ \times ১০^{২}$$

$$১০০,০০০ = ১ \cdot ০০ \times ১০^{৫}$$

$$\cdot ০০১২৩ = ১ \cdot ২৩ \times ১০^{-৩}$$

এই নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশভঙ্গিটি এইরূপ ঃ

শত $=$ ১০^২^

সহস্র $=$ ১০^৩^

অযুত $=$ ১০^৪^

লক্ষ $=$ ১০^৫^

প্রযুত $=$ ১০^৬^ (million)

কোটি $=$ ১০^৭^

তেমনি, সহস্র ভাগের এক ভাগ $=$ ১০^-৩^

লক্ষ " " " $=$ ১০^-৫^

কোটি " " " $=$ ১০^-৭^

ভারতীয় গণিতবিদ্যায় **numeration** বা সংখ্যাবাচনের পদ্ধতি বহুপূর্ব থেকে প্রচলিত। সংখ্যার স্থান-মানের উল্লেখ বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের সূত্রাদি অনুধাবন করলে দেখা যায়, দশগুণোত্তর সংখ্যাবাচন পদ্ধতি ভারতবর্ষে খৃষ্টপূর্ব কাল থেকে গণনা কার্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভাস্করাচার্য (জন্ম—১১১৪ খৃষ্টাব্দ) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী নামক গ্রন্থে সূত্রাকারে লিখেছেন,

একদশশতসহস্রাযুত লক্ষপ্রযুতকোটয়ঃ ক্রমশঃ।
অর্বুদমব্জং খর্বঃ নিখর্বমহাপদ্মশঙ্কবস্তস্মাৎ।
জলধিশ্চান্ত্যং মধ্যং পরার্ধমিতি দশগুণোত্তরাঃ সংজ্ঞাঃ।
সংখ্যায়াঃ স্থানানাং ব্যবহারার্থং কৃতাঃ পূর্বৈঃ॥

শেষোক্ত 'কৃতাঃ পূর্বৈঃ' শব্দদ্বয় থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, ভাস্করাচার্য-যুগের অনেক আগে হতে দশগুণোত্তর গণনা পদ্ধতির প্রচলন ছিল।

আধুনিক সূচকপদ্ধতি (exponential form) এই দশগুণোত্তর পদ্ধতির নামান্তর বলা যায়। মেট্রিক পদ্ধতির 'ডেকা হেক্টো কিলো' ভারতীয় 'দশ শত সহস্র'-এর স্পষ্টতঃ নামান্তর মাত্র। পরিমাপ বিজ্ঞানে পরিমাণজ্ঞাপক রাশিকে সূচক পদ্ধতির সাহায্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে প্রকাশিতব্য রাশিটির মাত্রা (কতো বড় বা কতো ছোট) বোধগম্য করার জন্য। কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করছি।

(১) **পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব** $=$ ৯ কোটি ২৯ লক্ষ মাইল (প্রায়)

$=$ ৯·২৯ $\times$ ১০^৭^ মাইল

$=$ ১·৪৯৬ $\times$ ১০^১১^ মিটার

যেহেতু $১০^{৭}$=১ কোটি অতএব সূচক দেখেই বোঝা যায় ঐ দূরত্ব কোটির কোঠায়।

(সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর কক্ষপথ বৃত্তাকার নয়। কক্ষপথটি উপবৃত্তাকার। তাই সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কমবেশী হয়। সেই কারণে গড় দূরত্ব ধরতে হয়।)

(২) **শূন্যে আলোকের গতিবেগ**=

প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল

$=১.৮৬২৮১\times১০^{৫}$ মাইল$=২.৯৯৭৯\times১০^{৮}$ মিটার

যেহেতু সূচক $১০^{৫}$=১লক্ষ সেইহেতু আলোকের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষ মাইলের কোঠায়।

(অন্য কোনো পদার্থ মাধ্যমে এই গতিবেগ একটু কম হয়। শূন্য মাধ্যমে গতিবেগ সর্বোচ্চ।)

[পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্বকে আলোকের গতিবেগ দিয়ে ভাগ দিলে পাওয়া যায়, সূর্য থেকে পৃথিবীতে পৌঁছাতে আলোকের কতটা সময় লাগে।

$\therefore\ ৯.২৯\times১০^{৭}\div১.৮৬\times১০^{৫}=৪.৯৮\times১০^{২}$ সেকেণ্ড

$=৪৯৮$ সেকেণ্ড$=৮$ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড (প্রায়)]

(৩) **আলোক-বর্ষ**$=৯.৪৬০৫\times১০^{১২}$ কিলোমিটার

$=৫.৮৭৮৪৮\times১০^{১২}$ মাইল।

প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে আলোক ১ বৎসরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে তার নাম ১ আলোক-বর্ষ। এটি দূরবর্তী জ্যোতিষ্কসমূহের পৃথিবী থেকে দূরত্বজ্ঞাপক একটি সুবৃহৎ একক। এই মাপে পৃথিবীর নিকটতম উজ্জ্বল তারকা লুব্ধকের (Sirius-এর) দূরত্ব=৪.৩ আলোক-বর্ষ। এখন পর্যন্ত জানা দূরতম নীহারিকার দূরত্ব$=৩.৩\times১০^{৯}$ আলোক-বর্ষ অর্থাৎ প্রায় ৩৩০ কোটি আলোকবর্ষ।

(৪) **পরমাণু-ভর**

অসংখ্য অনু-পরমাণু দিয়ে গঠিত হয় বস্তুখণ্ড। কতো পরিমাণ পদার্থে কতো সংখ্যক অনু বা পরমাণু আছে তা কি সঠিকভাবে জানা যায়? সুপরিকল্পিত পরীক্ষার সাহায্যে বিজ্ঞানিগণ এই সংখ্যা নির্ণয়ে সমর্থ হয়েছেন। তদনুযায়ী ১৬ গ্রাম অক্সিজেনের মধ্যে আছে ৬.০২×১০^{২৩} সংখ্যক পরমাণু বা এটম। অতএব ১টি অক্সিজেন এটমের ভর (mass) $=\frac{১৬}{৬.০২\times১০^{২৩}}=১৬\times\frac{১}{৬.০২\times১০^{২৩}}$ গ্রাম। এই কল্পনাতীত ক্ষুদ্র ভর

$\frac{১}{৬\cdot০২ \times ১০^{২৩}}$-কে ধরা হয় একটি একক, যার পরিভাষিক নাম হচ্ছে a w u (atomic weight unit)।

$৬\cdot০২ \times ১০^{২৩}$ সংখ্যাটি Avogadro's Constant নামে খ্যাত। Amadeo Avogadro নামক জনৈক বিজ্ঞানী এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করেন ১৮১১ অব্দে। সম অবস্থায় অবস্থিত যে-কোনো গ্যাসের সম আয়তনে সমসংখ্যক অণু বা molecule বিদ্যমান থাকে, পরীক্ষামূলক এই আবিষ্কার রসায়ন-বিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি। তুলনামূলকভাবে কোন্ এটম কতো ভারী তার তালিকা পরিমাপ-বিজ্ঞানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ঐ তালিকা দৃষ্টে, অক্সিজেন—১৬, হাইড্রোজেন—১·০০৮, কার্বন—১২·০১১ ইত্যাদি। সহজ কথায় এর অর্থ, হাইড্রোজেন এটমের তুলনায় অক্সিজেন এটম প্রায় ১৬ গুণ ভারী, কার্বন এটম প্রায় ১২ গুণ।

(৫) ইলেকট্রন পরিমাপ

একটি এটম অতি ক্ষুদ্র। তার আয়তন এতো ছোট যে, সহসা তা ধারণায় আনা যায় না। আবার এটমের চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র হচ্ছে ইলেক্ট্রন। তবু পরিমাপ বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই অতি ক্ষুদ্র ইলেক্ট্রনের আয়তন, ভর এবং তাতে নিহিত বিদ্যুতের পরিমাণ নির্ধারণে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানিগণ।

১টি ইলেক্ট্রনের rest mass (স্থির ভর)

$m = ৯\cdot১০৯১ \times ১০^{-৩১}$ কেজি

ইলেক্ট্রনের ব্যাসার্ধ $r = ২\cdot৮১৭৭৭ \times ১০^{-১৩}$ সেন্টিমিটার

ইলেক্ট্রনের চার্জ $e = ১\cdot৬০২১০ \times ১০^{-১৯}$ কুলম্ব

একটা ইলেক্ট্রন যে আসলে কী, অর্থাৎ তার প্রকৃত সত্তা কেমন সে-বিষয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা আছে। পরমাণুর প্রকৃতি নির্ধারণে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি সম্বন্ধে নানাবিধ সত্তার গুণাগুণ বিচার্য। তাই এ-সবের পরিমাপ সম্পর্কিত কৃৎ-কৌশল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অন্যতম অবলম্বন।

মাঝারি মাপের যে-সকল বস্তুর সঙ্গে আমরা দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত হই সেগুলির পরিমাপ নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। গজ-ফিতে দিয়ে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-ভাবে সেগুলিকে মেপে নেওয়া যায়, যেমন একটা টেবিল কতো লম্বা বা কতো উঁচু। একটা জড়বস্তু ওজনে কতোটুকু, একটা দোলক একবার দোলন সম্পূর্ণ করতে কতো সময় নেয় ইত্যাদি সহজেই নির্ণীত হয়। কিন্তু অতি-বড় বা অতি-ছোট বস্তু বা ঘটনার বেলায় প্রত্যক্ষ মাপ প্রায় অসম্ভব। তাই এ-সব ক্ষেত্রে পরোক্ষ

মাপের আশ্রয় নিতে হয়। সমুদ্রের গভীরতা, পর্বত-শিখরের উচ্চতা, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব এ-সব মাপবার জন্য গজ-ফিতার ব্যবহার করতে যাওয়া একান্তই হাস্যকর। শরীরের তাপমাত্রা, বা ফুটন্ত তরল পদার্থের তাপমান জানবার জন্য একটা থার্মোমিটার দিয়ে দেখতে পারি, কিন্তু প্রচণ্ডভাবে জলন্ত কোনো ফারনেসের তাপমান নির্ণয়ে কি তার গায়ে ঐ থার্মোমিটার বসানো চলে? তেমনি, অতি-শীতল তরলায়িত অক্সিজেনের তাপমান নির্ণয়ে প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ থার্মোমিটারের ব্যবহার সম্পূর্ণ অচল।

সুতরাং এ-সবের জন্য উপায়ান্তর খুঁজতে হয়েছে। ইংরেজিতে একটা প্রবাদবাক্য আছে, necessity is the mother of invention, প্রয়োজনের তাগিদেই উদ্ভাবন। পরিমাপ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যন্ত্রাদি নির্মাণ ও তৎসংক্রান্ত কৃৎ-কৌশল সেইভাবে পুষ্টিলাভ করেছে। এই কৃৎ-কৌশলের মূলে আছে, বিশেষ অবস্থায় পদার্থের বিশেষ আচরণ ও গুণধর্ম। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোনো অতি-উত্তপ্ত বস্তুর তাপমাত্রা মাপতে চাইছি। বস্তুটির গাত্র স্পর্শ করে সোজাসুজি তাপমান নির্ণয় অসম্ভব। তাই পরোক্ষ ব্যবস্থা করতে হবে। এখন, উত্তপ্ত বস্তুর পদার্থ-ধর্ম হচ্ছে তাপ ও আলোক বিকিরণ করা। সেই বিকিরণের মাত্রা নির্ভর করে উত্তপ্ত উৎসের তাপমাত্রার উপর। সুতরাং ঐ তাপ বা আলোককে যদি বিশেষভাবে নির্মিত কোনো রেডিও মাইক্রোমিটার বা optical pyrometer-এর উপর আপতিত করা হয় তাহলে তাতে যে পরিবর্তন লক্ষিত হবে তা থেকে হিসাব করে জানতে পারা যায় উত্তপ্ত উৎসের তাপমান কতো। এর নাম পরোক্ষ পরিমাপ।

একটু ভাবলেই বোঝা যায়, ব্যবহারিক জীবনে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরোক্ষ মাপের উপর নির্ভর করে থাকি। দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঘোষিত হয় রেডিও-টিভিতে। সংখ্যা দুটি যা শুনি তা আসলে কি? একটা পারদ-থার্মোমিটারে পারদ-স্তম্ভ কতদূর উঠেছে বা নেমেছে দিনমান মধ্যে, তারই তো ঘোষণা। তাপের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে থার্মোমিটারের অভ্যন্তরে অবস্থিত তরল পারদের আয়তনে যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তারই পরিমাপ হচ্ছে এই থার্মোমিটার রিডিং (reading)। তাপ প্রয়োগের ফলে বস্তুর আয়তনে যে-বৃদ্ধি ঘটে, অর্থাৎ পরিবর্তন সূচিত হয়, তাকেই কাজে লাগানো হয় উপযুক্ত তাপমান যন্ত্র নির্মাণে।

এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পদার্থের বিভিন্ন গুণধর্মকে কাজে লাগিয়ে নানাবিধ পরোক্ষ পরিমাপের আশ্রয় নিতে হয়। মূল এককত্রয় যথা ভর, দৈর্ঘ্য ও কাল তো আছেই। উপরন্তু অনেক রকম উদ্ভাবিত একক বা derived

unit-এর ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। খাদ্যের 'ক্যালোরি-ভ্যালু' কতো, ইলেক্‌ট্রিক লাইনে 'ভোল্টেজ' কমছে না বাড়ছে, কতো 'ওয়াট' কারেণ্ট খরচ হোল, কতো 'হর্স পাওয়ারের' এঞ্জিন না হলেই নয়, বন্যার মুখে ব্যারাজ থেকে কতো 'কিউসেক' জল ছাড়া হচ্ছে, কতো 'মেগাওয়াট' বিদ্যুৎ ঘাটতি ঘোষিত হয়েছে আজ সন্ধ্যায়, আকাশবাণীর 'সেণ্টার' ধরার জন্য রেডিওর কাঁটা কতো 'মিটারে' রাখতে হবে ইত্যাদি expression বা প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরিমাপ বিজ্ঞান ও তৎসম্পর্কিত এককসমূহ। কালক্রমে মৌলিক এককের পরিবর্তে উদ্ভাবিত এককসমূহ এবং এককস্থচক শব্দসমূহ অবলীলাক্রমে এসে পড়েছে প্রাত্যহিক কথাবার্তায়। এ-সকলের মূলে আছে পরিমাপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত প্রগতি।

৬

সময় বিজ্ঞান

—কাল পরিমাপ ও আকাশ ঘড়ি—

সময় ও কাল নামক শব্দদ্বয় অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও এ দুটির মধ্যে ধারণাগত কিছু পার্থক্য আছে। দুইটি ঘটনার ব্যবধান বা interval-কে আমরা সময় আখ্যা দিয়ে থাকি। আর, কাল বলতে বুঝি এমন একটি নিরবচ্ছিন্ন সত্তা যা অসংখ্য ঘটনাবলীকে স্পর্শ ক'রে অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়মুখেই অনন্ত প্রসারিত।

উপরি-উক্ত বাক্য দিয়ে কি সময় বা কালের সংজ্ঞা নিরূপিত হোল? না, হয়নি। কেননা, যেটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে চাইছি সেটি তো ঐ বাক্যে **implied** বা উহ্য থেকে যাচ্ছে। দুটি ঘটনার মধ্যে কিসের ব্যবধান? কী অতিবাহিত হচ্ছে? ঘটনা-প্রবাহ বা sequence of events আর কালপ্রবাহ কি একই বিষয়? কাল কি ঘটনা-নির্ভর না ঘটনা-নিরপেক্ষ? যেখানে কোনো ঘটনা ঘটছে না বা জ্ঞাত হচ্ছে না সেখানে কাল কি স্তব্ধ হয়ে আছে?

এ-সব প্রশ্ন উঠতেই পারে। চিন্তাশীল মানুষের মনে এরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হওয়াটা প্রায় স্বাভাবিক। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, এতো তাত্ত্বিক কচকচি বা তর্কবিতর্কের প্রয়োজন কি? এ-সব পরিহারপূর্বক সময় বা কালের ব্যবহারিক দিকটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই তো হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে-জিজ্ঞাসা পূরণের জন্য সায়েন্সের সৃষ্টি তাকে ধামা-চাপা দিয়ে আর যাই হোক প্রকৃত সত্যানুসন্ধান হতে পারে না। তাই সময়-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে কিছুটা দার্শনিক বিচার এসে পড়তে বাধ্য।

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বহু দার্শনিক এ নিয়ে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। দেশ ও কাল বা time and space সম্পর্কিত সেইসব মৌলিক ধারণাসমূহ একদিকে যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা নৈকট্য রচনা করেছে, অন্যদিকে তেমনি সেগুলি মানুষের মনে এনে দিয়েছে সূক্ষ্ম চিন্তার আনন্দ আস্বাদ। ভারতীয় বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে শুধু যে কালের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে তা নয়, পরন্তু সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ কালের ধারণাকে নানাভাবে মহিমামণ্ডিত করেছেন। মহানির্বাণতন্ত্রে উক্ত আছে, কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ। অর্থাৎ, সর্বভূতকে (প্রাণী, পদার্থ ইত্যাদিকে) কলন কিনা গ্রাস করেন যিনি, তাঁর নাম কাল,

মহাকাল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১১।৩২) কথিত আছে, কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধ। আমি (শ্রীভগবান) লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাওয়া যায়, কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদিচ্ছা ইত্যাদি। এখানে কালকে বলা হয়েছে, সর্বভূতের পরিণাম সম্পাদনকারী। পরিণাম অর্থে বোঝায় generation, stay and decay নামক উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ। 'কালে হয়, কালে যায়' এরূপ প্রবাদবাক্য সম্ভবতঃ এই ধারণা থেকে উদ্ভূত। উপনিষদে অবশ্য কালকে জগতের মূলকারণরূপে ধরা হয়নি। কালেরও কর্তা আছে একথা স্বীকৃত হয়েছে। 'কালকার' শব্দে তাঁকেই বোঝায়, যিনি কাল-কে আপন কর্মে প্রবৃত্ত করান।* কারণেরও কারণ অন্বেষণে যাঁরা ব্যাপৃত তাঁদের কাছে এ-সকল ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মহামতি এরিস্টটল দার্শনিক বিচারে সময় বা time-কে ধরেছেন 'as moving something' এবং সেটি indivisible বা অবিভাজ্য। সময়ের গতিশীলতাকে তিনি কল্পনা করেছেন 'as motion that admits of numeration' অর্থাৎ সংখ্যাগণনার সাহায্যে যাকে প্রকাশ করা যায়। সম্ভবতঃ এরিস্টটলের এই কল্পনা-সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছেন পাশ্চাত্য দেশের মধ্যযুগীয় দার্শনিকবৃন্দ। তাঁরা সময়কে ধরেছেন এক continuum রূপে যার মধ্যে ঘটনাসমূহ ঘটে চলে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের এক পরম্পরায় আবদ্ধ হয়ে।**

কথাগুলি সংজ্ঞাজ্ঞাপক না হলেও চমৎকারভাবে বোধগম্য। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যেন একসূতোয় বাঁধা, একই কারণের অধীন চলমান। ভবিষ্যৎ থেকে আগত, বর্তমানে স্থিত এবং অতীতের দিকে প্রধাবিত।

প্রখ্যাত দার্শনিক বার্গসঁ (Bergson, 1859-1941) বহমান কাল সম্পর্কে

---

* স্বভাবমেতে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্।
যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বং জ্ঞঃ কালকারোগুণী সর্ববিদ্ যঃ
তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ পৃথ্যাপ্ তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ।

** 'Time is infinite, because we cannot limit it. It is the continuum in which all events happen and have mutual relations. It is duration with interval and succession ; it appears as if from future, it manifests in the present and disappears in the past.

—World Philosophy, Swami Satyananda

কিছুটা অভিনব ধারণা উপস্থিত করেন। তাঁর মতে mathematical time is a relation of external things. It is a creation of our intellect and forms no part of reality.' অর্থাৎ আঙ্কিক কাল হচ্ছে বাহ্যিক বস্তুসমূহের মধ্যে একটা সম্বন্ধ মাত্র। সময়ের অস্তিত্ব আমাদের বুদ্ধিপ্রসূত এবং সেটি বাস্তব বা reality-র কোনো অংশ নয়। তিনি আরো বলেছেন, ঘটনা-পরম্পরা আমরা যা প্রত্যক্ষ করি, তা হচ্ছে ভাসা-ভাসা অবলোকন মাত্র। গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায়, আমাদের অভিজ্ঞতার সবকিছুই হচ্ছে একটা 'continuous flow' বা ছেদ-হীন উৎসারণ। একে তিনি অভিহিত করেছেন 'duree' নামে।

গণিতবিদ্ ও দার্শনিক সার জেমস্ জীনস্ (Jeans, 1877—) কাল সম্পর্কিত ধরণাসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তাঁর মতে, সময় বা কাল চতুর্বিধ, (1) Conceptual time (2) Perceptual time (3) Physical time (4) Absolute time. প্রথমটির অস্তিত্ব ধারণাগত, দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব অনুভবপ্রসূত। তৃতীয়টি গণনা ও পরিমাপযোগ্য। আর চতুর্থটি হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে ঘটনা ও অনুভব নিরপেক্ষ। এটি যেন absolute space-এর counter part বা বিপরীতাংশ। উল্লেখ নিস্প্রয়োজন, নিরবধি কালকে এভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় কিনা এবং এতদ্বারা কালের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপিত হয় কিনা সে-বিচার মূলতঃ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, Jeans-কল্পিত physical time বা আঙ্কিক সময়ের ধারণাটি গণিত ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযোগী। বস্তুতপক্ষে গ্যালিলিও-নিউটন প্রবর্তিত সূত্রাবলীতে এরূপ সময়েরই ব্যবহার হয়ে থাকে।

মহামতি আইনস্টাইনের দেশ ও কাল সম্পর্কিত ধারণা পূর্বোক্ত ধারণাসমূহ থেকে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র এবং এককথায় অভিনব। তাঁর মতে, দেশ ও কাল দুই-ই হচ্ছে আমাদের intuition বা স্বজ্ঞা-সঞ্জাত ধারণামাত্র। বিচার-বিশ্লেষণ দিয়ে নয়, একটা সহজাত বুদ্ধি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, (১) বস্তুসমূহ (objects) যাতে বিধৃত থাকে তার নাম 'দেশ' বা space, (২) ঘটনাসমূহ (events) যে ক্রম অনুযায়ী পর-পর ঘটে যায় তাই 'কাল' নামে অভিহিত। (৩) এহেন দেশ ও কাল দুই-ই একান্তভাবে কল্পনার বিষয় ; তাদের বস্তুগত অস্তিত্ব নেই।

কোনো বস্তু বা object-এর অবস্থান নির্ণয়ে আমরা অবলীলাক্রমে বলে থাকি, বস্তুটি ঐতো ওখানে অবস্থিত। কোনো ঘটনা বা event-কে ঘটতে দেখলে আমরা অনায়াসে বলে ফেলি, ঐতো ঐসময় ঘটনাটি ঘটেছে। কিন্তু অবস্থান বা কাল

নিরূপণের ব্যাপারে এতো যে ভাবনা লুকিয়ে থাকে সে-বিষয়ে সচরাচর আমরা আদৌ অবহিত থাকি না। শুধু দেশকাল কেন, অন্যান্য অনেক মৌলিক বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অনেকাংশে ঐ intuition বা স্বজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। বিচারবুদ্ধি পরের কথা, আগে স্বতঃপ্রণোদিত জ্ঞান, তারপর তাই নিয়ে সত্যাসত্য বিচার ও ভ্রান্তি নিরসন। কি দর্শনে, কি বিজ্ঞানে তাই স্বজ্ঞা বা intuition বহু আবিষ্কারের জনকরূপে স্বীকৃত।

কাল বা সময়ের স্বরূপ সম্বন্ধে যে-ধারণাই প্রচলিত থাকুক না কেন, ব্যবহারিক সুবিধার জন্য সময় পরিমাপের নানাবিধ উপায় পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে। সেইসব কলাকৌশল বা সময় নিরূপণের পদ্ধতি মানুষের কাজ-চলার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হোত। আজও তাই হয়ে থাকে। ঘরে ঘরে ঘড়ির অভাব না থাকলেও গ্রামের মানুষ আজও বেলা 'ঠাহর' করার জন্য আকাশে সূর্যের পানে তাকিয়ে দেখে বেলা কতোটা গড়িয়ে গেছে, অথবা ঘরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে-থাকা খুঁটির ছায়া কতোটা কোন্‌দিকে ঢলে পড়েছে। চোখের আন্দাজে পরখ করা এই বিদ্যায় প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান সহায়ে এতোই নির্ভুলতা অর্জিত হয়েছিল যে, ঐ বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অতি সহজে নিমেষে সঠিক সময় নিরূপণে সমর্থ হতেন। সেকালের ঘটিকা যন্ত্র, শঙ্কু যন্ত্র ও পুরাতন মানমন্দিরসমূহে সংরক্ষিত যন্ত্রাদি তৎকালীন সময় বিজ্ঞান চর্চার এক অভ্রান্ত নিদর্শন।

সময় বিজ্ঞানের মূলসূত্রটি আদৌ জটিল নয়। সেটি সংক্ষেপে এইরূপ। দুটি ঘটনা (event) অথবা একটি ঘটনা ও তার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা হয়। এদের মধ্যবর্তী কালের নাম নির্ণেয় সময়। তাকে মাপতে হলে একটা একক (unit) স্থির করে নিতে হয়। সময়ের পরিমাণসূচক ঐ একককে অপরিবর্তনীয় হতে হবে। সুতরাং একক নির্ধারণের জন্য এমন একটি ঘটনা বেছে নিতে হবে যার পুনরাবৃত্তি ঘটে সমান তালে অর্থাৎ কালের সম ব্যবধানে। এমন ঘটনা কি চোখে পড়ে যা এতই নিয়মনিষ্ঠ অর্থাৎ যার পুনরাবৃত্তিতে এতটুকু হেরফের হয় না? জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন, ঐ দেখ নভোমণ্ডলে সূর্য, চন্দ্র, তারকা, এরা সমান তালে চলছে। যুগ-যুগান্ত ধরে তারা আবর্তিত হচ্ছে। তাদের গতিপ্রকৃতি কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ। তারা চলছে অর্থে পৃথিবীর মানুষ নিজেকে স্থির কল্পনা করে তাদের চলতে দেখছে (বিজ্ঞানের ভাষায় আপেক্ষিকভাবে)। সুতরাং আবর্তনরত এরূপ কোনো জ্যোতিষ্ককে (যথা সূর্য, চন্দ্র, তারকা) বেছে নিয়ে তা থেকে সময়ের একক স্থিরীকৃত হতে পারে।

হয়েছেও তাই। সাধারণ মানুষ খালি চোখে দেখে, সূর্য পূর্বগগনে উদিত হয় এবং অস্তমিত হয় পশ্চিম গগনে। দিন যায়, রাত্রি আসে। এই দিনরাত বা অহোরাত্র এমন একটি ঘটনা যার বিরাম নেই। সুতরাং সূর্যের উদয়াস্ত নামক পৌনঃপুনিকতা অবলম্বনে সময়ের একটি একক কল্পনা করাটা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এটিকে সময় বিজ্ঞানের সূচনা বলা চলে।

দিবাভাগ ও রাত্রিকাল দুয়ে মিলে কল্পিত হয় একটি সৌরদিন। সাধারণভাবে এর নাম ১ দিন। দিনমানকে ৮ সমভাগে ভাগ করে যে সময়াংশ পাওয়া যায় তার নাম প্রহর। অতএব, ৮ প্রহর=১ দিনরাত। বেলা দুপুর মানে, সূর্যোদয় থেকে দুটি প্রহর অতীত হয়েছে (দুপুর কথাটি দ্বিপ্রহরের অপভ্রংশ)। তেমনি রাতদুপুর মানে মধ্যরাত্র অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর দুটি প্রহর অতীত হয়েছে। যেহেতু অষ্ট প্রহরে এক দিনরাত বা দিনমান সেই হেতু 'আটপহুরে' কথাটির প্রচলিত অর্থ হচ্ছে, রাতদিন যেটি ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন হতে পারে, এতো সংখ্যা থাকতে দিনমানকে ৮ দিয়ে ভাগ করা হয় কেন ? উত্তরে বলা যায়, কোনো কিছুতে সমভাগে ভাগ করতে হলে প্রথম ধাপ হচ্ছে তাকে অর্ধেক করা, দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে তার অর্ধেক, তৃতীয় ধাপ হচ্ছে তার অর্ধেক (১-এর অর্ধেক=$\frac{১}{২}$, অর্ধেকের অর্ধেক=$\frac{১}{৪}$, তার অর্ধেক=$\frac{১}{৮}$)। সমবিভাজনের প্রাথমিক পদক্ষেপ সেই কারণে সংখ্যা ৮ দিয়ে সূচিত। এটি একটা practical sense বা ব্যবহারগত ধারণা থেকে উদ্ভূত বলা চলে।

সে যাই হোক, দিনমানকে ৮ ভাগে বিভক্ত ক'রে সকাল, দুপুর, বৈকাল, সন্ধ্যা, মাঝরাত, শেষরাত ইত্যাদি চিহ্নিত করা যায় বটে, কিন্তু সময় গণনার ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতর বিভাজনের যে প্রয়োজন আছে তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া, যে-সূর্যের উদয়াস্ত অবলম্বনে দিনমান একটা এককরূপে কল্পিত সেই সূর্যের দৃশ্যমান পথচক্র নভোমণ্ডলে এক-এক দিন এক-এক রকম হয়ে থাকে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় পূর্বগগনে সূর্যের উদয়বিন্দু প্রত্যহ একটু করে সরে যায়, কখনো উত্তর অভিমুখে কখনো দক্ষিণ অভিমুখে। যদিও সূর্যের উদয়বিন্দুর এই স্থান-পরিবর্তন যথেষ্ট নিয়মানুবর্তী তথাপি বুঝতে হবে এর ফলে দিনমানের কিঞ্চিৎ হেরফের ঘটে প্রত্যহ। কে না জানে, দিনমান সবদিন সমান থাকে না ? দিনমানের এই হ্রাসবৃদ্ধি অত্যল্প হলেও তাকে তো মাপতে হবে। তাই ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে দণ্ড পল বিপল ইত্যাদি ক্ষুদ্রতর একক কল্পিত হয়েছে।

১ দিন=৮ প্রহর=৬০ দণ্ড

১ দণ্ড=৬০ পল, ১ পল=৬০ বিপল

(২৪ ঘণ্টায় ১ দিন ধরলে ১ দণ্ড=২৪ মিনিট)

পৃথিবীর সকল দেশের জন্য একটা প্রমাণ সাইজের (of standard duration) দিনমান স্থির করা অত্যাবশ্যক, কেননা বিভিন্ন দেশে সময়ের বিভিন্ন একক থাকলে অনেক গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে। তাই সময় বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আবশ্যিকভাবে এসে পড়ে নভোমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান সূর্য চন্দ্র তারকার অবস্থান ও গতিপ্রকৃতির কথা, সাধুভাষায় যার নাম জ্যোতির্বিজ্ঞান। নির্ভুল সময় নির্ণয়ের পক্ষে এই বিদ্যা এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে এককালে এটি বেদের অঙ্গস্বরূপ পরিগণিত হোত। বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সময় নিরূপণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে আকাশ-দেখার প্রয়োজন না থাকলেও, সময় বিজ্ঞানে এই বিদ্যার গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি। তাছাড়া, সৃষ্টিতত্ত্বের বহু রহস্য উদ্ঘাটনে জ্যোতিষ্কসমূহের গতিপ্রকৃতি নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের অবদান অসামান্য।

সময় বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞানের বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে কয়েকটি মূলকথা জ্ঞাতব্য।

(১) পৃথিবী আপন মেরুদণ্ড বা অক্ষদণ্ডকে ঘিরে প্রতিনিয়ত আবর্তনরত। প্রত্যহ একটি সম্পূর্ণ আবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। অর্থাৎ এক পাক ঘুরতে পৃথিবী একই সময় নিচ্ছে। এই অবিরাম ঘূর্ণনকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলা হয়।

এর ফলে কি হয়? প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট (আর্যভট্ট ১ম, ৪৭৬ খৃষ্টাব্দ) প্রদত্ত উপমা সহকারে বলা যায়, পূর্বদিকে গতিসম্পন্ন নৌকায় অবস্থিত কোনো মানুষ যেমন নদীর উভয় তটস্থ গাছপালাকে পশ্চিমদিকে ধাবিত হতে দেখে, তেমনি পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে অবিরত ঘোরার জন্য পৃথিবীস্থিত মানুষের মনে হয় নভোমণ্ডলে সকল জ্যোতিষ্ক (সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা ইত্যাদি) যেন পূর্বগগনে উদিত হয়ে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিম গগনে অস্ত যায়।

বিজ্ঞানের ভাষায় এই মনে-হওয়াকে বলে আপেক্ষিক গতিসম্পন্নতা। পৃথিবী-স্থিত মানুষ (observer) নিজেকে স্থির মনে করে এবং দেখে নভোমণ্ডলে অবস্থিত গ্রহ তারকাদি সব কিছু যেন ঘুরছে এক একটি বৃত্তপথ ধরে। উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু নামক বিন্দুদ্বয়কে যোগ করে যে লাইন বা রেখা পাওয়া যায় তার নাম মেরুদণ্ড বা axis বা অক্ষদণ্ড। সেই লাইনটি বাড়িয়ে দিলে নভোমণ্ডলকে যে-বিন্দুতে ছেদ করে তার নাম celestial pole বা খগোলমেরু। ঐ ছেদবিন্দুতে বা তার খুব কাছে

অবস্থিত যে-তারকাটি দেখা যায় তারই নাম ধ্রুবতারা বা pole star. উত্তর গোলার্ধের মানুষের পক্ষে এটাই হচ্ছে উত্তর-বিন্দু। যেহেতু ঐ বিন্দুটি মেরুদণ্ডের উপর অবস্থিত, সেই হেতু সেটি আবর্তনহীন বা স্থির হয়ে থাকে। ধ্রুবতারা নামকরণ সেজন্যই।

(২) পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ ক'রে প্রতিনিয়ত চলছে। আপন কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর এই আবর্তনের নাম বার্ষিক গতি। একবার আবর্তন সম্পূর্ণ করতে অর্থাৎ কক্ষপথে একটি বিন্দু থেকে সরে সরে পুনরায় সেই বিন্দুতে ফিরে আসতে যে-সময় লাগে তার নাম বৎসর বা বর্ষ। যেহেতু সূর্য অবলম্বনে এই কাল নিরূপণ, সেজন্য সময়ের এই এককে বলা হয় সৌরবর্ষ।

এর ফলে কি হয়? পৃথিবীর মানুষ আপেক্ষিকভাবে দেখে, সে নিজে স্থির আছে, আর সূর্য ঘুরছে। সূর্যের পরিক্রমা তো ঘটতে দেখা যায় নভোমণ্ডলে। তাই পর পর কয়েকদিন পূর্বগগনে ও পশ্চিমগগনে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায়, আকাশের দৃশ্য-পটে সূর্যের অবস্থান প্রত্যহ একটু করে পাল্টে যাচ্ছে। এই স্থান-পরিবর্তনের ফলস্বরূপ সূর্যকে প্রত্যহ একটু করে পূর্বমুখে এগিয়ে আসতে দেখা যায় এবং বৎসরান্তে সূর্য আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে। জ্যোতির্বিদগণ ধৈর্যসহকারে সূর্যের বর্ষব্যাপী নভোমণ্ডল পরিক্রমার পথটি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। পাশ্চাত্য astronomyতে এই বৃত্তাকার পথের নাম ecliptic, ভারতীয় জ্যোতি-বিজ্ঞানে তার নাম ক্রান্তিবৃত্ত। যে যে তারকাপুঞ্জের (রাশির) উপর দিয়ে এই পথ চিহ্নিত হয়ে থাকে তাদের সংখ্যা বারো। সেই দ্বাদশ রাশির নাম যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। এক একটি রাশি বা তারকা সমষ্টির কেন এরূপ নামকরণ হয়েছে তা নিয়ে অনেক কথা আছে, আছে অনেক উপাখ্যান। জ্যোতিষ্কবিদ্যাভিত্তিক সেইসব গল্প যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি বিস্ময়কর। প্রাচীন যুগের মনীষিবৃন্দ কি চমৎকার উপায়ে আকাশ বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বসমূহ পরিবেশন করতেন, রূপকথার আশ্রয়ে সেগুলিকে সহজবোধ্য করে তুলতেন, তা সত্যই অতুলনীয়।

সময় বিজ্ঞানের কথায় ফিরে আসি। সূর্যের বার্ষিক আবর্তনকাল (প্রকৃতপক্ষে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর আবর্তনকাল) সময়ের একটি একক সন্দেহ নেই। কিন্তু সৌরবর্ষ নামক ঐ এককটির বিভাজন প্রয়োজন। কেননা, একটি পুরো বছরের কাল-ব্যাপ্তি অনেকখানি। তাছাড়া গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ বসন্ত ইত্যাদি ঋতু-পরিবর্তনকে কালের মাপে চিহ্নিত করাটা প্রকৃতি-নির্ভর মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

তাই ভারতীয় মতে সৌরবর্ষ ১২টি ভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগের নাম সৌর-মাস। অর্থাৎ এক-একটি রাশিতে সূর্যের অবস্থানকাল হচ্ছে এক-একটি সৌরমাস।

সৌর	**বৈশাখ**	মাসে	সূর্যের	অবস্থান	**মেষ**	রাশিতে
„	**জ্যৈষ্ঠ**	„	„	„	**বৃষ**	„
„	**আষাঢ়**	„	„	„	**মিথুন**	„
„	**শ্রাবণ**	„	„	„	**কর্কট**	„
„	**ভাদ্র**	„	„	„	**সিংহ**	„
„	**আশ্বিন**	„	„	„	**কন্যা**	„
„	**কার্তিক**	„	„	„	**তুলা**	„
„	**অগ্রহায়ণ**	„	„	„	**বৃশ্চিক**	„
„	**পৌষ**	„	„	„	**ধনু**	„
„	**মাঘ**	„	„	„	**মকর**	„
„	**ফাল্গুন**	„	„	„	**কুম্ভ**	„
„	**চৈত্র**	„	„	„	**মীন**	„

জ্ঞাতব্য ঃ (১) বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি মাসের নামগুলি এসেছে বিশাখা, জ্যেষ্ঠা ইত্যাদি নক্ষত্রের নাম থেকে। বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার অন্ত হয় চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রে (অথবা তার কাছাকাছি) থাকা কালে। তেমনি কার্তিক মাসে পূর্ণিমার অন্ত হয় চন্দ্র কৃত্তিকা অথবা অব্যবহিত আগের বা পরের নক্ষত্রে থাকা কালে।

(২) ১২টি সৌরমাসে যেমন ১টি সৌরবর্ষ ধরা হয়, তেমনি ৩০টি সৌরদিনে ধরা হয় ১টি সৌরমাস। এই হিসাব অনুযায়ী, ৩৬০ সৌরদিনে ৩৬০° অতিক্রম ক'রে সূর্য যেন একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করে (কল্পিত হয় সূর্য যেন রাশিচক্রের উপর সমগতিতে আবর্তনশীল)।

গণনার পক্ষে এরূপ সময় বিভাজন যথেষ্ট সরল ও সুবিধাজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্রান্তিবৃত্তে সূর্যের গতি প্রতিদিন সমান থাকে না। সেই গতি কখনো কম কখনো বেশী, যদিও বৎসরান্তিক আবর্তনকাল সমানই থাকে। এর ফলে একটি সৌরবর্ষ পূর্ণ হতে একই সময় অতিক্রান্ত হলেও একটি দিনরাত (অহোরাত্র) সম্পূর্ণ হতে কখনো কম কখনো বেশী সময় লাগে। যদিও দিনমানের এই পার্থক্যটুকু মাত্র কয়েক মিনিট সময়ের, তবু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সময়ের একক নির্ধারণ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও স্থিরমান হওয়া আবশ্যক।

ক্রান্তিবৃত্তের উপর আবর্তনরত সূর্যের গতিবেগের মাত্রা কেন কমবেশী হয় তার

কারণ নির্ণয় করেছেন জ্যোতির্বিদ্‌গণ। প্রকৃতপক্ষে সূর্য স্থির থাকে, ঘোরে পৃথিবী তার বার্ষিক কক্ষপথে। আমরা আপেক্ষিকভাবে সূর্যকে ঘুরতে দেখি। এখন পৃথিবীর কক্ষপথ বৃত্তাকার নয়। সেটি আসলে elliptic বা উপবৃত্তাকার। ফলে পৃথিবী সকল সময় সূর্য থেকে সমদূরবর্তী থাকে না। সেই কারণে গ্রহসংক্রান্ত গতিবিধি (কেপ্‌লার সূত্র) অনুযায়ী পৃথিবীর আবর্তনগতি কমবেশী হয়। তাছাড়া, ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুববৃত্ত এক সমতলবর্তী নয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে কোণের পরিমাণ হচ্ছে ২৩°২৮´। মূলতঃ এই দুই কারণে সৌরদিনের মাত্রা (সময়ের পরিমাণ) কমবেশী হয়ে থাকে। কিন্তু এককের তো হেরফের থাকলে চলবে না। তাই সময়-বিজ্ঞানিগণ স্থির করেছেন যে, এমন একটি সূর্যের কল্পনা করা হোক যেটি বিষুববৃত্তের উপরে সমগতিতে সঞ্চরণশীল থেকে ঠিক সময়ে বাৎসরিক আবর্তন সম্পূর্ণ করবে। বর্ষব্যাপী সমগতিসম্পন্ন এই কাল্পনিক সূর্যের (mean sun)-এর আহ্নিক আবর্তন অনুযায়ী যে দিনমান (mean solar day) নির্ধারিত হয় তাকেই ধরা হয় দিনের একক রূপে। সেই দিনমানকে সমান ২৪ ভাগ করে সময়ের যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় একটি ঘণ্টা। সেই ঘণ্টার ৬০ ভাগের একভাগের নাম এক মিনিট। তার ৬০ ভাগের এক ভাগের নাম এক সেকেণ্ড। সুতরাং সুপরিচিত ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড এইভাবে সুনির্দিষ্ট।

প্রশ্ন হতে পারে, বাস্তব সূর্যকে ছেড়ে দিয়ে একটা কাল্পনিক সূর্যের আশ্রয় নেবার আবশ্যকতা কি ? উত্তরে বলা যায়, সময়ের এককটিকে পৃথিবীর সর্বত্র সমান রাখতে হবে। কে না জানে সূর্যের উদয়াস্তের সময় সর্বত্র সমান নয় ? দিনের সময় পরিমাণ ইত্যাদি নির্ভর করে দর্শকের অক্ষাংশের উপর। কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, গ্রীণউইচ ইত্যাদি স্থানান্তর ভেদে উদয়াস্ত সময়, দিনমান ইত্যাদি এক-এক রকম। কিন্তু ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সর্বত্র দিনমান সমান কেননা ঐ দুদিন বাস্তবসূর্য বিষুববৃত্তগামী। তাই ঐ দুদিনের অবস্থাকে প্রামাণ্য বা standard ধরাটা একান্তই বিজ্ঞানসম্মত।

বাস্তব সূর্য ও কাল্পনিক সূর্য কি সময়ের খুব বেশী তারতম্য ঘটায় ? না, তা নয়। গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়,

(১) বাস্তব সূর্য অনুযায়ী 'প্রত্যক্ষ সময়' ও কল্পিত সূর্য অনুযায়ী 'প্রমাণ সময়' এ দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্যই থাকে না বৎসরে চার দিন,

(২) ঐ দুয়ের পার্থক্য (প্রমাণ সময় — প্রত্যক্ষ সময়) বৎসরে দুটি দিনে সব

চেয়ে বেশী হয়। (১১ই ফেব্রুয়ারী হয় সর্বোচ্চ পার্থক্য=+১৪মি ২৮ সে ৩রা নভেম্বর হয় সর্বনিম্ন পার্থক্য=−১৬ মি ২১ সেকেণ্ড।

(৩) উপরি-উক্ত সময় পার্থক্য নিরূপিত হয়ে থাকে 'কাল সমীকরণ' বা equation of time দিয়ে।

এই প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য হচ্ছে আর একটি একক, যা অতীব সুস্থির। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলে নাক্ষত্র দিন (sidereal day)। নভোমণ্ডলে কোনো একটি তারকা (fixed star) ধ্রুবতারাকে মেরুবিন্দুরূপে রেখে চক্রাকারে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করতে যে-সময় নেয় তার পরিমাণ হল 'নাক্ষত্র দিন'। প্রমাণ ঘণ্টা মিনিটের হিসাবে সেই সময়ের পরিমাণ হচ্ছে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। প্রকৃতপক্ষে এটি আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনকাল, আপাতদৃষ্টে যার কোনো পরিবর্তন নেই অর্থাৎ এককের দৃষ্টিতে সেটি সম্পূর্ণ সুস্থির। এরূপ সময় পরিমাপে ধরা হয়।

১ নাক্ষত্র দিন=২৪ নাক্ষত্র ঘণ্টা
১ নাক্ষত্র ঘণ্টা=৬০ নাক্ষত্র মিনিট
১ নাক্ষত্র মিনিট=৬০ নাক্ষত্র সেকেণ্ড

যেহেতু এরূপ সময়-পরিমাপ পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে গ্রহণযোগ্য, সেই কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান-কাল নির্ণয়ে sidereal time বা নাক্ষত্র-কালের ব্যবহার করে থাকেন। কোনো একটি নির্দিষ্ট তারকা মধ্যরাত্রে ঠিক যে সময়ে meridian cross করে অর্থাৎ আকাশের মধ্যরেখা অতিক্রম করে ঠিক তখন zero hour ধরে তার পরবর্তী transit-এর (অনুরূপ অতিক্রমের) সময় হয় ২৪ নাক্ষত্র ঘণ্টা। Astronomical clock বা জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ঘড়িতে সেই-ভাবে সময় রক্ষিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই sidereal time বা নাক্ষত্রকাল সাধারণ জীবনযাত্রায় তেমন ব্যবহৃত না হলেও গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান বিচারে ও পঞ্জিকা গণনায় এরূপ সময়ের ব্যবহার বড়ই উপযুক্ত বিবেচিত হয়।

বর্ষ বা বর্ষমান কাকে বলে? সাধারণভাবে আমরা ধরে থাকি, ১২ মাসে একটি বৎসর, কিন্তু সকল মাসের দিনসংখ্যা সমান নয়। খৃষ্টাব্দ মতে জানুয়ারী, মার্চ, মে, জুলাই, আগস্ট, অক্টোবর ও ডিসেম্বর হয় ৩১ দিনে, ফেব্রুয়ারী মাসে ২৮ দিন (লিপ-ইয়ারে ১ দিন বাড়ে)। বাকি চারটি মাস যথা এপ্রিল, জুন, সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর ৩০ দিনে। বিভিন্ন মাসের দিনসংখ্যায় কেন এমন অসমতা তার কারণ

আছে। বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেণ্ডার রচনায় একদিকে পৌরাণিক ও প্রচলিত ধারণাসমূহ এবং অন্যদিকে জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞানের কিছু তথ্যাদি মিশিয়ে আছে। পাশ্চাত্যের 'জুলিয়ান' ও 'গ্রেগরিয়ান' ক্যালেণ্ডার তার সাক্ষ্য বহন করে। মোটামুটি ধরে নেওয়া হয় ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনে একটি বর্ষ। প্রাচ্যে প্রচলিত সৌরবর্ষ, সৌরমাস, সৌরদিনের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সূর্যের এক-একটি রাশিতে (মেষ-বৃষাদি) অবস্থান-কাল সমান নয়, তাই সব মাসের দিনসংখ্যা সমান নয়। 'চান্দ্রমাস'এর দিনসংখ্যাও (তিথি গণনা অনুযায়ী) সব মাসে সমান থাকে না।

বিভিন্ন মাসের দিনসংখ্যা অসমান হলেও তেমন কিছু যায় আসে না, কিন্তু সময়ের পরিমাপে বর্ষমান অর্থাৎ একটি বৎসরের কাল-পরিমাণ যদি সুনির্দিষ্ট না হয় তাহলে অনেক গোলমালের উৎপত্তি হতে পারে। তাই একটা কল্পিত সূর্য (mean sun) আহ্নিক গতি অবলম্বনে যেমন ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড সঠিকভাবে স্থিরীকৃত, তেমনি ক্রান্তিবৃত্তে সূর্যের বার্ষিক গতি অবলম্বনে একটি বর্ষের কাল-পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত। এখানে সূর্যের বার্ষিক গতি অর্থে নভোমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান রাশিচক্রের মধ্য দিয়ে সূর্যের বর্ষব্যাপী পথ পরিক্রমা। কে না জানে সূর্য স্থির, পৃথিবী তার চারিপাশে আবর্তনরত ? সুতরাং সূর্যগতি প্রকৃতপক্ষে তার আপেক্ষিক গতি।

ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুববৃত্তের ছেদবিন্দুদ্বয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ। এদুটিকে বলা হয় নিরয়ণ-বিন্দু বা ক্রান্তিপাতবিন্দু। তাদের ইংরেজি নাম equinox, কেননা ঐ দুই বিন্দুতে সূর্যের অবস্থান ঘটলে সেদিন সর্বত্র দিনমান ও রাত্রিকাল সমান সমান থাকে। বসন্ত কালের equinox-কে বলা হয় vernal equinox বা বাসন্ত-ক্রান্তিপাতবিন্দু। পর পর ঐ ক্রান্তিপাতবিন্দুতে সূর্যের আগমনের মধ্যে যে সঠিক কাল-ব্যবধান তারই নাম একটি বর্ষ। এই বর্ষকে বলা হয় tropical year এবং এরূপ বর্ষমানের পরিমাণ হচ্ছে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫$\frac{১}{২}$ সেকেণ্ড অর্থাৎ ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনের চেয়ে কিঞ্চিৎ কম। Civil year বা সাধারণভাবে ব্যবহৃত বর্ষমান হচ্ছে ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন। তদনুযায়ী জুলিয়ন ক্যালেণ্ডারে প্রতি চার বৎসর অন্তর একটি বাড়তি দিন যোগ করা হয় ফেব্রুয়ারী মাসে ($\frac{১}{৪}$×৪=১ দিন)। তথাপি সঠিক বর্ষমানের সঙ্গে ৩৬৫$\frac{১}{৪}$-এর পার্থক্য একটু থেকে যায়। সেই গরমিল ঘোচানোর জন্য গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডারে সংশোধনের ব্যবস্থা আছে (১৭০০, ১৮০০, ১৯০০ অব্দকে লিপইয়ার ধরা হয় না। প্রতি চারশত বর্ষে এইভাবে তিনটি দিন কমিয়ে দেওয়া হয়)।

এছাড়া, আরেকটি বর্ষ স্থিরীকৃত আছে। তার নাম sidereal year বা নাক্ষত্র বর্ষ। মহাকাশে নক্ষত্রদের পটভূমিতে আবর্তনরত সূর্যের কোনো স্থিরবিন্দুতে বৎসরান্তে ফিরে আসার যে-সময় তাকে বলে নাক্ষত্র বর্ষ। প্রকৃতপক্ষে সূর্যকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবী যে-সময় নেয় তার পরিমাণ হচ্ছে ঐ নাক্ষত্র বর্ষ। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই বর্ষমান নির্ণীত হয়েছে। এর নির্দিষ্ট মান হচ্ছে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট ৯·৫০ সেকেণ্ড। ভগ্নাংশে এই কাল মান=৩৬৫·২৫৬৩৬১২ দিন, সংক্ষেপে ৩৬৫·২৫৬ দিন। এর অপর নাম ১ সৌরবর্ষ।

পৃথিবী যেমন সূর্যকে অবিরাম আবর্তন করে চলে তেমনি আবর্তিত হয় বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি গ্রহ। তুলনামূলকভাবে ঐসব গ্রহের আবর্তন কাল বা তাদের বর্ষমান এই প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য।

গ্রহ		আবর্তনকাল
বুধ	—	৮৭·৯৬৯ দিন
শুক্র	—	২২৪·৭০১ „
পৃথিবী	—	৩৬৫·২৫৬ „
মঙ্গল	—	৬৮৬·৯৮০ „
বৃহস্পতি	—	১১·৮৬ বর্ষ
শনি	—	২৯·৪৬ বর্ষ (১ বর্ষ=৩৬৫·২৫৬ দিন)

দ্রষ্টব্য : বৃহস্পতির আবর্তনকাল পৃথিবীর আবর্তনকালের চেয়ে প্রায় ১২ গুণ। তাই সূর্যকে যেমন পৃথিবী থেকে দেখা যায় এক-এক মাসে এক-এক রাশিতে অবস্থিত থাকতে, তেমনি বৃহস্পতিকে দেখা যায় এক-এক রাশিতে প্রায় ১ বৎসর ধ'রে অবস্থিত থাকতে। অনুরূপভাবে শনিগ্রহের এক-এক রাশিতে অবস্থানকাল প্রায় আড়াই বৎসর।

মোটামুটি এইভাবে বর্ষ, মাস, দিন, ঘণ্টা, সেকেণ্ড আমাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনাদি মেটায় ও কৌতূহল নিবৃত্তি করে। স্পষ্টতঃ এ-সব হিসাব-নিকাশের মধ্যমণি হচ্ছে সূর্য। সঙ্গত কারণেই ভারতীয় আচার-আচরণে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সূর্যের প্রাধান্য। তাই তিনি সূর্যদেব রূপে সমাদৃত। পঞ্জিকাকারগণ সূর্য ও চন্দ্রের কৌণিক দূরত্ব ও চন্দ্রগতি অবলম্বনে তিথি-নক্ষত্রাদি গণনা করে থাকেন। ১২টি রাশি ২৭টি নক্ষত্রে কল্পিত হয়ে থাকে। তাদের নামগুলি বড়ই সুন্দর ও

অর্থপূর্ণ।* প্রত্যেকটি নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কতো মনোরম উপাখ্যান! সম্ভবতঃ ঐসব উপাখ্যানের মূলে আছে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সময় বিজ্ঞানের নীরস তথ্যগুলিকে আকর্ষণীয় উপায়ে প্রকাশিত করার কৌশল, এবং সেই সঙ্গে স্থান ও কালকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিরতরে চিহ্নিত করে রাখার এক অপূর্ব প্রচেষ্টা।

বর্ষারম্ভ, মাস, দিনসংখ্যা ও বার কিভাবে ঠিক করা হয়? আকাশবাণীর প্রভাত-কালীন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ঘোষক প্রত্যহ ঘোষণা করেন, আজ অমুক তারিখ, অমুক বার ইত্যাদি। তারিখ ঘোষণার সময় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অব্দের উল্লেখ করে থাকেন যথা শকাব্দ, খৃষ্টাব্দ ও বঙ্গাব্দ। কেন, কি কারণে বা কোন্ সুবিধার জন্য?

ভারতবর্ষের এক-এক প্রান্তে এক-এক রকম বর্ষারম্ভের ও অব্দের প্রচলন আছে। কিন্তু সমগ্র দেশের জন্য একরকম সময়ের (Indian Standard Time-এর) যেমন প্রচলন হয়েছে, তেমনি যারা দেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একরকম বর্ষারম্ভ ও মাস গণনা থাকলে নিশ্চয় ভাল হয়। পঞ্জিকার বিভিন্নতা যথাসম্ভব বর্জনীয়। জাতীয় সংহতির দিক্ থেকেও বর্ষ গণনার একটা অভিন্নতা থাকা বাঞ্ছনীয় বিবেচনায় বিগত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক Calendar Reform Committee-র (পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির) সুপারিশ অনুযায়ী **'ভারতীয় শকাব্দ'** প্রচলিত হয়েছে। বর্ষারম্ভ ধরা হয়েছে চৈত্র মাসের ১লা তারিখ থেকে (তদনুযায়ী ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চকে ধরা হয় ১৮৭৯ ভারতীয় শকাব্দের ১লা চৈত্র)। ভারতীয় শকাব্দ গণনার আরেকটি সুবিধা হচ্ছে যে, প্রত্যেক মাসের দিনসংখ্যা স্থিরীকৃত (ইংরেজি বর্ষ বা খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক মাসের দিনসংখ্যা যেমন সুস্থির)। তার ফলে বার গণনা (রবি, সোম, মঙ্গল ইত্যাদি) সহজেই করা যায়। বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত পাঁচ মাস প্রত্যেকটি ৩১ দিন। বাকি মাসগুলি ৩০ দিনের। অতিবর্ষে চৈত্র মাস হয় ৩১ দিনে।

এই ভারতীয় শকাব্দের মাসারম্ভ কোন্ দিনে হয় তার তালিকা জ্ঞাতব্য।

---

* ২৭টি নক্ষত্রের নাম যথাক্রমে, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী (অভিজিৎ নামে আরেকটি নক্ষত্রের অস্তিত্বও স্বীকৃত)। যেহেতু রাশিচক্রের ১২টি রাশিতে ২৭টি নক্ষত্র পর পর অবস্থিত সেই হেতু ২৭ ÷ ১২ = ২$\frac{১}{৪}$ সংখ্যক নক্ষত্র এক-একটি রাশিতে বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ, মেষ রাশিতে আছে পর পর অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকা এক চতুর্থাংশ। বৃষরাশিতে আছে পর পর কৃত্তিকার বাকি $\frac{৩}{৪}$ অংশ, রোহিণী এবং মৃগশিরার অর্ধেক অংশ ($\frac{৩}{৪}+১+\frac{১}{২}=\frac{৯}{৪}$)।

শকাব্দে		খৃষ্টাব্দে
১লা চৈত্র	...	২২শে মার্চ (অতিবর্ষে ২১শে মার্চ)
১লা বৈশাখ	...	২১শে এপ্রিল
„ জ্যৈষ্ঠ	...	২২শে মে
„ আষাঢ়	...	২২শে জুন
„ শ্রাবণ	...	২৩শে জুলাই
„ ভাদ্র	...	২৩শে আগস্ট
„ আশ্বিন	...	২৩শে সেপ্টেম্বর
„ কার্তিক	...	২৩শে অক্টোবর
„ অগ্রহায়ণ	...	২২শে নভেম্বর
„ পৌষ	...	২২শে ডিসেম্বর
„ মাঘ	...	২১শে জানুয়ারী
„ ফাল্গুন	...	২০শে ফেব্রুয়ারী

খৃষ্টাব্দে যেমন লিপ-ইয়ার, ভারতীয় শকাব্দে তেমনি অতিবর্ষ হয়। শকাব্দের শেষ দুই অঙ্ক থেকে ২ বাদ দিলে সেই সংখ্যাটি যদি ৪ দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে সেটি হবে অতিবর্ষ। উদাহরণ, ১৮৭৯ শকাব্দের শেষ দুই অঙ্ক নিয়ে সংখ্যা পাই ৭৯। তা থেকে ২ বাদ দিলে থাকে ৭৭। যেহেতু ৭৭ সংখ্যাটি ৪ দিয়ে সম্পূর্ণ বিভাজ্য নয়, সেই হেতু ১৮৭৯ অতিবর্ষ হবে না। অতিবর্ষে ১লা চৈত্র হয় ২১শে মার্চ। ১৯১০ শকাব্দ কি অতিবর্ষ? হাঁ। কেননা ১০—২=৮ সংখ্যাটি ৪ দিয়ে বিভাজ্য।

খৃষ্টাব্দের দিন তারিখ থেকে কিভাবে শকাব্দের দিন-তারিখে উপনীত হওয়া যায়? প্রণালীটি খুবই সহজ। খৃষ্টাব্দ —৭৮=শকাব্দ (১লা জানুয়ারী থেকে ২০/২১শে মার্চ পর্যন্ত দিনে খৃষ্টাব্দ —৭৯=শকাব্দ)। উদাহরণ, ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর শকাব্দ হিসাবে কোন্ তারিখ? উত্তর, ১৯১০ শকাব্দের ৩রা আশ্বিন (যেহেতু ১৯৮৮—৭৮=১৯১০ এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর হচ্ছে ১লা আশ্বিন)। দ্বিতীয় উদাহরণ, ১৯৮৯, ১৫ই মার্চ শকাব্দ হিসাবে কোন্ মাসের কতো তারিখ হবে? উত্তর, ১৯১০ শকাব্দের ২৪শে ফাল্গুন। হিসাব: ১৯৮৯—৭৯=১৯১০। ২০শে ফেব্রুয়ারী হচ্ছে ১লা ফাল্গুন। ফেব্রুয়ারীর বাকি ৮ দিন ও মার্চের ১৫ দিনের যোগফল=২৩ দিন। অতএব ১লা তারিখের সঙ্গে ২৩ যুক্ত হয়ে উত্তর হবে ২৪শে ফাল্গুন।

[শকাব্দ থেকে বঙ্গাব্দে উপনীত হবার নিয়মটিও বেশ সহজ। শকাব্দ সংখ্যা—৫১৫=বঙ্গাব্দ সংখ্যা। তবে এর একটু ব্যতিক্রম আছে। ২১/২২ মার্চ বা শকাব্দের ১লা চৈত্র থেকে বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত (সাধারণতঃ ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত), শকাব্দ—৫১৬=বঙ্গাব্দ। অনুরূপ ভাবে, খৃষ্টাব্দ—৫৯৩=বঙ্গাব্দ। ১লা জানুয়ারী থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত (চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত), খৃষ্টাব্দ—৫৯৪=বঙ্গাব্দ।]

সময় বিজ্ঞানের মূল সূত্রে ফিরে আসি। সূত্রটি খুবই সরল সন্দেহ নেই। সমীকরণের ভাষায়,

নির্ণেয় সময়ের পরিমাণ=পর পর দুটির ঘটনার ব্যবধান-কাল,

অথবা

একটি ঘটনা ও তার পরবর্তী পুনরাবৃত্তির ব্যবধান-কাল।

উক্ত সমীকরণ দৃষ্টে মনে হতে পারে, শুধু সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের আবর্তন কেন, পৌনঃপুনিক যে-কোনো ঘটনাদ্বয়ের কালান্তরকে তো সময়-পরিমাপের কাজে লাগানো যেতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ধারণা অতীতে কার্যকরী হয়েছে। বালুকা-ঘড়ি, জল-ঘটিকা (ঘটিকাযন্ত্র) ইত্যাদি নির্মাণে ঘটনার পৌনঃপুনিকতা ও তজ্জনিত কালান্তরকে চমৎকারভাবে কাজে লাগানো হয়েছে সময় নিরূপণে। একটা পাত্রস্থিত বালুকারাশি উপরের অংশ থেকে নীচের অংশে নিঃশেষে পতিত হতে যে-সময় নেয় তাই দিয়ে অতীত যুগের মানুষ সময় মাপতে পারত। একটা জলপূর্ণ পাত্র বা ঘটিকার ছিদ্রপথে জল প্রবাহিত হয়ে নিঃশেষ হতে কিছুটা সময় নেয়। জল যতোই নির্গত হয় ততই ঘটিকাস্থিত জলের surface বা উপরিতল একটু একটু করে নেমে আসে। নির্দিষ্ট সময়ে পাত্রটি জলশূন্য হয়ে যায়। তার আগে জলতল কতদূর নেমেছে তাই দেখে চোখের আন্দাজে অথবা দাগ দেখে তখনকার দিনের মানুষ বলে দিতে পারতেন কতটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। এ বিদ্যায় মানুষ সহজেই অভ্যস্ত হতে পারতেন। তাই ঘটিকা যন্ত্রের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ ঘণ্টাকে শুদ্ধ ভাষায় 'ঘটিকা' আখ্যা দেওয়ার উৎপত্তি এইভাবে হয়েছে।

বর্তমান কালে, দোলকপিণ্ড বা pendulum-এর সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত। একটা শক্তপোক্ত কড়িবর্গা (beam) থেকে লম্বা সুতো ঝুলিয়ে তার প্রান্তে এক টুকরো পাথর বা বল বেঁধে তাকে নড়িয়ে দিলে সেটি আপন মনে দুলতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই দোলন আদৌ এলোমেলো নয়, তার দোলনকাল অর্থাৎ একবার সম্পূর্ণভাবে দুলে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার সময় একই থাকে। সুতরাং ঘটনার পৌনঃপুনিকতা ও কালান্তর সুনির্দিষ্ট। দোলক-ঘড়ি

নির্মাণে এটি সহায়ক। আমরা সচরাচর যে pendulum clock ব্যবহার করি তাতে কিন্তু ঐ লম্বা সরল দোলকের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় এমন একটা compound pendulum যার আকৃতি এমনভাবে নির্দিষ্ট যে, সেটি প্রতি সেকেণ্ডে টক টক আওয়াজ দিয়ে দুলতে থাকে যার ফলে দোলকটির আবর্তনকাল হয় ঠিক ২ সেকেণ্ড। এক-আধটুকু হেরফের হলে তাও সংশোধন করে নেওয়া যায় দোলকের সঙ্গে সংযুক্ত একটি স্ক্রু (screw) দিয়ে।

এমন কতকগুলি বিশেষ ধরনের crystal আছে যেগুলির স্পন্দনকাল অতি নিয়মিত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ক্রিস্ট্যালটির সংকোচন-প্রসারণ ঘটে। উপযুক্ত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বিভবের প্রভাবে সেই ক্রিস্ট্যালকে স্পন্দনরত করা যায়। তার ফলে সেটি সময়-সূচকের কাজ করতে সমর্থ হয়। সময়ের অতি সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য quartz clock উদ্ভাবিত হয়েছে quartz নামক পদার্থের crystal-এর এই গুণবৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে।

সময় বিভাজনের একক নির্ণয়ে স্বাভাবিক স্পন্দনকালকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তার চমৎকার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে। সুস্থ মানুষ স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের যে একটা ছন্দ আছে, তা শান্ত অবস্থায় কোলাহলবর্জিত স্থানে বসে আপনা-আপনি উপলব্ধি করা যায়। এই প্রক্রিয়া মানুষের প্রাণস্বরূপ। লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায়, এটি তার প্রাণবায়ুর স্পন্দন। স্বাভাবিক শ্বাস নিতে ও প্রশ্বাস ছাড়তে যে-সময় অতিবাহিত হয় তা সুনিয়মিত। এই থেকে সময়ের একটি একক কল্পিত হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানে, যার নাম 'প্রাণ'।

সংশ্লিষ্ট তালিকাটি এইরূপ, (সূর্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)

১ নাক্ষত্র অহোরাত্র=৬০ নাড়ী

১ নাড়ী=৬০ বিনাড়ী

১ বিনাড়ী=৬ প্রাণ

১ নাক্ষত্র অহোরাত্রকে প্রায় ২৪ ঘণ্টা ধরলে,

২৪ × ৬০ × ৬০ সেকেণ্ড=৬০ × ৬০ × ৬ প্রাণ

∴ ১ প্রাণ=প্রায় ৪ সেকেণ্ড

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে normal respiration rate হচ্ছে 14 to 18 per minute. এর গড় ১৫ ধরলে দাঁড়ায় প্রতি ৪ সেকেণ্ডে ১ বার অর্থাৎ প্রায় ১ প্রাণের সমান।

আমরা চোখের পলক ফেলে থাকি। পলক ফেলাকে এক অর্থে বলা যায় চোখের পাতার বা সংশ্লিষ্ট পেশীর স্পন্দন। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৫ বার পলক পড়ে। অর্থাৎ ১ পলকের কালমান হচ্ছে $\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ড। সময়ের এই ক্ষুদ্র এককটি 'নিমেষ' নামে অভিহিত। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে নিমেষের চেয়েও আরো ক্ষুদ্র একক কল্পিত হয়েছে। কনিষ্ঠতম এককটির নাম 'ক্রটি' যার সময় পরিমাণ হচ্ছে ১ নিমেষের ১/৩০০০ অংশ।

সময়ের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশকে মাপা যায় কিভাবে? আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যার সহযোগে এজন্য উদ্ভাবিত হয়েছে atomic clock বা এটম-ঘড়ি। পরমাণু-স্পন্দন বা atomic vibration হচ্ছে এমন একটি পৌনঃপুনিকতা যা ঘটে থাকে অতীব নিয়মিতভাবে। সময়-নির্দেশক রূপে এই সূক্ষ্ম স্পন্দনকে কাজে লাগানো যায়, কেননা এটির স্পন্দনকাল সম্পূর্ণভাবে বহিরাগত প্রভাব থেকে মুক্ত। বৈজ্ঞানিকগণ দাবী করেন যে এরূপ পরমাণু-ঘড়ির সাহায্যে $১/১০^{৯}$ অর্থাৎ এক সেকেণ্ডের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত সময় নির্ভুলভাবে গণনা করা যায়।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে তাল রেখে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় সাফল্য আজ মানুষকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছে যেখানে কল্পনা প্রতিনিয়ত বাস্তবকেও হার মানাচ্ছে।

সময়ের কি কোনো পরমাণু আছে? অর্থাৎ পদার্থ বা matter-কে ভেঙে ভেঙে যেমন কতিপয় মৌলিক কণিকা বা elementary particles-এর সন্ধান মেলে, তেমনি সময় বিভাজনের প্রান্তদেশে উপস্থিত হয়ে কি পাওয়া যাবে কোনো সময়-কণিকার ইঙ্গিত? এ-বিষয়ে সঠিক উত্তর না পেলেও অনুমানের ভিত্তিতে বিজ্ঞানিগণ এক কল্পিত সত্তার কথা বলেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন 'ক্রোনন' (chronon)। একটি ইলেক্‌ট্রনের ব্যাস পরিমিত স্থানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পেঁছাতে আলোক যেটুকু সময় নেয় তার পরিমাণ হচ্ছে এই ক্রোনন। অঙ্কের হিসাবে এটি প্রায় $১০^{-২৪}$ সেকেণ্ড। যথার্থই কল্পনাতীত এই কালজ্ঞাপক একক! বাস্তব ও কল্পনার কি অত্যাশ্চর্য সমাহার সাধিত হয়েছে কালতত্ত্বে!

৭

পদার্থ পরিচয়

—গুণধর্মে বিভিন্নতা ও ঐক্য—

প্রবাদবাক্য আছে, নামে কিবা আসে যায়। বাক্যটির সত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য গোলাপ ফুলের উপমা দিয়ে বলা হয়, ফুলটিকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তার সুগন্ধ সমানই থাকবে। তা থাকতে পারে, তবু নামের মধ্য দিয়ে যদি ফুলটির গুণবৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তাহলে নামটি যেন আরো ভালো লাগে। পদ ও পদার্থের মধ্যে সম্পর্কটি তাতে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। যেমন ধরুন রজনীগন্ধা, রজনী-কালে যে গন্ধ বিতরণ করে, সন্ধ্যামল্লিকা সন্ধ্যায় গাছ আলো ক'রে পাঁপড়ি মেলে, সূর্যমুখী সূর্যের মুখপানে চেয়ে থাকে ইত্যাদি।

ব্যবহারিক জগতে চক্ষুহীন ব্যক্তির নাম পদ্মলোচন হতে বাধা নেই, বস্তু ও তার নামের মধ্যে সঙ্গতি নাও থাকতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নামকরণে এরূপ যথেচ্ছাচার নিষিদ্ধ। শুধু বিজ্ঞানে কেন, ন্যায়ভিত্তিক যে-কোনো শাস্ত্রে শব্দগঠন ও নামকরণের মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন বা নিয়মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইংরেজিতে যাকে ম্যাটার (**matter**) বলে, সংস্কৃতে বা বাংলায় তাকে বলা হয় পদার্থ। কারো কারো মতে ম্যাটার মানে বস্তু। ভারতীয় কোনো কোনো ভাষায় **physical science**-এর প্রতিশব্দ হচ্ছে 'ভৌতিক বিজ্ঞান' (এখানে ভৌতিক কথাটি 'ভুতুড়ে' অর্থে নিশ্চয় নয় !)। পঞ্চভূত দিয়ে গঠিত এই জগৎকে 'ভূতাত্মক' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। সেই জগতে স্থাবর জঙ্গম সবই বিদ্যমান। প্রাণিদেহ ঐ পঞ্চভূতে গঠিত ধরা হয়। প্রাণান্তে জীবদেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়, এরূপ ধারণা সুপ্রচলিত।

সে যাই হোক, জগতে যা-কিছু আমরা দেখছি, শুনছি বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে সেগুলি কোন্ উপাদানে গঠিত, এ প্রশ্ন জাগতেই পারে। বিশেষতঃ, পদার্থের রূপান্তর ঘটতে দেখে (যা প্রায়শঃ আমাদের চোখে পড়ে) কৌতূহল জাগে, পদার্থটি কোথায় বা কিসে বিলীন হয়ে যায় ? এক টুকরো কাঠ যখন পুড়ে ছাই হয়ে যায় অথবা একটা প্রাণিদেহকে বিকৃত (decomposed) হতে হতে নিঃশেষিতপ্রায় দেখায়, তখন পদার্থের গঠন ও পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তাশীল মনে একটা জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পদার্থ সম্পর্কে

এই প্রাথমিক জিজ্ঞাসার অপর নাম বিজ্ঞানচেতনা। তাই, পঞ্চভূত-দিয়ে-গড়া প্রাণিদেহের পঞ্চভূতে বিলীন হবার তত্ত্বটি শুধু ধর্মশাস্ত্রীয় ব্যাপার নয়, এর মধ্যে নিহিত আছে বিজ্ঞান-সম্পর্কিত অনেক কথা।

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটি উপাদানের নাম পঞ্চভূত। নামকরণটি যথেষ্ট বিজ্ঞান-সম্মত। কেননা, matter বা জড় পদার্থের এক-একটি গুণ বা অবস্থা যেমন ঐ শব্দপঞ্চকে পরিস্ফুট তেমনি ঐ পঞ্চভূতের সমাহারে জড়জগৎ প্রকাশিত। শ্রেণীবিভাগ বা classification-এর নিয়মনীতি হচ্ছে (১) শ্রেণীভুক্ত উপাদানসমূহের পারস্পরিক পার্থক্য তাতে সুস্পষ্ট হওয়া চাই, (২) উপদানগুলির সমষ্টিতে বিভাজ্য বস্তুটি সম্পূর্ণ হওয়া চাই। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, পঞ্চভূত বিভাগে বিভাজন-সম্পর্কিত এই নিয়মনীতি নির্ভুলভাবে পালিত। ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ ইত্যাদির প্রত্যেকটি দিয়ে এক-একটি physical state বা ভৌতিক অবস্থা সুপ্রকাশিত, তাদের মধ্যে পার্থক্যটুকু নামকরণের সাহায্যে চিহ্নিত। আবার পঞ্চভূতের সব কয়টি মিলিয়ে জড়জগতের পূর্ণতা জ্ঞাপন করে, কোনো কিছু বাদ পড়ে না।

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে প্রাচীন ভারতীয় পঞ্চভূততত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন সম্ভবপর। ক্ষিতি অর্থে আমরা ধরতে পারি শুধু মাটি নয় পরন্তু পৃথিবীর যাবতীয় স্থলভাগ বা কঠিন পদার্থ, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে 'solid state of aggregation'। অনুরূপভাবে অপ্ অর্থে শুধু জল নয়, পরন্তু যাবতীয় তরল পদার্থ যা বিজ্ঞানের ভাষায় liquid state নামে অভিহিত। অনুরূপভাবে তেজঃ অর্থে শুধু অগ্নি বা রশ্মি নয়, পরন্তু যাবতীয় energy বা শক্তি ধরা যেতে পারে। মরুৎ অর্থে শুধু বায়ু নয়, বায়বীয় সব কিছুকে বোঝাতে পারে, যার নাম gaseous state.

ব্যোম শব্দটির অর্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো উপনিষদে* ব্যোম শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে 'খ' নামক শব্দ। এর অর্থ আকাশ। কোন্ আকাশ? পৃথিবী থেকে যে-আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়? অথবা, অন্তরীক্ষ বলতে যে গগনমণ্ডল বুঝতে আমরা অভ্যস্ত শুধু কি সেইটুকু? কেউ কেউ মনে করেন ব্যোম বা আকাশ অর্থে physical space বা ভৌতিক আকাশ (যেহেতু এটি পঞ্চভূতের অন্যতম উপাদান)। আবার কারো কারো মতে ব্যোম অর্থে শুধু পৃথিবীর বহির্দেশীয় গগনমণ্ডল নয়, শূন্যস্থান বাচক সব কিছুই এই শব্দে প্রতিপন্ন। শেষোক্ত অর্থ ধরলে intermolecular space বা অণু-পরমাণু মধ্যে নিহিত শূন্যস্থানও ব্যোমের অন্তর্গত।

---

* শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—২/১২
মুণ্ডকোপনিষৎ—২/১/৩

সে যাই হোক, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অনুযায়ী আমরা ব্যোম অর্থে ধরতে পারি সমগ্র ভৌতিক আকাশ যা স্থান-কালের সীমায় আবদ্ধ। ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌গণ অবশ্য ভৌতিক ব্যতীত অন্যরূপ আকাশের কথাও কল্পনা করেছেন যথা চিদাকাশ, হৃদয়াকাশ ইত্যাদি।

Solid, liquid, gas, energy, space নামক পাঁচটি element বা উপাদানকে পঞ্চভূতের নামান্তর কল্পনাপূর্বক ভৌতিক জগতের একটা সুষ্ঠু বিভাগ রচনা করা যায়, যার উদ্দেশ্য হবে ভৌতিক ঘটনাবলীর অন্তরালে কোন্ উপাদান কিভাবে ও কতটুকু ক্রিয়াশীল থাকে তা নির্ণয় করা। পদার্থের গুণধর্ম বা স্বভাব অনুযায়ী পদার্থসমূহের গোত্রবিভাগ (classification) বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের অন্যতম পথ। উপযুক্ত পরিবেশে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়, একথা কে না জানে? কিন্তু বীজের বিভিন্নতা অনুযায়ী উদ্ভিদ্‌সমূহ কতো বিচিত্র পত্রে, পুষ্পে, শাখা-প্রশাখায় বিকশিত হয়ে ওঠে তার ইয়ত্তা নেই। বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদ্ জগতের এই বৈচিত্র্য অনুধাবনপূর্বক নানাবিধ পরীক্ষণ সহায়ে উদ্ভিদের জাতি-প্রজাতি ইত্যাদি নির্ণয়ে সমর্থ হন। শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ তদনুযায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং প্রত্যেকটি botanical name-এর মধ্যে নিহিত থাকে উদ্ভিদের স্বভাবগত পরিচয়। কোনো বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে বিভিন্ন গাছের বড় বড় নাম দেখে আমরা স্তম্ভিত হতে পারি, কিন্তু বুঝতে হবে তাদের প্রত্যেকটির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আছে এবং তাদের কোনো বিশেষণই নিরর্থক নয়।

জড়বস্তু সম্বন্ধে একই বিচার প্রযোজ্য। সব রকম কঠিন পদার্থ কাঠিন্য গুণসম্পন্ন হলেও তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক পার্থক্য বিরাজমান। তাই বিজ্ঞানিগণ চেষ্টা করেন একদিকে বিভিন্ন পদার্থসমূহের মধ্যে গুণগত ঐক্য নির্ধারণ করতে, অপরদিকে তাদের মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্য অনুসন্ধানপূর্বক সেগুলিকে পৃথক পৃথক উপজাতিতে চিহ্নিত করতে। এই দ্বিমুখী অভিযানের ফলস্বরূপ কতো যে বিস্ময়কর আবিষ্কার হয়েছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অবধি নেই।

জগতে দৃশ্যমান বস্তুসমূহের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে মানুষের মনে যে শ্রেণীবিভাগের ধারণা উৎপন্ন হয় তা হচ্ছে দৃষ্ট বস্তুটি জীবন্ত না প্রাণহীন। এইভাবে জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির গোত্র থেকে পৃথক্ গোত্রে চিহ্নিত হয় মাটি-পাথর, জল-বাতাস ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে 'প্রাণ' কি, কোন্ লক্ষণযুক্ত হলে কাউকে প্রাণী বলা চলে এ প্রশ্ন যথেষ্ট জটিল হলেও স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ আপন প্রজ্ঞা বা intuition সহায়ে বস্তুজগৎকে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে একটি ভাগের নামে দিয়েছে 'জড়'

অন্যটির নাম দিয়েছে 'জীব'। কেউ কেউ মনে করেন চেতন ও অচেতন এই নামদ্বয় উপযুক্ততর। কিন্তু সেক্ষেত্রে চেতনতার (consciousness-এর) পরিষ্কার সংজ্ঞা পূর্বনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন নতুবা সংজ্ঞা-সংকট থেকেই যাবে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ চেষ্টা করেছেন life বা প্রাণের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে জীবন-বিজ্ঞানে জীবন সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য আহৃত হয়েছে নিশ্চয়, সেইসব তথ্যের ভিত্তিতে নানাবিধ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে তাও ঠিক, তথাপি প্রাণের শাব্দিক সংজ্ঞা এ-পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নিরূপিত হয়েছে একথা বলা চলে না, molecular biology নামক অভিনব বিজ্ঞানশাখার অগ্রগতি সত্ত্বেও। কেউ কেউ বলেন, প্রাণ হচ্ছে একটা জীবন্ত 'organism'; পরিবেশের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতের একটা প্রকাশ মাত্র। আবার কোনো কোনো মতে এটি এক সুসংগঠিত প্রক্রিয়ার গতিশীলতা। জীবকোষসমূহের সৃষ্টি, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, বিবর্তন ইত্যাদির মূলে আছে প্রাণ। কিন্তু জীবদেহে রসগ্রহণ, খাদ্য পরিপাক, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, জৈব নিয়মে বংশবৃদ্ধি ইত্যাদিকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হলেও বুঝতে হবে এগুলি একটা functional narration বা প্রাণক্রিয়ার বর্ণনা মাত্র, যথার্থ সংজ্ঞার কোনো বিকল্প নয়।

শুধু প্রাণ কেন, অনেক মৌলিক সত্তা সম্বন্ধে শাব্দিক সংজ্ঞার এরূপ সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু তার জন্য নিরুৎসাহ হবার কিছু নেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সাহায্যে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায় ততটুকুই লাভ। তার বেশী জানতে চাইলে বিজ্ঞানের দরজা পার হয়ে প্রবেশ করতে হবে দর্শনের অন্দরমহলে। সে রাজ্য নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র।

জীবজগতের কথা বাদ দিয়ে জড় জগতের কথায় ফিরে আসি, যার উপাদান হচ্ছে জড়পদার্থ। সেই পদার্থ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের নাম জড়বিজ্ঞান। এককালে এটি পদার্থবিদ্যা নামে অভিহিত হোত। বর্তমানে পদার্থবিদ্যা physics-এর প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহৃত। অতীতকালে রসায়নবিদ্যা বা chemistry একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে কল্পিত হোত। বর্তমানে বিজ্ঞানের এদুটি শাখার মধ্যে ব্যবধান অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে মূলতঃ পরমাণু-সংগঠন, ইলেক্‌ট্রনবিন্যাস ইত্যাদির সাহায্যে রাসায়নিক গুণাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভবপর হওয়ায়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিভেদরেখা যতোই অবলুপ্ত হয় ততই ভালো। তার কারণ, একই পদার্থনিচয়ের গুণধর্ম নিয়ে যখন সমগ্র জড়জগৎ গঠিত ও প্রকাশিত তখন সে-সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের পথে বিভাগীয় সংকীর্ণতা তো

বিজ্ঞান-বিরোধী। আনন্দের কথা আধুনিক বিজ্ঞানে এই সংকীর্ণতা কমেছে, এবং বেড়েছে আন্তর্বিভাগীয় ঝোঁক বা inter-disciplinary trend. ফলে বিভিন্ন বিভাগে লব্ধ তথ্য, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আদান-প্রদানে প্রত্যেক বিভাগই সম্পুষ্ট হচ্ছে এবং পদার্থনিচয়ের মৌলিকত্ব স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

অবস্থাভেদে জড়পদার্থ কঠিন, তরল, বায়ব আকার ধারণ করতে পারে, এটি অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য। একই বস্তু কখনো কঠিন, কখনো তরল, হয়ে থাকে, এ দৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। একই জল হিম-শীতল হয়ে বরফে পরিণত হয়, আবার শুকিয়ে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়, একথা কে না জানে? কিন্তু কেবলমাত্র জিজ্ঞাসু মনে এ প্রশ্ন উদিত হয়, পদার্থের এই রূপান্তর প্রকৃতপক্ষে কী, ঘটেই বা কেমন ক'রে? লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একটা কঠিন বস্তুর নির্দিষ্ট আকার আছে, আয়তন আছে এবং সহজে তাকে ছিন্নভিন্ন করা যায় না। কাঠিন্য বলতে সাধারণতঃ এটাই বোঝায়। তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে বটে, কিন্তু আকৃতির কোনো নির্দিষ্টতা নেই, যখন যে পাত্রে রাখা যায়, সে পাত্রেরই আকার ধারণ করে তরল পদার্থটি। এই নমনীয়তা তরল পদার্থের লক্ষণ বিশেষ। বায়ব পদার্থের না আছে নির্দিষ্ট আকৃতি, না আছে নির্দিষ্ট আয়তন। যখন যেখানে থাকে তখন সেখানকার আকার ও আয়তন অধিকার করে বায়ব পদার্থ। ছিপি-আঁটা বোতলে আবদ্ধ একটুখানি গ্যাস ছিপি খোলা পেলেই বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে নিমেষমধ্যে।

ব্যাপারটা সামান্যই, কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য অনেক। কোনো বস্তুমধ্যে নিহিত পদার্থের অণু-সংগঠন কেমন তার উপর অনেকখানি নির্ভর করে তার বাহ্যিক গুণধর্ম। সুতরাং কাঠিন্য, তরলতা ও বায়ব-চাঞ্চল্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমাদের উপস্থিত হতে হয় পদার্থের অণু-প্রকৃতির নিভৃত রাজ্যে। পদার্থের মধ্যে অসংখ্য অণুসমূহ (molecules) কিভাবে দানা বেঁধে বসবাস করে, কোন্ প্রক্রিয়ায় তারা চঞ্চলতর হয়ে ওঠে, কোন্ অবস্থায় তাদের পারস্পারিক বন্ধন শিথিল হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সেইসব বিচার-বিবেচনার মূলে আছে পদার্থের অণুতত্ত্ব। ঐ তত্ত্বের সাহায্যে শুধু যে পদার্থের অবস্থাভেদ বা রূপান্তর ব্যাখ্যাপ্রদত্ত হয় তা নয়, পদার্থের সঙ্গে শক্তির সম্পর্কটিও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। অণুতত্ত্বের বিস্তারে কিছু গণিতের প্রয়োজন হয় নানা কারণে, সেইসব গণিতাংশ বাদ দিয়ে যথাসম্ভব সহজ কথায় অণুতত্ত্বের মূল ধারণাগুলি উপস্থিত করছি।

বস্তু ও পদার্থ

যে-কোনো বস্তু এক বা একাধিক উপাদান দিয়ে গঠিত। ঐ উপাদান এক-একটি পদার্থ নামে অভিহিত। একটা লোহার বলকে যদি বস্তু বলা হয় তাহলে লোহা হচ্ছে তার উপাদান। তেমনি এক টুকরো সন্দেশ যদি বস্তু হয় তাহলে তার উপাদান হচ্ছে ছানা, চিনি ও জল (যদি অবশ্য কোনো ভেজাল তাতে না থাকে)। তরল শরবত একটি বস্তুবিশেষ, তার উপাদানের নাম জল, চিনি ও লবণ জাতীয় পদার্থ। এইভাবে কোনো বস্তুতে সঠিক কি আছে তা বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই এক বা একাধিক পদার্থ।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ

মৌলিক পদার্থ তাকেই বলে যাকে আর অন্য কোনো উপাদানে ভাঙা যায় না। সোনা, রুপা, লোহা, তামা, পারদ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থের উদাহরণ। বৈজ্ঞানিকগণ এযাবৎ ১০৩টি মৌলিক পদার্থ সুচিহ্নিত করেছেন এবং তাদের নামগুলি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। এছাড়া আরও ৬টি মৌলিক পদার্থ transactinide elements নামে পরিচিত। এগুলির নামকরণও হয়েছে তবে এখনো তা বিজ্ঞানিমহলে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়নি।

একাধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয় যৌগিক পদার্থ। পরিচিত উদাহরণ হচ্ছে জল। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুটি মৌলিক পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হয় জল। যে লবণ আমরা খাই, তা একটি যৌগিক পদার্থ, সোডিয়াম ও ক্লোরিন নামক দুটি মৌলিক পদার্থের সংযোগে গঠিত হয় ঐ লবণ যার রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড। কতোটা হাইড্রোজেন কতো পরিমাণ অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে জল উৎপন্ন করে তার একটা নির্দিষ্ট অনুপাত আছে। তেমনি সোডিয়াম ও ক্লোরিন কি অনুপাতে সংযুক্ত হলে লবণ তৈরি হবে তা সুনির্দিষ্ট। এই ধরনের সংযোগের বৈজ্ঞানিক নাম chemical combination যার ফলে গঠিত হয় যৌগিক পদার্থ।

মিশ্রণ

কোনো বস্তুর মধ্যে একাধিক পদার্থের সমাবেশ হতে পারে মিশ্রণের আকারে। একমুঠো মাটির ঢেলা একটা বস্তু। তার মধ্যে আছে একাধিক যৌগিক

পদার্থের মিশ্রণ। বিজ্ঞানের ভাষায় এই মিশ্রণের নাম mechanical mixture. জল, বালি (silicate), খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থের বিকৃত অংশ এবং আরো কতো কি থাকতে পারে ঐ মাটির ঢেলায় যে-কোনো অনুপাতে।

অণু (molecule)

কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম অংশ পদার্থটির আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বিদ্যমান থাকতে পারে তার নাম অণু। ইংরেজিতে একে molecule বলা হয়। জলের একটি অণু জলের স্বভাবধর্ম নিয়েই বিদ্যমান। সেই অণুমধ্যে হাইড্রোজেনের দুটি এটম বা পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে বটে, কিন্তু জলের অণু জল-ই, হাইড্রোজেন নয়, অক্সিজেনও নয়। চিনির (গ্লুকোজের) একটি অণুতে ৬টি কার্বন পরমাণু, ১২টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও ৬টি অক্সিজেন পরমাণু বাঁধাধরা ছকে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তথাপি চিনির অণু চিনি-ই, তাতে কার্বন, হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের পৃথক্ সত্তার প্রকাশ নেই। আপন আপন গুণধর্ম বিসর্জন দিয়ে পরমাণুসমূহের এই মিলন বা সংযোগের ফলে যে যৌগিক পদার্থ গঠিত হয় তার অণুতে যেন হারিয়ে যায় ঐ পরমাণুসমূহ। এ এক বিচিত্র ব্যাপার! ততোধিক বিচিত্র হচ্ছে অণুমধ্যে পরমাণু-সমূহের বিন্যাস যার একটু হেরফের হলেই দেখা যায় পদার্থধর্মের রকমারি পরিবর্তন।

অণু-সন্নিবেশ (molecular aggregation)

অবস্থাভেদে একই পদার্থ কখনো কঠিন, কখনো তরল, কখনো বায়ব আকার ধারণ করতে পারে পর্যবেক্ষণ-লব্ধ এই জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে অণুতত্ত্ব। অনুমান করা হয় কঠিন অবস্থায় পদার্থমধ্যে অণুসমূহ এতই ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে যে তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের দরুন তাদের সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই বস্তুটির বিকৃতি ঘটানো কষ্টসাধ্য। আপন স্বভাবধর্ম অনুযায়ী অণুগুলি সদা-চঞ্চল থাকলেও এক্ষেত্রে পারস্পরিক টান প্রবলতর থাকায় কঠিন অবস্থায় কোনো পরিবর্তন সহসা ঘটে না। বহিরাগত কোনো টান বা চাপ যথেষ্ট প্রবল না হলে, বস্তুটির আয়তনের কোনো হেরফের হয় না। দৃশ্যমান কাঠিন্য এরই ফলশ্রুতি।

তরল পদার্থে অণুসমূহের সন্নিবেশ অপেক্ষাকৃত কম ঘন। তাই চঞ্চল প্রকৃতির অণুগুলি সহজেই স্থানান্তরিত হতে পারে। তার ফলে দেখা যায় তরল পদার্থের

তারল্য। অণুসমূহের মধ্যে পারস্পরিক টান কিছুটা অবশ্য থাকে যার ফলে তরল-বস্তুর আয়তনে পরিবর্তন ঘটাতে হলে একটা শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। তরল পদার্থের অণুগুলি একদিকে পারস্পরিক টানে আবদ্ধ, অন্যদিকে তাদের অণু-চঞ্চলতার গুণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার ঝোঁক। কঠিন পদার্থের তুলনায় তরল পদার্থে অণুসমূহের পারস্পরিক টান কথঞ্চিৎ দুর্বল এবং পারস্পরিক দূরত্বও কিঞ্চিৎ বেশী।

বায়ব পদার্থের অণুসমূহ শুধু যে অতিমাত্রায় অস্থির তা নয়, ফাঁক পেলেই তারা ছুটে পালাতে চায়। এই প্রবণতা এতো বেশী যে নিমেষের মধ্যে স্বল্প পরিমিত গ্যাস বৃহদায়তন ঘরে বা ফাঁকা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তাই বায়ব পদার্থের না আছে নির্দিষ্ট আকার, না নির্দিষ্ট আয়তন। সদাচঞ্চল অণুগুলি এক্ষেত্রে বিস্তার-লাভের জন্য উন্মুখ। আণবিক আকর্ষণ যে এদের মধ্যে একেবারে নেই তা নয়। অত্যধিক চাপের ফলে বায়ব পদার্থের আয়তন সঙ্কুচিত হয় এবং তখন ঘনসন্নিবিষ্ট অণুগুলি একে অন্যের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে ও নিকটতর অণুগুলির ওপর আকর্ষণের প্রভাব বিস্তারিত হয়।

একটা বস্তুখণ্ডের মধ্যে প্রতিনিয়ত এরূপ কতো যে কাণ্ড-কারখানা চলতে থাকে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। অণুসন্নিবেশের ফলে উদ্ভূত পদার্থধর্মের কিঞ্চিন্মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, বাকিটুকু অজ্ঞাত থেকে যায় অণুর অভ্যন্তরে। কোন্ অনুশাসনের বশবর্তী হয়ে এমন অণুসন্নিবেশ হয় এবং পদার্থধর্মের বিকাশ ঘটে, সে-রহস্য উদ্‌ঘাটনে আজও বিজ্ঞানিগণ সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেননি তথাপি তাঁদের অবিরাম চেষ্টা এক-এক সময় অপ্রত্যাশিতভাবে পুরস্কৃত হবার ঘটনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিরল নয়।

পদার্থের অণুতত্ত্ব প্রসঙ্গে এরূপ একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রবার্ট ব্রাউন (১৭৭৩-১৮৪৮) নামে এক উদ্ভিদবিজ্ঞানী ছিলেন। একটা সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে তিনি কাজ করতেন। তখন অতি সূক্ষ্ম মাইক্রোস্কোপের প্রচলন ছিল না। জলের মধ্যে নিমজ্জমান কতকগুলি পুষ্পকেশরের (pollen grain-এর) আকার-আয়তন পরীক্ষা করতে করতে তিনি লক্ষ্য করেন, ঐ দানাগুলি এলোমেলোভাবে অবিরাম এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে। জলমধ্যে অবস্থিত সেইসব ক্ষুদ্রায়তন বস্তুকণার এই চঞ্চলতা দেখে প্রথমটা তাঁর মনে হয়েছিল, (১) হয়তো জলের কোনোরকম নড়া-চড়া বা অস্থিরতার জন্য এমন হচ্ছে, (২) অথবা, বিশেষ জাতের ফুলরেণু হয়তো এরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করে, (৩) অথবা, এটা জৈব পদার্থের বিশেষ কোনো গুণ। কিন্তু বারংবার পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন, জল বা অন্য যে-কোনো

তরল পদার্থে নিমজ্জমান যে-কোন বস্তুকণা (জৈব অথবা অজৈব) এরূপ দিগ্বিদিক বা এলোমেলো গতিসম্পন্ন হয়। এই random movement যেমন নিশ্চিত তেমনি বিস্ময়কর। নিখুঁত পরীক্ষার সাহায্যে ব্রাউন সাহেব তরল পদার্থে নিমজ্জিত ক্ষুদ্রাকার বস্তুকণার এরূপ গতিপ্রকৃতি ও অত্যাশ্চর্য আচরণ আবিষ্কার করেন। তদবধি এটি বিজ্ঞানজগতে Brownian movement নামে খ্যাত হয়ে আছে।

কেন এমন হয় এই প্রশ্নের সদুত্তর তখন মেলেনি। Brownian movement আবিষ্কৃত হয় ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে। তার প্রায় ৮০ বৎসর পর বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে এ-বিষয়ের একটা সুসঙ্গত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন মহামতি আইন-স্টাইন। মনে হতে পারে, তরল পদার্থে নিমজ্জমান বস্তুকণার এদিক-ওদিক সঞ্চলন এমন কি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যার জন্য বিজ্ঞানিগণকে ৮০ বৎসর ধরে মাথা ঘামাতে হয়েছে। কিন্তু ভাবতে হবে, সদাচঞ্চল অণুগুলি অতি ক্ষুদ্র—এতো ক্ষুদ্র যে সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও তাদের চোখে দেখা যায় না। যা চোখে দেখা যায় সেগুলি হচ্ছে তরল পদার্থে ভাসমান বস্তুকণা। ঐ কণাসমূহ আয়তনে যথেষ্ট ক্ষুদ্র সন্দেহ নেই, তবু একটা অণু এতোই ক্ষুদ্র যে, কণাটি যেন পাহাড় আর অণুগুলি যেন পিঁপড়ে। পিপীলিকার দিগ্বিদিক লাথিতে পাহাড় টলতে পারে না। অতএব অণুসমূহের random movement আর Brownian particle-এর zigzag movement তো এক হতে পারে না (তৎকালীন গতি-বিজ্ঞান অনুযায়ী)। অথচ এটাও ঠিক যে, অণুসমূহ যদি সদাচঞ্চল হয় তাহলে তারা নিমজ্জমান বস্তুকণাকে অনবরত ধাক্কা দেবে। তার ফলাফল কি পরিলক্ষিত হবে, এটাই প্রশ্ন। অণুসমূহের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে Brownian movement-এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, এটাই বিবেচ্য। পুরাতন গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে এর কোনো সদুত্তর মেলেনি, তাই সমস্যাটি ধামাচাপা ছিল অনেকদিন।

সেই সম্পর্ক নির্ণয়ে যে নব গতিবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়েছে তার নাম Statistical mechanics. অণুসমূহের গতিপ্রকৃতি সমষ্টিগত ভাবে স্থিরীকৃত হতে পারে এই গণিতের সাহায্যে, ব্যষ্টিগত অর্থাৎ এক-একটি অণুর গতিবিধি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্ণয়ের চেষ্টা না করেও। Individual behaviour-এর পরিবর্তে statis-tical behaviour বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নূতন ভাবনা। এ যেন ব্যক্তি মানুষের মতিগতির অনিশ্চয়তার পরিবর্তে বহু মানুষের সম্মিলিত মতিগতি নির্ধারণের চেষ্টা। Kinetic theory of gases বা গ্যাস সংক্রান্ত গতিতত্ত্বে এরূপ চেষ্টা ফলবতী হয়েছে। দার্শনিক বিচারে ব্যষ্টিসত্তা ও সমষ্টিসত্তার মধ্যে মিল থাকতে পারে,

আবার গরমিলও হতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানে উভয়বিধ উপলব্ধিই মূল্যবান। তবে অণুসমাবেশের ক্ষেত্রে পদার্থের সংখ্যাতীত অণুসমূহের সমষ্টিগত আচরণই তাদের গুণধর্মের প্রতীক এবং সেই কারণে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

পদার্থের অবস্থান্তর (change of state)

তরল জল কঠিন বরফে পরিণত হয়, বাষ্প হয়ে বায়ব আকার ধারণ করে, এ-দৃশ্য আমাদের পরিচিত। শুধু জল নয়, যে-কোনো তরল পদার্থের এরূপ অবস্থান্তর ঘটতে পারে। বায়ব পদার্থ যেমন অক্সিজেন অতি নিম্ন তাপমাত্রায় তরল এমনকি কঠিন পদার্থে পরিণত হতে পারে। অক্সিজেন সরবরাহের জন্য liquid oxygen-এর ব্যবহার প্রচলিত আছে কেননা, এক ফোঁটা তরল অক্সিজেন অনেকখানি ঐ গ্যাস দিতে পারে।

কার সাহায্যে কিভাবে পদার্থের এই রূপান্তর ঘটে ? বিজ্ঞানিগণ বলেন, তাপ-শক্তির প্রয়োগে কঠিন পদার্থকে তরলে, তরল পদার্থকে গ্যাসে রূপান্তরিত করা যায়। তাঁরা আরো বলেন, তাপ প্রয়োগের ফলে পদার্থমধ্যে অবস্থিত অণুসমূহের চঞ্চলতা বেড়ে যায়। পারস্পরিক আকর্ষণের মায়া কাটিয়ে অণুগুলি আস্তে আস্তে তরলদেহ পরিত্যাগ পূর্বক বায়ুদেহে উপনীত হয়। তখন তাপ-বিতাড়িত অবস্থায় গ্যাসের অণুসমূহ কোনো পাত্রে বা আধারে আবদ্ধ থাকলে সেই আধারের গায়ে অবিরত ধাক্কা দিতে দিতে এবং উল্টো ধাক্কা খেতে খেতে একটা চাপ সৃষ্টি করে। এরই নাম gas pressure. সেই অবস্থায় তাপমাত্রা যদি বাড়ানো যায় তাহলে অণুসমূহের গতিবেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তার জন্য চাপও বেড়ে যায়, যদি না গ্যাসটির আয়তনে কোনো হেরফের হয়।

বস্তুতপক্ষে গ্যাসের বেলায় তার তাপমান, চাপ ও আয়তনের মধ্যে একটা সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানিগণ সহজ পরীক্ষার সাহায্যে সম্পর্কটি নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন। এ-বিষয়ে যাঁদের নাম অগ্রগণ্য তাঁরা হচ্ছেন রবার্ট বয়েল, চার্লস্, গে-লুসাক এবং এভোগাড্রো।* ইংরেজ বিজ্ঞানী বয়েল সাহেবের কৃতিত্ব, গ্যাসের আয়তন ও চাপের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়। তাই সংশ্লিষ্ট সূত্রটি Boyle's Law নামে পরিচিত। তাপমান অপরিবর্তিত থাকলে কোনো গ্যাসের চাপ যে

---

* Robert Boyle (1627-1691) ; J A C Charles (1746-1823) ; J L Gay Lussac (1778-1850) ; C A Avogadro (1776-1856)

অনুপাতে বাড়ে, ঠিক সেই অনুপাতে তার আয়তন কমে যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম inverse variation, অঙ্কের ফরমূলায় $p. v = constant$ মনে হতে পারে, এ আর এমনকি কথা? এরূপ একটা স্থত্রের এমনকি গুরুত্ব? কিন্তু ভাবতে হবে, পদার্থের গুণধর্ম বিচারে সহজ সরল সত্য অনেক সময় জটিল ও গভীর তত্ত্বের পথ-প্রদর্শন করে। এক্ষেত্রে হয়েছিল তাই। বয়েল-উদ্ভাবিত স্থত্র ধরে অণুগতি-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছিল সে-যুগে।

ফরাসী বিজ্ঞানী J Charles-এর কৃতিত্ব, গ্যাসের আয়তন ও তাপমানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়। এটিও এক যুগান্তকারী আবিষ্কার, কেননা পদার্থের অবস্থার উপর তাপমানের প্রভাব তাঁর স্থত্রে স্পষ্টীকৃত। তাঁর নাম অনুযায়ী স্থত্রটি Charle's Law নামে খ্যাত। চার্লস সাহেব ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে পর্যবেক্ষণ সহায়ে এ-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাকে সঠিক স্থত্রাকারে উপস্থাপিত করেন J L Gay Lussac ১৮০২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় ১৫ বৎসর পরে। সেই কারণে উল্লিখিত স্থত্রটি গে-লুসাকের নামের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে আছে। চাপ অপরিবর্তিত থাকলে কোনো গ্যাসের আয়তন নির্ভর করে তার তাপমানের উপর; তাপমান কমলে বা বাড়লে আয়তন সম অনুপাতে কমে বা বাড়ে। বিজ্ঞানের ভাষায় $V \propto T$ ($T = t^\circ C + 273$) অর্থাৎ সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস স্কেলের তাপমান যুক্ত ২৭৩ $= T$ (যাকে বলা হয় absolute temperature)।

এতো সংখ্যা থাকতে ২৭৩ যোগ করা হয় কেন? Absolute temperature কথাটির তাৎপর্য কি? এনিয়ে পরবর্তী কালে অনেক গবেষণা হয়েছে যার ফলে ঐ স্থত্রের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে এবং এক দিকে গ্যাস সংক্রান্ত অণুগতিতত্ব (kinetic theory of gases) অন্যদিকে তাপগতিতত্ত্বের (thermodynamics) সমন্বয় সাধিত হয়েছে। চার্লস সাহেবের কৃতিত্ব এমন একটি সহজ-সরল স্থত্রের আবিষ্কার যার তাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম।

বয়েল-স্থত্র ও চার্লস্-স্থত্রকে একত্র গ্রথিত করে উদ্ভাবিত হয়েছে গ্যাস-সম্বন্ধীয় একটি সাধারণ স্থত্র যেটি gas law নামে পরিচিত। অঙ্কের ভাষায় $p\ v = n\ R\ T$ [p=pressure, v=volume, $T = 273 + t^\circ C$, R=constant* n= number of gram-molecules] এর সরলার্থ হচ্ছে, সাধারণভাবে যে-কোনো গ্যাসের চাপ, তাপমাত্রা ও আয়তন একটা স্থত্র অনুযায়ী সম্বন্ধযুক্ত, তাদের

* R=gas constant
=1·9858 calories per degree centigrade per mole.

পরিবর্তন হয় ঐ ফরমূলা-মাফিক। ফরমূলাটিতে p, v, T যথাক্রমে ইংরেজি শব্দ pressure, volume ও temperature-এর আদ্য অক্ষর। n ও R নামক অক্ষরদ্বয়ের সংকেত বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এবং সেই প্রসঙ্গে এসে পড়ে Avogadro নামক এক বিজ্ঞানীর কথা। Count Amadeo Avogadro (১৭৯৬-১৮৫৬) নামক এই বিজ্ঞানী গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থের গুণধর্মাদি বিষয়ে পরীক্ষামূলক অনুশীলন করতেন। তিনি লক্ষ্য করেন, বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে একটা আচরণসমত্ব বর্তমান। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসের রাসায়নিক গুণাগুণ পৃথক্ হলেও চাপ ও তাপের কাছে নতি স্বীকার করার বেলায় তাদের আচরণ অভিন্ন।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কোনো সন্ধান পেলে বিজ্ঞানিগণ পুলকিত বোধ করেন। এভোগাড্রো সাহেবের মনেও সেই পুলকোৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল গ্যাসের আচরণসমত্ব দর্শনে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি এ-বিষয়ে একটি চমৎকার সূত্র আবিষ্কার করেন যেটি তৎকালে প্রথমদিকে একটা অনুমান মাত্র (hypothesis) বিবেচিত হলেও পরবর্তী কালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহায়ে বিজ্ঞানিমহলে যথেষ্ট সমাদর ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সূত্রটির মর্মার্থ হচ্ছে, কোনো নির্দিষ্ট চাপ ও তাপমাত্রায় সম আয়তন বিভিন্ন গ্যাসের অণুসংখ্যা অভিন্ন।* হাইড্রোজেনের অণু আর কার্বন ডাই-অক্সাইডের অণু একই রকম নিশ্চয় নয়, তাদের আকৃতি, গঠন ও প্রকৃতি নিশ্চয় ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু একই চাপে ও তাপমাত্রায় এক লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসে যতো সংখ্যক অণু আছে ঠিক তত সংখ্যক অণু এক লিটার কার্বন ডাই-অক্সাইডে বিদ্যমান।

আপাতদৃষ্টে মনে হয়, এ আর এমনকি আশ্চর্য কথা! কিন্তু গ্যাসসমূহের সদাচঞ্চল অণুগুলির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে যখন নানাবিধ চিন্তাভাবনায় বিজ্ঞানিগণ অস্থির, তখন এই অণু-সংখ্যা সমত্ব থিয়োরীর দিক্ দিয়ে এক নূতন ইঙ্গিত বহন ক'রে এনেছিল সন্দেহ নেই। তাই এভোগাড্রো উদ্ভাবিত এই সূত্রটি পদার্থবিদ্যার বিকাশে এক অমূল্য অবলম্বন রূপে স্বীকৃত হয়ে আছে।

বাতাসের তুলনায় কোনো গ্যাস ভারী, কোনোটি হাল্কা। তাহলে ওজনের বৈষম্য অনুযায়ী কি বলা যায় কোন্ অণু ভারী, কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত হাল্কা? এ প্রশ্নের সদুত্তর পাবার জন্য পদার্থবিদ্যার সঙ্গে ভাবতে হবে রসায়নবিদ্যার কথা।

---

* Avogadro's Law : Equal volumes of all gases contain equal numbers of molecules under the same conditions of temperature and pressure. —Dictionary of Science—Uvarov, Chapman and Isaacs.

অতীতকালে বিজ্ঞানের এদুটি বিভাগ অনেকাংশে স্বতন্ত্র বিবেচিত হোত। কিন্তু পদার্থসমূহের মৌলিক স্বভাবধর্ম নিরূপণে যতোই অগ্রগতি ঘটেছে ততই দেখা গেছে এরূপ বিভেদরেখা প্রায় অর্থহীন। পদার্থের অণুতত্ত্ব তার দৃষ্টান্তস্থল।

দুটি পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগের ফলে যখন কোনো নূতন পদার্থ সৃষ্ট হয় তখন দেখা যায় যে ঐ পদার্থদ্বয়ের মিলনের অনুপাত সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ জল। ওজনের অনুপাতে কোনো ব্যতিক্রম হয় না। রসায়নবিদ্যায় এই নিয়মটি Law of definite composition নামে অভিহিত। (এক-আধটুকু ব্যতিক্রম যে হয় না, তা নয়। কিন্তু সে-ব্যতিক্রমও অন্য একটা নিয়মের বশবর্তী। পরমাণুর মিলনে তৈরি হয় অণু। একই পদার্থের রকমারি পরমাণু থাকতে পারে। তাদের ভর (বা mass) পৃথক্ হতে পারে। তাদের গুণবৈচিত্র্য পৃথক্ভাবে আলোচ্য।)

গ্যাসের বেলায় নানাবিধ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গে-লুসাক সাহেব আনুমানিক ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে একটি চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দুটি গ্যাস যখন রাসায়নিক সংযোগের ফলে তৃতীয় একটি গ্যাস উৎপন্ন করে তখন তাদের আয়তনে একটা সরল অনুপাত রক্ষিত হয় (সরল অনুপাত যথা ১ : ২ : ৩ ইত্যাদি)। বিজ্ঞানের ভাষায় এটি Law of simple proportion by volume নামে খ্যাত। উদাহরণ স্বরূপ, ২ লিটার হাইড্রোজেন ও ১ লিটার অক্সিজেন রাসায়নিক সংযোগের ফলে তৈরি করে ২ লিটার জলীয় বাষ্প (সবগুলির আয়তন কিন্তু একই চাপ-তাপ পরিমাপে)। সুতরাং এদের অনুপাত হচ্ছে ২ : ১ : ২। দ্বিতীয় উদাহরণ, ১ লিটার নাইট্রোজেন ৩ লিটার হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তৈরি করে ২ লিটার এমোনিয়া। সুতরাং এক্ষেত্রে তাদের আয়তনের পারস্পরিক অনুপাত হচ্ছে ১ : ৩ : ২।

রাসায়নিক সংযোগের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী পদার্থসমূহের মধ্যে ওজনের (mass-এর) অনুপাত সুনির্দিষ্ট একথা আগে বলা হয়েছে। কঠিন, তরল, বায়ব সকল পদার্থের বেলায় এ-নিয়ম প্রযোজ্য। গ্যাসের ক্ষেত্রে উপরন্তু দেখা যাচ্ছে, আয়তনেরও নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং বুঝতে হবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী গ্যাসের আয়তন ও তার ভরের মধ্যে নিশ্চয় কোনো বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। এভোগাড্রো সাহেবের অনুমানের চমৎকারিত্ব সেইখানে। পরীক্ষণ-লব্ধ তথ্যকে তৎকালীন অণুতত্ত্বের (molecular theory-র) সঙ্গে একসূত্রে

গ্রথিত করার কৃতিত্ব তাঁরই। বস্তুতপক্ষে, রসায়নবিদ্যায় molecular weight (আণবিক ভর), atomic weight (পারমাণবিক ভর), equivalent weight (সমতুল ভর) ইত্যাদি ধারণাসমূহের ভিত্তি স্বরূপ হচ্ছে Avogadro's Law.

এ-সবের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা পেয়েছি একটি অতীব নির্দিষ্ট সংখ্যা যার গুরুত্ব পদার্থবিজ্ঞানে অপরিসীম। সংখ্যাটির নাম Avogadro's Number (সংক্ষেপে L বা NA)। তার পরিমাণ হচ্ছে, ৬·০২২৫২ × ১০^২৩, অর্থাৎ এক gram-molecule* পরিমিত যে-কোনো গ্যাসে থাকে ঐ সংখ্যক অণু। সংখ্যাটি কোটি-কোটি-কোটিরও অধিক, কেননা ১ কোটি = ১০^৭ মাত্র।

এরূপ একটা বিশাল সংখ্যায় আমাদের কি কাজ, একথা মনে হতে পারে। কিন্তু ভাবতে হবে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতি-বৃহৎ ও অতি-ক্ষুদ্র অনেক সংখ্যার সম্মুখীন হতে হয় অনিবার্য কারণে। একদিকে অতি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু জগৎ অন্য-দিকে সুবৃহৎ মহাবিশ্ব, এ দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেদিকেই ধারণা প্রসারিত করতে চাই না কেন, আমাদের স্কেলে মাপতে গেলে বৃহৎ সংখ্যার উদ্ভব তো হবেই। যেমন ধরুন, একটা অক্সিজেন অণুর ওজন কতো জানতে চাই। বাস্তবে মেপে দেখা যায় সাধারণ চাপ ও তাপমাত্রায় ২২·৪ লিটার অক্সিজেন গ্যাসের ওজন ৩২ গ্রাম। এভোগাড্রো সূত্র অনুযায়ী ঐ পরিমিত গ্যাসে আছে N সংখ্যক অণু। অতএব ১টি অক্সিজেন অণুর ওজন (mass) $= \frac{৩২}{N}$ গ্রাম $= ৩২ \times \frac{১}{N}$ গ্রাম = ৩২ awu [1 atomic weight unit সংক্ষেপে awu $= \frac{1}{N}$ গ্রাম ($N = 6{\cdot}02252 \times 10^{23}$ per mole)]

Avogadro Number N নামক অপরিবর্তনীয় সংখ্যা অবলম্বনে বিজ্ঞানিগণ অনেক গবেষণা করেছেন এবং এটির সঙ্গে অন্যান্য ধ্রুবকের সম্পর্ক নিরূপিত হয়েছে। সে-সব কথার আলোচনায় প্রবেশ না ক'রে আমরা ফিরে যাই পদার্থের মধ্যে অণু-সন্নিবেশের কথায়। গ্যাসের তুলনায় তরল ও কঠিন পদার্থে অণুসমূহ অনেক বেশী ঘন-সন্নিবিষ্ট। সুতরাং তাদের পারস্পরিক টান বা আকর্ষণ প্রবলতর। গ্যাসের ক্ষেত্রে এই আকর্ষণ প্রভাব দুর্বল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা একেবারে নগণ্য নাও হতে

---

* (১) এক gram-molecule-এর অপর নাম এক mole ;
(২) এক gram-molecule পরিমিত গ্যাসের আয়তন = ২২·৪১ লিটার (সাধারণ চাপ-তাপ বা NTPতে) ;
(৩) একটি কার্বন এটমের ওজন যদি ধরা হয় ১২ তাহলে একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন হয় প্রায় ১৬, হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন দাঁড়ায় ১·০০৮।

পারে। সেই কারণে pv=nRT নামক ফরমূলায় কিছু সংশোধন প্রয়োজন হয়। আদর্শ গ্যাস (ideal gas) তাকেই বলে যেটি ঐ gas law-কে হুবহু মেনে চলে। বাস্তবে দেখা যায় অধিকাংশ গ্যাসই আদর্শ গ্যাস নয়। তাই তাদের জন্য একটি সংশোধিত সূত্র* আবিষ্কৃত হয়। J D Van der Waals (১৮৩৭-১৯২৩) নামক এক বিজ্ঞানী সেই সূত্রের আবিষ্কর্তা।

তরলের ক্ষেত্রে গ্যাস-অণুর মতো হুড়োহুড়ি নেই বটে, তবু ঘনতর অণু-সন্নিবেশের ফলে এবং অণুসমূহের পারস্পরিক আকর্ষণের প্রভাবে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর হলেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। একটা পাত্রের মধ্যে কিছুটা জল রাখলে দেখা যায় ঐ জলের উপরিতলটি যেখানে পাত্রের গায়ে লেগে আছে সেখানটা যেন একটু উঁচু হয়ে আছে। অর্থাৎ জলতল ওখানে সমতল না হয়ে একটা অবতল (concave surface) সৃষ্টি করেছে। স্থির জলের উপরিতল সমতল হয়ে থাকবে, এই তো প্রত্যাশা। কিন্তু এমন ব্যতিক্রম কেন হবে? এর ব্যাখ্যা মেলে আণবিক আকর্ষণতত্ত্বের সাহায্যে। জলের অভ্যন্তরে অবস্থিত অণুগুলি চারপাশের অণুর টানে সুসংহত হয়ে থাকে। জলের উপরিতলে অবস্থিত অণুগুলির অবস্থা ভিন্নরূপ। নীচের দিকে তরলের অণু আছে বটে, কিন্তু উপরের দিকে আছে বাতাসের এবং পাশের দিকে আছে পাত্রের (কঠিন পদার্থের) অণু। সুতরাং আকর্ষণ-বৈষম্যের ফলে পাত্রের গায়ে লেগে-থাকা অংশটুকু ভিন্নতর অবস্থায় পড়ে একটু উঠে থাকবে। জলের পরিবর্তে যদি পাত্রটিতে পারদ রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে তরল পারদের উপরিতল যেন একটা উত্তল (convex surface) তৈরি করেছে।

আণবিক আকর্ষণের ফলে তরলের উপরিতল সকল সময়ে যেন একটা টানে আবদ্ধ থাকে। বাঁয়া-তবলার আচ্ছাদনের চামড়া যেমন টান-ধরা থাকে তরলের উপরিতল যেন সেরূপ একটা টানের বশবর্তী হয়। এই টানকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় surface tension. একই কারণে একটা সরু নলে (capillary tube-এ) অবস্থিত তরল পদার্থের উপরিতল একটু উঠে থাকে। আবার একটুখানি তরল পদার্থ কোনো টেবিলের উপর ছিটিয়ে দিলে দেখা যায় ঐ পদার্থের অংশসমূহ বিন্দুবৎ আকার ধারণ করে, যেন কুঁকড়ে গিয়ে উপরিতলকে (surface-কে)

---

* Van der Waals equation :

$$\left(p + \frac{\alpha}{v^2}\right)(v - b) = nRT$$

যথাসম্ভব কম রাখতে চায়। অঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়, নির্দিষ্ট আয়তনের কোনো বস্তু যখন গোলাকার ধারণ করে তখন তার উপরিতলের পরিমাপ **minimum** বা সর্বনিম্ন হয়। তরল পদার্থ যেন সকল সময় আপন গাত্রদেশ (**surface**)-কে সঙ্কুচিত করে রাখতে চায়। পদার্থের এই কূর্ম-প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চমৎকারভাবে দেওয়া যায় অণুতত্ত্ব সহায়ে।

কঠিন পদার্থের বেলায় কি হয়? এ প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে প্রবেশ করতে হবে ঐ তত্ত্বের আর একটু গভীরে। বায়ব অবস্থায় সদা-চঞ্চল অণুগুলি পারস্পরিক আকর্ষণ থেকে অনেকটা মুক্ত—তাদের **random movement** বা এলোমেলো গতি তাদের সহজেই বায়বগুণসম্পন্ন করে তোলে। তরল পদার্থে অণুসমূহের পারস্পরিক আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকায় একদিকে তারল্যগুণ অন্যদিকে আপন সংগঠন সংরক্ষণের প্রবৃত্তি, এই দোটানা অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে অণুসমূহ পরস্পরকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, পদার্থের একাংশ যেন অপরাংশকে সহসা বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না। কাঠিন্যের এরূপ একটা সহজ ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে সঙ্গত ও সম্পূর্ণ মনে হলেও এ-বিষয়ে চিন্তাভাবনার অনেক কিছু আছে।

আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে কঠিন পদার্থ অনেক রকমের হতে পারে। ইট কাঠ মাটি বালি, চিনি লবণ তুঁতে, গন্ধক কর্পূর আয়োডিন, সোনা রূপা লোহা, হীরে মুক্তা ইত্যাদি যে-সব পদার্থের সঙ্গে আমরা পরিচিত সেগুলি কঠিন পদার্থের উদাহরণ। পদার্থের অবস্থা অনুযায়ী এরা এক শ্রেণীভুক্ত হলেও এদের কাঠিন্য সমান নয়, তাদের ভৌতিক গুণাবলীর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। অণুসমূহের ঘন-সন্নিবেশ এগুলিকে কঠিন পদার্থে চিহ্নিত করেছে সত্য, কিন্তু তাদের এক-একটির গুণগত বৈশিষ্ট্য, চমকপ্রদ স্বভাবধর্ম কেবলমাত্র অণুসন্নিবেশের থিয়োরী দিয়ে ব্যাখ্যাত হয় না। স্তূপীকৃত ইটকে এলোমেলোভাবে সাজালে তাতে ইটের পাঁজা তৈরি হয় বটে, কিন্তু ইমারত তৈরি হয় না। উপযুক্ত বিন্যাসের ফলেই আমরা পাই মনোহর অট্টালিকা। তেমনি অণুসমূহ ইতস্ততঃ একত্রিত হলে পদার্থের ঘনত্ব ও কাঠিন্য সৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে ঐ পদার্থের অন্তর্নিহিত **symmetry** বা আকৃতিসমত্বের কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যা মেলে না। অথচ ভৌতবিজ্ঞানে আকৃতি-সমত্ব ও গুণসমত্বের ধারণাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানজগতে যে পারিপাট্য ও ছন্দোবদ্ধতা আমরা দেখতে পাই তার অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে পদার্থের আভ্যন্তরীণ

symmetry বা আকারসমত্ব। এ-বিষয়ে অনেক কথা ভাববার আছে দর্শনের দৃষ্টি-কোণ থেকে।

কঠিন পদার্থের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় প্রসঙ্গে যেটি সহজেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে তাদের গঠনভেদ। কোনোটি দানা-দানা কোনোটি ঝুরি-ঝুরি। বিজ্ঞানের ভাষায় প্রথমটি crystalline দ্বিতীয়টি amorphous. দানা বা crystal-এর উদাহরণ চিনি, খনিজ লবণ, কোয়ার্জ (সিলিকেটের কুচো পাথর) ইত্যাদি। ঝুরি-ঝুরি অর্থাৎ যাদের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি (shape) নেই তাদের উদাহরণ গ্লাস, টার (আলকাতরা), ময়দা ইত্যাদি।

Crystal নিয়ে চিন্তা করার অনেক বিষয় আছে। প্রকৃতিরাজ্যে দানাগুলি কতো স্বাভাবিক ভাবে বহন করে আকৃতিসমত্বের সাক্ষ্য। একমুঠো চিনি বা একটু খনিজ লবণ (rock salt) হাতে নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, দানাগুলির প্রত্যেকটির চেহারায় কি চমৎকার সমত্ব! তাদের surface বা উপরিতল কতো নিখুঁত এবং একরকমের। আবার একমুঠো বালি বা মাটি নিয়ে ভালভাবে দেখলে বোঝা যায় তাদের কণাগুলি ছোটবড় নানা সাইজের এবং আকৃতির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কতো গরমিল!

বিজ্ঞানিগণ নানাধরনের ক্রস্ট্যাল পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোনোটি cube (চৌকোণ), কোনোটি tetrahedron (চারটি তলদেশযুক্ত), কোনোটি সূচের মতো, কোনোটি তারকার মতো আবার কোনোটি polyhedron ফলকের মতো। তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এইসব আকৃতিগত পার্থক্যের কারণ কি? পদার্থের অভ্যন্তরে অণুসমূহের বিশেষ বিশেষ বিন্যাসের ফলেই কি এরূপ আকৃতিভেদ? তাঁদের অনুমান, যে-সকল পদার্থের crystal structure অর্থাৎ যেগুলি নির্দিষ্ট ছকে দানা বাঁধা অবস্থায় বিদ্যমান থাকে তাদের অভ্যন্তরে অণুসমূহ (molecule অথবা ion অথবা atom) এক-একটা কাঠামোর উপর অবস্থিত থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় ঐ কাঠামোকে বলা হয় space lattice. অণুগুলি স্পন্দনরত হলেও কাঠামোর ছকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকার ফলে অণু-সংগঠন বেশ মজবুত ও অনমনীয় থাকে। এই কাঠামো নানা রকমের হতে পারে। সেই কারণে ক্রস্ট্যালের জ্যামিতিক আকারে পার্থক্য দেখা যায়।

বিজ্ঞানীদের এই অনুমানের সত্যতা প্রমাণের কোনো উপায় আছে কি? অণুসমূহ এতো ক্ষুদ্র যে তাদের খালি চোখে দেখা যায় না, অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রও সে-ব্যাপারে অক্ষম। সুতরাং এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহের

আশায় উন্নততর কৌশল উদ্ভাবনের পথ চেয়ে বিজ্ঞানিগণকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল নিশ্চয়।

মহামতি Röntgen (১৮৪৫-১৯২৩) অত্যাশ্চর্য এক্স-রে আবিষ্কার করেন। ঐ 'রঞ্জেনরশ্মি' অবলীলাক্রমে পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। অতএব উপযুক্ত উপায়ে যদি কোনো ক্রস্ট্যালের মধ্যে রঞ্জেনরশ্মি পাঠানো যায় তাহলে ঐ ক্রস্ট্যাল-মধ্যে অবস্থিত অণুসমূহের স্তরবিন্যাসে ধাক্কা খেয়ে ঐ রশ্মি ফিরে এসে অভ্যন্তরের কিছু 'খবর' দিলেও দিতে পারে। এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে crystallography সম্বন্ধে বিশেষভাবে উৎসাহিত হন বিজ্ঞানিগণ। M Von Laue নামক এক বিজ্ঞানী আনুমানিক ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এ-বিষয়ে চিন্তাভাবনার সূত্রপাত করেন এবং প্রায় সমকালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী W H Bragg (১৮৬২-১৯৪২) ক্রস্ট্যালমধ্যে রঞ্জেনরশ্মির প্রতিফলন ও তজ্জনিত ফলাফল সম্বন্ধে চমকপ্রদ তথ্যাদি উপস্থাপিত করেন। অণুবিন্যাসের যে কাঠামো, তাতে বিভিন্ন স্তর থাকে। এইসব স্তরের পারস্পরিক দূরত্ব X-ray-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুল্যমান হওয়ায় interference ও ক্ষেত্রবিশেষে diffraction-এর উদ্ভব হয়। তার প্যাটার্ন দেখে বিজ্ঞানিগণ অঙ্কপাত করে জানতে পারেন কোন্ স্তর কিভাবে বিন্যস্ত এবং কাঠামোটি কেমন। উন্নততর পরীক্ষার সাহায্যে কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরের অনেক পরিচয় তাঁরা পেয়ে থাকেন এইভাবে। আধুনিক বিজ্ঞানে আজ একথা স্বীকৃত যে, অধিকাংশ কঠিন পদার্থ ছোট বড় নানা আকৃতির ক্রস্ট্যাল দিয়ে গঠিত। জড় পদার্থের এই স্ফটিকাকৃতি বা crystalline structure শুধু বিস্ময় সৃষ্টি করে না, পরন্তু জড় পদার্থের বহুবিধ গুণাগুণই (ভৌতিক অথবা রাসায়নিক) যে অণুবিন্যাসের উপর বহুলাংশে নির্ভর-শীল তা সপ্রমাণ করে।

জড় পদার্থের সাধারণ গুণধর্ম কি কি? এ-বিষয়ে তত্ত্বসহায়ে বহু কথা আলোচিত হতে পারে। তার সারাংশ মাত্র এখানে উপস্থিত করছি।

(১) জড় পদার্থ অণুময়

এক-একটি পদার্থ তার অসংখ্য অণু দিয়ে গঠিত। ঐ সকল অণুর একক বা মিলিত আচরণের উপর নির্ভর করে পদার্থটির গুণধর্ম। বায়বীয় অবস্থায় অণুগুলি এলোমেলো (random) গতিসম্পন্ন হয়ে থাকে। তরল অবস্থায় অণুসমূহের গতিশীলতা অপেক্ষাকৃত কম, এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ ক্রিয়মান। কঠিন অবস্থায় অণুগুলির মধ্যে দূরত্ব কম এবং সেই কারণে আকর্ষণ বেশী। দানা-

বাঁধা অবস্থায় স্পন্দনশীল অণুসমূহ সুনির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ থাকে এবং ঐ ছকের তার-তম্য অনুযায়ী ক্রস্ট্যালের আকৃতি-প্রকৃতি অনেকাংশে নিরূপিত হয়।

(২) জড় পদার্থের সংযোগে বস্তুখণ্ড

এক বা একাধিক পদার্থের মিলনে (মিশ্রণে অথবা রাসায়নিক সংযোগে) গঠিত হয় বস্তুখণ্ড।

(৩) জড় পদার্থ স্থাবর

স্থাবরত্বের অপর নাম জড়ত্ব। বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে জড়বস্তুর স্থানান্তর ঘটে না। ভিতরের অণুসমূহ সদা-চঞ্চল থাকলেও সে চঞ্চলতা বাইরে থেকে চোখে দেখা যায় না, মনে হয় বস্তুটি স্থির আছে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই গুণকে বলা হয় inertia, নিউটনের গতিসূত্রে যেটি গণিতের ভাষায় প্রকাশিত।

(৪) জড় পদার্থ স্থিতিস্থাপক

বাইরে থেকে আঘাত দিয়ে জড়বস্তুর আকৃতি বা আয়তনে বিকৃতি ঘটাতে চাইলে বস্তুটি তা যথাসাধ্য প্রতিরোধ করে। এই প্রতিরোধ ক্ষমতা কোনো বস্তুতে কম, কোনোটিতে বেশী। টান বা মোচড় দিলে একটা সীমা পর্যন্ত সেই টান বা মোচড় বস্তু কর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হয়, তথাপি যেটুকু বিকৃতি ঘটে তা ঐ টান বা মোচড় প্রত্যাহৃত হলে সেই বিকৃতির অবলোপ ঘটে এবং বস্তুটি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। এই গুণধর্মের নাম স্থিতিস্থাপকতা। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, অতি ক্ষুদ্র ক্রস্ট্যাল বা পদার্থকণিকার মধ্যেও এই স্বভাব বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, ক্রস্ট্যালের এক-এক দিকে এক-এক রকম স্থিতিস্থাপকতা পদার্থমধ্যে অণুবিন্যাসের পরিচয়জ্ঞাপক এবং সেই কারণে বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যপূর্ণ।

(৫) জড়বস্তুর বিস্তৃতি আছে

যে-কোনো বস্তুখণ্ড কতকটা জায়গা জুড়ে থাকে। কতোটা জায়গা (space) অধিকার করে বস্তুটি বিরাজমান তার পরিমাপের নাম আয়তন। স্থূলদৃষ্টিতে এরূপ আয়তন নির্ণয়ে কোনো গোলমাল নেই। একখণ্ড কাঠ কতো ঘনফুট স্থান অধিকার করে আছে, অথবা পাত্রস্থিত জল পাত্রের কতো অংশ পরিপূর্ণ করে রেখেছে, অথবা কোনো গ্যাস কতো লিটার জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তা সহজেই নিরূপণ করা

যায়। কিন্তু এ-সবের সূক্ষ্মবিচারে অনেক কথা এসে পড়ে। প্রথমতঃ, পদার্থের অণুসমূহ গায়ে-গায়ে লেগে থাকলেও তাদের পরস্পরের মধ্যে ফাঁক বা শূন্যস্থান থেকে যায়। সুতরাং অসংখ্য অণুর ফাঁকে ফাঁকে অনেকটা স্থানই matter বা পদার্থ দিয়ে ভরাট নয়। দ্বিতীয়তঃ, একটি অণুর মধ্যে থাকে এক বা একাধিক এটম (পরমাণু)। তাদের মধ্যেও যথেষ্ট শূন্যস্থান আছে। আবার একটা এটমের অন্তর্গত পিণ্ড (nucleus) ও তার চারপাশে পরিভ্রমণশীল ইলেকট্রনের মধ্যেও শূন্যস্থান বিরাজমান। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে যে বস্তুটি নিরেট মনে হয়, সেটি প্রকৃতপক্ষে আদৌ নিরেট নয়। তবে, অণু ও তৎসন্নিহিত ক্ষেত্রকে যদি পরিব্যাপ্তির স্থানরূপে পরিগণিত করা হয় তাহলে পদার্থ বা বস্তুখণ্ডের বিস্তৃতি নিরূপণে কোনো অনিশ্চয়তা থাকে না।

(৬) পরমাণু সমবায়ে গঠিত হয় অণু

এখানে সমবায় অর্থে (১) নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর বিদ্যমানতা, (২) ঐ পরমাণুসমূহের সুনির্দিষ্ট বিন্যাস, (৩) পারস্পরিক বন্ধন (এখানে পরমাণু অর্থে atom অথবা ion* হতে পারে)।

রাসায়নিক সংযোগে, এই বন্ধন (bond) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধনের সামান্যতম পরিবর্তনে রকমারি পদার্থের উদ্ভব হয়। একই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন শুধু বিন্যাস ও বন্ধনের পার্থক্য অনুযায়ী সৃষ্ট করে বহুবিধ কার্বোহাইড্রেট।

(৭) তাপ প্রভাবে পদার্থের অবস্থান্তর ঘটে

তাপ একটি শক্তিবিশেষ ; এই শক্তির প্রয়োগে পদার্থমধ্যে অণুসমূহের চঞ্চলতা বেড়ে যায়, তাদের সংগঠন বিপর্যস্ত হয়। ফলে পদার্থের রূপান্তর দেখা যায় এবং গুণাগুণেরও পরিবর্তন ঘটে। তাপ প্রভাবে কঠিন পদার্থ তরলে, তরল পদার্থ বায়ব অবস্থায় পরিণত হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কঠিন পদার্থ একেবারে বাষ্পে পরিণত হয় (যথা কর্পূর, আয়োডিন ইত্যাদি)।

তাপ প্রয়োগের ফলে অনেক সময় পদার্থমধ্যে নূতন গুণের সঞ্চার হয়। আবার

---

* Ion কাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তরে মোটামুটিভাবে বলা যায়, + (প্লাস) অথবা − (মাইনাস) বিদ্যুৎযুক্ত এটম বা এটম সমষ্টির নাম 'আয়ন'। দুটি আয়ন মিলিত হয়ে অণু-গঠনের উদাহরণ, সোডিয়াম আয়ন (+) ও ক্লোরিন আয়ন (−) মিলে তৈরি করে সোডিয়াম ক্লোরাইড নামক অণু।

তাপমাত্রা খুব কমিয়ে দিলেও পদার্থের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। তরলীভূত অক্সিজেন বিশেষ নিম্ন তাপমাত্রায় চুম্বক-সচেতন হয়ে ওঠে। এমন অনেক পদার্থ আছে যেগুলির মধ্যে সাধারণ তাপমাত্রায় কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না, কিন্তু উচ্চতর তাপমাত্রায় তাদের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগের প্রবণতা সৃষ্ট হয়।

(৮) পদার্থের তাপগ্রহণ ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট

জলের তুলনায় কোনো বস্তু কতগুণ ভারী তা দিয়ে সূচিত হয় বস্তুটির 'আপেক্ষিক গুরুত্ব'। অনুরূপভাবে জলের তুলনায় কোনো বস্তু কতোগুণ তাপ গ্রহণ করতে পারে, অর্থাৎ সম তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করতে জলের তুলনায় কতো গুণ তাপ লাগে তার নাম 'আপেক্ষিক তাপ'। বিজ্ঞানের ভাষায় এই সংখ্যাকে বলা হয় **specific heat.** পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, কোনো পদার্থের **specific heat**-এর সঙ্গে ঐ পদার্থটির আণবিক ভরের (**molecular weight**-এর) একটা সম্পর্ক আছে। কেন এই সম্পর্ক বিদ্যমান সে-বিষয়ে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন বিজ্ঞানিগণ।

(৯) চুম্বক ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রবিশেষে পদার্থের উপর প্রভাব বিস্তার করে

সাধারণ অবস্থায় সকল পদার্থ চুম্বক-সচেতন নয় অর্থাৎ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না (লোহা, নিকেল, কোবল্ট প্রমুখ কয়েকটি পদার্থকে এই কারণে **magnetic substance** বলা হয়)। সকল পদার্থ বিদ্যুৎবাহী নয় অর্থাৎ তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ বাহিত হয় না। যাদের মধ্য দিয়ে সহজেই বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে তাদের **conductor** বলা হয়। কোনো কোনো পদার্থ কিছুটা বিদ্যুৎবাহী। সেগুলি **semiconductor** নামে অভিহিত। যেগুলির মধ্য দিয়ে আদৌ বিদ্যুৎ বাহিত হয় না তারা **non-conductor** বা **insulator** নামে পরিচিত। পদার্থভেদে বিদ্যুৎ বহনের এই ক্ষমতার তারতম্য কেন হয়, তাপ-পরিবর্তনের ফলে পদার্থের বিদ্যুৎরোধ ক্ষমতা পরিবর্তিত হয়, পদার্থমধ্যে আয়নের (**ion**-এর) সঞ্চার হলে কেন পদার্থটি বিদ্যুৎ-সচেতন হয়ে ওঠে এ-সব প্রশ্ন বিদ্যুৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য। চুম্বক ও বিদ্যুতের পারস্পরিক সম্পর্কও ঐ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য।

(১০) জড় পদার্থ অবিনাশী

কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে গেলে আমরা ভাবি ঐ কাষ্ঠনিহিত পদার্থটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু পড়ে-থাকা ছাই, নির্গত জলীয় অংশ এবং উবে-যাওয়া গ্যাস

এ-সবের ওজন একত্র করলে দেখা যাবে যে, সেই ওজন কাঠে যে-পরিমাণ পদার্থ ছিল এবং যে-পরিমাণ অক্সিজেন সহযোগে কাঠটি পুড়েছে তাদের ওজনের সঙ্গে সমান। অর্থাৎ দহন প্রক্রিয়ার ফলে পদার্থের রূপান্তর ঘটলেও মোট পদার্থের কিছুই বিনষ্ট হয়নি।

এইরূপ নানাবিধ পরীক্ষার ফলে Lavoisier নামক এক ফরাসী বিজ্ঞানী আনুমানিক ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, পদার্থের ক্ষয়-ব্যয় নেই। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে নূতন পদার্থ উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু ঐ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থসমূহের মিলিত ভর এবং উৎপন্ন পদার্থসমূহের ভর (mass) সম্পূর্ণ এক। বিজ্ঞানের ভাষায় এই নিয়মনীতির নাম Law of conservation of mass. ভর-সংরক্ষণ সূচক এই নিয়মটি জনৈক রুশ বিজ্ঞানী M V Lomonosov আনুমানিক ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ Lavoisier সাহেবের কয়েক বৎসর আগে উপস্থিত করেছিলেন যদিও উক্ত মূলনীতি Lavoisier সাহেবের নামের সঙ্গে আজও যুক্ত হয়ে আছে।

(১১) জড়শক্তি অক্ষয়

শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা, জোর, বল ইত্যাদি শব্দ সাধারণভাবে প্রচলিত ভাষায় সমার্থব্যঞ্জক হলেও বিজ্ঞানের ভাষায় এগুলির ধারণাগত পার্থক্য আছে। শক্তি নামক শব্দটিকে ধরা হয় energy নামক ইংরেজি শব্দের পরিভাষারূপে। ক্ষমতা অর্থে power-কে বুঝায়। সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে। কতো পরিমাণ কাজ হয় বা হতে পারে তার নাম শক্তি, আর কাজের হার অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে কতোটা কাজ হয় বা হতে পারে তার নাম 'পাওয়ার' বা 'ক্ষমতা'। গায়ের জোর এক অর্থে muscle power বা পেশীর কর্মক্ষমতা। বল অর্থে 'force' যার বৈজ্ঞানিক অর্থ নিউটনসূত্র অনুযায়ী স্থিরীকৃত। আর, ঐ সূত্র অনুযায়ী কর্ম পরিমাণের বা energy-র সংজ্ঞা হচ্ছে বল এবং বলপ্রয়োগজনিত স্থানান্তরের গুণফল (অঙ্কের ভাষায় $w=F.s$)।

এই কর্মক্ষমতা (সাধারণ অর্থে) বা জড়শক্তি নানাবিধরূপে প্রকাশিত হতে পারে। গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি হচ্ছে দুটি মূল বিভাগ। আবার শক্তির রূপও অনেক রকম—যথা তাপশক্তি, আলোকশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, চুম্বকশক্তি, বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্র, তরঙ্গশক্তি ইত্যাদি।

প্রাত্যহিক বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই শক্তির রূপান্তর।

রেলগাড়ী চলছে ; যদি কয়লার এঞ্জিন হয় তাহলে বুঝতে হবে কয়লা পুড়ে উৎপন্ন করছে তাপশক্তি, সেই তাপশক্তির সাহায্যে পিস্টন (piston) চলাচল করছে। যান্ত্রিক উপায়ে পিস্টনের রেখাকার (linear) গতি চক্রাকার (circular) গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। যান্ত্রিক শক্তির কিছু অংশ ঘর্ষণজনিত শক্তিতে অপব্যয়িত হবার পর বাকি অংশটুকু রেলগাড়ীর চাকাগুলিকে ঘোরাচ্ছে। আবার এই চক্রাকার গতিকে অন্যভাবে কাজে লাগানো যায়। একটা ডাইনামোর ভিতরে অবস্থিত তারের কুণ্ডলীকে ঘোরানো যেতে পারে। তখন তা থেকে পাওয়া যায় বিদ্যুৎ-শক্তি। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, শক্তির রূপান্তর ঘটলেও মোট শক্তির কোনো ক্ষয়-ব্যয় হয় না অর্থাৎ অপচয় না হলে নিয়োজিত শক্তি ও রূপান্তরিত শক্তির পরিমাণ অভিন্ন থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই মূলনীতির নাম Law of conservation of energy.

ভৌতিক বিজ্ঞানে এই নীতিটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের প্রথম যুগে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, (১) নিকৃষ্ট ধাতুকে বৈজ্ঞানিক যাদুবলে সোনায় পরিণত ক'রে মানুষ অফুরন্ত ধনের অধিকারী হতে পারে, (২) এমন একটা এঞ্জিন উদ্ভাবন সম্ভবপর যার সাহায্যে বিনা শক্তিব্যয়ে অফুরন্ত শক্তির উৎস পাওয়া যাবে। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, এই উভয়বিধ ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটেছিল প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নীতি-সমূহ আবিষ্কারের ফলে। বিনা কর্মক্ষয়ে শক্তির উৎপাদন অসম্ভব, প্রকৃতিরাজ্যের এই অনুশাসন একদিকে বৈজ্ঞানিকগণকে বৃথা অহঙ্কার থেকে মুক্ত রেখেছে, অন্য-দিকে মানুষের প্রত্যাশাকে যথাসম্ভব সংযত করেছে।

(১২) পদার্থ ও শক্তি পরস্পর রূপান্তরযোগ্য

ম্যাটার এনার্জিতে পরিণত হতে পারে, আবার এনার্জি ম্যাটারে রূপান্তরিত হতে পারে, এই সম্ভাব্যতা আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে মহামতি আইনস্টাইন তাঁর সুবিখ্যাত আপেক্ষিকতাবাদ সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিশেষ অবস্থায় energy ও mass-এর পারস্পরিক রূপান্তর একটি সমীকরণে আবদ্ধ। অঙ্কের ভাষায় $e = mc^2$ [e=energy, m=mass, c=velocity of light.] যেহেতু আলোকের গতি অত্যধিক সেই হেতু অত্যল্প পরিমাণ mass প্রচুর energy দিতে পারে। এটম বোমা উদ্ভাবনের এই হচ্ছে তাত্ত্বিক ভিত্তি। জড় পদার্থকে

জড় বলেই আমরা ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু সেই জড় যে কতো প্রচণ্ড শক্তির* উৎস হতে পারে, তা বিগত শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের অজ্ঞাত ছিল।

মনে হতে পারে, পৃথক্‌ভাবে জড় ও শক্তির সংরক্ষণ সূত্রদ্বয় তাহলে কি ভুল ব'লে পরিত্যজ্য? এতদিন ধরে নিউটন-প্রবর্তিত যে সূত্রাদি বিজ্ঞানিমহলে লালিত-পালিত হয়ে এসেছে তাদের কি বিদায় দিতে হবে? একটু ভাবলে বোঝা যায় যে, কার্যক্ষেত্রে পরিস্থিতি সেরূপ নয়। কেননা সাধারণভাবে আমরা বস্তুসমূহে যে গতিশীলতার পরিচয় পেয়ে থাকি তা আলোকের গতিশীলতার তুলনায় এতোই কম যে, তাদের গতিসম্পন্নতার দরুন ভরের পরিবর্তন অতীব নগণ্য। সুতরাং চলন্ত বস্তুর ভর ও স্থিত অবস্থায় বস্তুটির ভরের মধ্যে অতি সামান্য পার্থক্য থাকলেও তা অগ্রাহ্য ক'রে আমরা ধরে নিতে পারি পদার্থ সংরক্ষণ নীতি ও শক্তি সংরক্ষণ নীতি পৃথক্‌ভাবে কার্যকরী।

তবে, দার্শনিক বিচারে জড়বস্তু ও জড়শক্তির অভিন্নত্ব এক মৌলিক নীতিকে স্পর্শ করে এবং জড়জগৎ সম্বন্ধে ধারণায় অভিনবত্ব এনে দেয়। আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শনের এটি অন্যতম ভিত্তিভূমি।

---

* মাত্র ১ গ্রাম পদার্থ পুরোপুরি শক্তিতে রূপান্তরিত হলে যে-পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হতে পারে তার হিসাব e=mc নামক সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়।

$$e = 1 \times (3{\cdot}3 \times 10^{10})^2 = 9 \times 10^{20} \text{ ergs (approximately)}$$

$$= \frac{9 \times 10^{20}}{4{\cdot}13 \times 10^7} = 2{\cdot}15 \times 10^{13} \text{ calories.}$$

৮

পরমাণু

—আভ্যন্তরীণ সংগঠন—

বিজ্ঞানের পরিভাষায় molecule-কে বলা হয় অণু, আর atom-কে বলা হয় পরমাণু। শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে বোঝা যায় তাদের মধ্যে কি পার্থক্য। কোনো পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যাতে পদার্থটির গুণাবলী সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, তার নাম অণু। সুতরাং অণু হচ্ছে পদার্থের ক্ষুদ্রতম প্রতিনিধি।

অণুকে ভাঙা যায়। অণু-বিভাজনের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়। সেই প্রক্রিয়া বা process ভৌতিক (physical) হতে পারে, অথবা হতে পারে রাসায়নিক বা chemical. অণুমধ্যে অবস্থিত মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম পরমাণু। একটি জলের অণুকে ভাঙলে আমরা পাই হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু ও অক্সিজেনের একটি। দুটি নাইট্রোজেনের পরমাণু মিলিত হয়ে তৈরি করে নাইট্রোজেনের একটি অণু। আবার এমনও হয় যেখানে একটি পরমাণু দিয়েই গঠিত হয় পদার্থের একটি অণু। বিজ্ঞানের ভাষায় এইরকম পদার্থকে বলা হয় monatomic substance.

পদার্থের বিভাজ্যতা বিজ্ঞানের একটি মৌলিক অনুমান। সেই অনুমানের ভিত্তি অবলম্বনে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞানিগণ আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন নানাবিধ এটম বা পরমাণু। এযাবৎ সরকারিভাবে বিজ্ঞানিমহলে স্বীকৃত মৌলিক উপাদানের (elements-এর) সংখ্যা হচ্ছে ১০৩। এছাড়া আরও ৬টি element আছে যেগুলিকে বলা হয় transactinide elements. শেষোক্ত ৬টি পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট ও চিহ্নিত হয়েছে সত্য, তথাপি এখনো সেগুলির নাম ইত্যাদি বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি পায়নি।

এইসব মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য আছে, আছে তাদের পরমাণুমধ্যে সংগঠনের বিভিন্নতা। রকমারি পরমাণু সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান সঞ্চয় ও অনুশীলনের নাম পরমাণুবিজ্ঞান। আশ্চর্যের বিষয়, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মধ্যে প্রচুর অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও, কয়েকটি চমৎকার ঐক্যেরও সন্ধান মেলে। সেই ঐক্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ উপনীত হন পরমাণুর অন্দরমহলে যেখানে

আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন স্তরে সুবিন্যস্ত হয়ে আঙ্কিক নিয়মে গুণগত ঐক্য ও অনৈক্যের উভয়বিধ পরিচয় প্রদান করে।

পরমাণুগুলি দেখতে কেমন? শতবর্ষ পূর্বে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সে-যুগের বিজ্ঞানিবৃন্দ চটপট উত্তর দিয়ে বলতেন, পরমাণুগুলি দানা-দানা নিরেট বলের মতো জায়গা জুড়ে বিরাজ করে। তারা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং সহসা বিচ্ছিন্ন হয় না। একটা পদার্থের পরমাণু একই রকমের, কিন্তু পদার্থভেদে পরমাণু ছোট-বড়, হাল্কা-ভারী, সক্রিয়, নিষ্ক্রিয়, active ও inert ইত্যাদি। পরমাণুর এই-সব বৈষম্য দিয়ে নিরূপিত হয় পদার্থের গুণাগুণ।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে পূর্বোক্ত ধারণাসমূহ পরিবর্তন হতে শুরু হয়েছে অনেকাংশে। ধারণাগত পরিবর্তনের ফলে এটম তার এটমত্ব (অখণ্ডত্ব) হারিয়েছে বলা চলে এবং বর্তমানে বিজ্ঞানীদের কাছে একটা এটম বা পরমাণু হচ্ছে একাধিক খণ্ডাংশের সমাবেশ। ঐ খণ্ডাংশের কোনোটি জড়পিণ্ডবৎ, কোনোটি তড়িৎবিন্দুবৎ, কোনোটি তরঙ্গবৎ, আবার কোনোটির সত্তা কেবলমাত্র আঙ্কিক ধারণায় পরিকল্পিত।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, পরমাণুর খণ্ডাংশসমূহের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে এ-বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে অনেক। Physical model-এর স্থান অধিকার করেছে conceptual model, অর্থাৎ কোনোকিছুর অস্তিত্ব এখন আর জড়বৎ আকৃতি ও যন্ত্রবৎ আচরণের সুনির্দিষ্টতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সেটি এখন স্বচ্ছন্দ-বিহারী শুদ্ধ ধারণায় পর্যবসিত। বিজ্ঞানে ধারণা সম্বন্ধে কেন এরূপ পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ল সে-বিচার কিছুটা জটিল। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বস্তু বিষয়ে স্থূল পরিচয় থেকে সূক্ষ্ম পরিচয়ে উপনীত হওয়াটাই অধিকতর কাম্য।

একটি পরমাণু মুখ্যতঃ দুটি অংশে বিভক্ত। একটি অংশের নাম পিণ্ড বা নাভি, ইংরেজিতে nucleus. অপর অংশটি হচ্ছে ইলেকট্রনের 'খোল' ইংরেজিতে electronic shell, যেখানে থাকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন। তাদের আবর্তন-শীলতায় সৃষ্ট হয় এক পরিমণ্ডল যা পিণ্ডটিকে ঘিরে থাকে সর্বক্ষণ। মোটামুটি একটা পরমাণুর এই হচ্ছে সংগঠন চিত্র।

ইলেকট্রন কাকে বলে, তার সঠিক স্বরূপ কি, এ নিয়ে অনেক কথা বলার আছে। তবে ইলেকট্রনের মুখ্য পরিচয়, সেটি পরমাণুর একটি খণ্ডিত অংশ এবং পদার্থের অন্যতম মৌলিক কণিকা (subatomic, elementary particle)। বিজ্ঞানিগণ এযাবৎ এক ডজনেরও অধিক সংখ্যক এরূপ মূলকণিকার সন্ধান পেয়েছেন ও

তাদের সুচিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছেন। পদার্থ ভেদে পরমাণু বিভিন্ন রকমের হতে পারে (কোনোটি বড় কোনোটি ছোট, কোনোটি ভারী কোনোটি হাল্কা ইত্যাদি) কিন্তু তাদের মধ্যে অবস্থিত এক-এক রকম মূলকণিকার আকৃতি-প্রকৃতি একই ধরনের। উদাহরণস্বরূপ, অঙ্গার ও সোনায় পার্থক্য অনেক থাকলেও একটা অঙ্গার-পরমাণুমধ্যে অবস্থিত ইলেক্ট্রন আর স্বর্ণ-পরমাণুমধ্যে অবস্থিত ইলেক্ট্রন, এ-দুয়ের মধ্যে এতোটুকু পার্থক্য নেই। সেই কারণে ইলেক্ট্রন এক মৌলিক-কণিকা নামে অভিহিত।

পরমাণুতত্ত্ব অনুযায়ী পদার্থের গুণাগুণ নির্ণয়ে তার পরমাণুমধ্যে যে-তিনরকম মূলকণিকার উপস্থিতি ও প্রভাব অগ্রগণ্য তাদের নাম

(১) প্রোটন (proton)
(২) নিউট্রন (neutron)
(৩) ইলেক্ট্রন (electron)

সাধারণভাবে, কোনো পরমাণুর পরিচয় লাভের জন্য এই কণিকাত্রয়ের সংখ্যা ও বিন্যাস নিরূপণ যথেষ্ট বিবেচিত হয়। প্রথম দুটি অর্থাৎ প্রোটন ও নিউট্রন থাকে পরমাণুর পিণ্ডমধ্যে। আর, তৃতীয়টি অর্থাৎ ইলেক্ট্রন থাকে ঐ পিণ্ডের বাইরে আবর্তনশীল অবস্থায়। প্রোটন পজিটিভ-বিদ্যুৎযুক্ত। ইলেক্ট্রন নেগেটিভ-বিদ্যুৎ-যুক্ত। আর নিউট্রন হচ্ছে বিদ্যুৎ-বিমুক্ত। প্রোটন ও নিউট্রন বেশ ভারী, আর ইলেক্ট্রনের ভর (mass) তাদের তুলনায় নামমাত্র। ফলে একটা পরমাণুর ভর মুখ্যতঃ নির্ভর করে তার পিণ্ডস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার উপর।

তুলনামূলকভাবে উক্ত কণিকাত্রয়ের পরিচয় এইরূপ :

নাম	অবস্থান	বিদ্যুৎ-পরিমাণ	ভর-পরিমাণ
প্রোটন	পিণ্ডমধ্যে	+১	১·০০৭০
নিউট্রন	পিণ্ডমধ্যে	০	১·০০৮৭
ইলেক্ট্রন	পিণ্ডের বাইরে	−১	০·০০০৫৫

জ্ঞাতব্য :

(১) একটি ইলেক্ট্রন-বাহিত বিদ্যুতের পরিমাণকে বিদ্যুতের অন্যতম একক ধরা হয়। তাই ইলেক্ট্রনের বিদ্যুৎ-পরিমাণ হচ্ছে −১ (বিযুক্ত চিহ্ন

দেওয়া হয় নেগেটিভ বা ন-বিদ্যুতের* পরিচায়ক হিসাবে) প্রকৃতপক্ষে একটি ইলেক্ট্রনে থাকে $১^{\cdot}৬০২১০ \times ১০^{-১৯}$ কুলম্ব ন-বিদ্যুৎ।

(২) একটি প্রোটন-বাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ হচ্ছে +১ অর্থাৎ ইলেক্ট্রনের বিদ্যুৎ পরিমাণের সমান, কিন্তু বিপরীতধর্মী। +চিহ্ন পজিটিভ বা প-বিদ্যুতের* পরিচায়ক।

(৩) একটা পরমাণুর ভর (চলতি কথায় ওজন) অতীব স্বল্প। সুতরাং তার খণ্ডাংশ কোনো কণিকার ভর যে কতো কম তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন পরমাণুর ভরে বিভিন্নতা আছে সেইহেতু একটা তুলনা-মূলক সংখ্যা দিয়ে সূচিত হয় তাদের ভর। বিজ্ঞানিমহলে স্বীকৃত পরিমাপ অনুযায়ী একটা অক্সিজেন-পরমাণুর ভর ১৬ ধরলে একটা কার্বন-পরমাণুর ভর দাঁড়ায় ১২ (প্রকৃতপক্ষে ১২·০১১), একটা হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভর হয় কিঞ্চিদধিক ১ (প্রকৃতপক্ষে ১·০০৮)।

এই অনুপাতের ভিত্তিতে একটি প্রোটনের ভর হচ্ছে ১·০০৭০, এবং একটি নিউট্রনের ভর সমান ১·০০৮৭। এ-সবের এককের নাম atomic weight unit বা সংক্ষেপে awu (১ গ্রাম$=৬^{\cdot}০২ \times ১০^{২৩}$ awu)।

কণিকাগুলির আয়তন কতটুকু? এও এক বিস্ময়কর ব্যাপার! কেননা পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে তার অণু। সেই অণুর মধ্যে আছে পরমাণু, তার মধ্যে আছে পিণ্ড ও তার খোল। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঐ পিণ্ড ও খোল মিলিতভাবে যতটুকু স্থান অধিকার করে থাকে, তার অতি অল্পাংশ জুড়ে থাকে এক-একটি মূলকণিকা (যথা ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন), বাকি স্থানটুকু নিছক শূন্য। অতএব নিরেট বস্তু আসলে আদৌ নিরেট নয়, তার প্রায় সবটুকুই ফাঁকা। এহেন পরিস্থিতিতে এখানে-ওখানে পুঞ্জীভূত হয়ে বিন্দুবৎ স্থান অধিকার করে থাকে ঐসব কণিকার দল। এদের সম্বন্ধে সঠিক উপমা দেওয়া দুষ্কর। তথাপি আকাশবিজ্ঞানীদের অনুসরণে কেউ কেউ কল্পনা করেছেন, পরমাণু যেন একটা সৌরমণ্ডল। তার নাভি বা 'ফোকাসে' যেমন সূর্য অবস্থিত থাকে তেমনি একটি পরমাণুমধ্যে তার পিণ্ডটির অবস্থান। আর, তাকে বেষ্টন ক'রে গ্রহের মতো ঘুরতে থাকে ইলেক্ট্রনের দল। কেন্দ্রগত সূর্যের টান (আকর্ষণ) যেমন গ্রহ-

* নেগেটিভ বিদ্যুৎ ও পজিটিভ বিদ্যুৎ যথাক্রমে ঋনাত্মক ও ধনাত্মক বিদ্যুৎ নামে অভিহিত হয়। তবে মনে রাখার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে তাদের ন-বিদ্যুৎ ও প-বিদ্যুৎ বলা যেতে পারে।

গুলিকে ছিটকে-পড়া থেকে রক্ষা করে (ঘূর্ণনজনিত পলায়নপরতাকে প্রতিহত ক'রে) তেমনি পরমাণুপিণ্ড ও আবর্তনরত ইলেক্‌ট্রনের পারস্পরিক বৈদ্যুতিক টান পরমাণুটিকে সুসংহত রাখে।

এরূপ একটা চালচিত্র অঙ্কন করেছিলেন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে। তিনি কল্পনা করেছিলেন এটমের একটা মডেল, যেটি তাঁর নামাঙ্কিত হয়ে আছে আজও। বুঝবার পক্ষে মডেলটি যথেষ্ট সহজ-সরল হলেও, পরীক্ষণ-লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এটির কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা যায়। সংস্কার সাধনের সেই কাজ সম্পন্ন করেন ডেনমার্ক দেশীয় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী নিয়েল বোহর (Niels Bohr—1885-1962)। তাঁর নাম অনুযায়ী এটি বিজ্ঞান জগতে পরমাণুর 'বোহর মডেল' নামে সুপরিচিত।

এই মডেলের সারাংশ উপস্থিত করার আগে দুটি বিষয় বিবেচ্য। এক, মডেল শব্দটি সঠিক কি অর্থে প্রযুক্ত। দুই, বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর এক-এক রকম মূল-কণিকা অভিন্ন কিনা। অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুস্থিত ইলেক্‌ট্রন আর অঙ্গার-পরমাণুস্থিত ইলেক্‌ট্রন হুবহু এক কিনা। এ-বিষয়ে সুস্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য বিজ্ঞানিগণকে নানাবিধ পরীক্ষার আয়োজন করতে হয়েছে। পরীক্ষণ-লব্ধ ফলাফল কখনো ঠিক প্রত্যাশিতভাবে এক-এক রকম মূলকণিকাগুলির আচরণগত অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন করেছে, কখনো বা ঐসব ফলাফল সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে নূতনতর ধারণার ইঙ্গিত প্রদান করেছে।

ইলেক্‌ট্রন নামক মূলকণিকার আবিষ্কর্তারূপে ধরা হয়ে থাকে প্রখ্যাত ইংরেজ-বিজ্ঞানী স্যার জে জে টমসনকে (J J Thomson, 1856-1940)। তিনি ইলেক্‌ট্রনের বৈজ্ঞানিক রূপরেখা প্রথম উপস্থিত করেন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পদার্থ-নির্গত কণিকারূপে এটি বিজ্ঞানিমহলে গোচরীভূত হয় অনেক আগে। আনুমানিক ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে একাধিক বিজ্ঞানী (যাদের মধ্যে Plücker-এর নাম অগ্রগণ্য) নানাবিধ পরীক্ষা করতে থাকেন, নিম্নচাপযুক্ত গ্যাসের মধ্যে উচ্চবিভবসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রয়োগ করলে কি হয় তা দেখবার জন্য।

দুইমুখ বন্ধ কাঁচের একটা পুরু টিউব (অনেকটা বেগুনের মতো দেখতে) নিয়ে তার মধ্যে দুই প্রান্তে দুটি ধাতব পাত লাগানো হয়। এ দুটি পাত বিদ্যুৎ-প্রান্ত বা ইলেক্‌ট্রোডের কাজ করে অর্থাৎ তাদের উপর বিদ্যুৎবিভব (ভোল্টেজ) প্রয়োগ করা চলে। এহেন টিউবটির মধ্যে পুরে দেওয়া হয় অতি নিম্নচাপবিশিষ্ট একটা গ্যাস। এমনিতে গ্যাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল হয় না। কিন্তু

পরিলক্ষিত হয় যে, নিম্নচাপযুক্ত ঐ গ্যাসের মধ্য দিয়ে অবস্থাবিশেষে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে এবং বিদ্যুতের চমক (sparking) দেখা যায়। টিউবে আবদ্ধ গ্যাসটির চাপ অতি নিম্নমাত্রায় থাকলে ন-বিদ্যুৎ প্রান্ত থেকে কি যেন নির্গত হয়ে সমস্ত পাত্রটিকে নীলাভ আলোতে ভরিয়ে দেয়। পরীক্ষাটির এই হচ্ছে স্থূল বিবরণ, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে আরো অনেক কিছু দেখার জন্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই পরীক্ষা বারংবার আয়োজিত হয়েছিল তৎকালীন বিজ্ঞানিগণ কর্তৃক। তাঁরা লক্ষ্য করেন,

(১) ন-বিদ্যুৎপ্রান্ত (cathode) থেকে উদ্ভূত রশ্মি প্রকৃতপক্ষে কণিকাস্বরূপ
(২) উক্ত কণিকাসমূহ সরলরেখা পথগামী
(৩) কণিকাগুলি ন-বিদ্যুৎযুক্ত
(৪) প্রত্যেকটি কণিকার সুনির্দিষ্ট ভর (mass) আছে যদিও তার পরিমাণ অত্যল্প
(৫) ক্যাথোড-নির্গত ঐ কণিকাগুলির আকৃতি-প্রকৃতি ক্যাথোডটি কোন্ ধাতু দিয়ে নির্মিত তার উপর নির্ভরশীল নয় এবং টিউবে আবদ্ধ যে গ্যাস থাকে তার উপরও নির্ভর করে না।

শেষোক্ত ব্যাপারটি বেশ চাঞ্চল্যকর কেননা, কোনো বস্তু নির্গত কণা বস্তুটির বৈশিষ্ট্য বহন করবে এটাই তো প্রত্যাশা। কিন্তু বারংবার পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, ঐ কণিকাগুলি উৎস-রূপী পদার্থ নির্বিশেষে সমান গুণের অধিকারী। তারা পরমাণুসমূহের এমন একটি খণ্ডিতাংশ যা সমপরিমাণ ন-বিদ্যুৎযুক্ত, একই ভর-বিশিষ্ট এবং প্রকৃতিতে অভিন্ন। এদেরই নাম ইলেক্ট্রন। সঙ্গত কারণেই এরা পরমাণুর এক মৌলিক উপাদানরূপে পরিচয় লাভ করে।

এহেন ইলেক্ট্রনের আবিষ্কার পরমাণু বিজ্ঞানের রাজ্যে উপনীত হবার দ্বার-স্বরূপ। শুধু তাই নয়, বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের চাবিকাঠিও ইলেক্ট্রনের হাতে। কেননা, ইলেক্ট্রন একদিকে পরমাণুসমূহের অন্যতম মূলকণিকা, অন্যদিকে তারা বিদ্যুতেরও ক্ষুদ্রতম আধারস্বরূপ।

ইলেক্ট্রন ন-বিদ্যুৎযুক্ত। তাই এটি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানিগণ সন্ধান করতে থাকেন এর বিপরীত (opposite) বিদ্যুৎযুক্ত কোনো পরমাণু-কণিকা আছে কিনা। বিশিষ্ট জার্মান বিজ্ঞানী W. Wein প্রোটনের রূপরেখা উপস্থিত করেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ টমসন সাহেবের ইলেক্ট্রন-আবিষ্কারের পরবর্তী বৎসরে। তবে পরমাণুপিণ্ডের মধ্যে প্রোটনের অবস্থান-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় কয়েক

বৎসর পর বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের নেতৃত্বে ! এর সূত্রপাত অবশ্য হয়েছিল কিছু আগে, নিম্নচাপযুক্ত গ্যাসের মধ্যে উচ্চবিভবযুক্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ফলাফল লক্ষ্য করার সময় থেকে। ক্যাথোড বা ন-বিদ্যুৎ প্রান্ত থেকে যেমন ইলেকট্রনের উদ্ভব ঘটে তেমনি প-বিদ্যুৎপ্রান্ত থেকে পরিলক্ষিত হয় প-বিদ্যুৎযুক্ত পরমাণু-কণিকা যার নাম প্রোটন।

বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে বিজ্ঞানিগণ এই প্রোটন সম্বন্ধে তথ্যাদি আহরণ করেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,

(১) পরমাণুমধ্যে অবস্থিত প্রোটন হচ্ছে প-বিদ্যুৎযুক্ত মৌলিক কণিকা।

(২) একটা ইলেকট্রনে যে-পরিমাণ ন-বিদ্যুৎ থাকে একটা প্রোটনে থাকে ঠিক সেই পরিমাণ প-বিদ্যুৎ।

(৩) ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটন অনেক বেশী ভারী।

ইলেকট্রন-প্রোটন সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞান অর্জিত হলেও একটা পরমাণুমধ্যে তারা কতো সংখ্যায় ও কিভাবে অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ পরমাণুর constitution বা গঠনতন্ত্র কেমন সে-বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য আহরণে সময় লেগেছিল কয়েক বৎসর। পরমাণুপিণ্ড বা nucleus যেন একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। সে দুর্গে হানা দিতে না পারলে, দুর্গের কোথায় কি আছে তা না জানলে তো পরমাণুর আভ্যন্তরীণ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই পরমাণুপিণ্ডে আঘাত হানার কলাকৌশল অবগত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল বিজ্ঞানিগণকে।

আনুমানিক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড সাহেবের নেতৃত্বে অনুশীলনরত একদল বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন এক চমকপ্রদ ঘটনা। তেজস্ক্রিয় কোনো পদার্থ থেকে নিঃসৃত আলফা কণিকাসমূহ (alpha particles) যখন একটা সোনার পাতের উপর এসে পড়ে তখন দেখা যায় অধিকাংশ আলফা কণিকা সোনার পাত ভেদ করে এগিয়ে যায় বটে, কিন্তু কিছু সংখ্যক কণিকা ঐ সোনার পাতের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্বর্ণ-পরমাণুর ভিতরে ঢুকতে না পেরে ছিটকে পিছন দিকে ফিরে আসে।

ব্যাপারটা সমান্যই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিতে আলফা কণিকার এরূপ অদ্ভুত আচরণ অর্থাৎ সামনের দিকে ধাবমান হবার পরিবর্তে পিছন দিকে ছিটকে পড়াটা আদৌ আকস্মিক নয়, এটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আলফা-কণা প-বিদ্যুৎযুক্ত। সুতরাং এই ঘটনা যদি বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ বা electric repulsion-জনিত হয় তাহলে বুঝতে হবে স্বর্ণ-পরমাণুর মধ্যে কোথাও নিশ্চয় দানা-বাঁধা প-বিদ্যুৎ আছে যার সান্নিধ্যে এসে কিছু সংখ্যক আলফা-কণিকা বিকর্ষণের ধাক্কায় পিছু হাঁটতে বাধ্য হয়েছে।

রাদারফোর্ড সাহেব সেই অনুমান করেছিলেন। পরমাণু সম্বন্ধে তিনি যে-মডেল উপস্থিত করেন তাতে অনুমিত হয় যে, সোনার পরমাণু বেশ ভারী এবং ঘনসন্নিবিষ্ট হলেও পরমাণুপিণ্ডগুলি পরমাণুর তুলনায় আয়তনে এতোই ক্ষুদ্র যে একটা পরমাণু-মধ্যে প্রায় সবটুকুই ফাঁকা জায়গা বা empty space ধরা যায়। ফলে আলফা-কণিকার অধিকাংশই পরমাণুপিণ্ডস্থিত প-বিদ্যুতের কাছাকাছি আসে না। সেগুলি সোজাপথে সোনার পাত ভেদ ক'রে চলে যায়। কিন্তু যে স্বল্পসংখ্যক আলফা-কণিকা পরমাণুপিণ্ডের সান্নিধ্যে এসে পড়ে তারা প্রবল বিকর্ষণের সম্মুখীন হয়ে উল্টোমুখে (reversed direction-এ) ধাবিত হতে থাকে। পরিলক্ষিত ঘটনার এই হচ্ছে উক্ত মডেল অনুযায়ী একটা সহজ ব্যাখ্যা।

পরমাণুর মধ্যে প-বিদ্যুৎ ও ন-বিদ্যুতের এই খেলা বেশ চমকপ্রদ সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে পরমাণুর অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক খেলা যাই চলুক না কেন, বাইরে থেকে পরমাণুটি electrically neutral অর্থাৎ বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। সুতরাং অনুমান করতে কোনো অসুবিধা নেই যে, পিণ্ডের মোট প-বিদ্যুৎ ও ইলেক্‌ট্রন-সমূহের মোট ন-বিদ্যুৎ পরস্পর সমান। এবং সেই কারণে কোনো পরমাণুতে যতগুলি প্রোটন থাকে ঠিক তত সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন থাকতে হবে পিণ্ডের বাইরে (যেহেতু একটি প্রোটন এবং একটি ইলেক্‌ট্রন সমপরিমাণ বিদ্যুৎ বহন করে)।

পরমাণুপিণ্ডে কি একাধিক প্রোটন থাকতে পারে ? পারে বৈকি, কেননা তাই দিয়েই তো পদার্থের বিভিন্নতা। হাইড্রোজেনের বেলায় কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, কেননা সাধারণভাবে* একটি প্রোটন ও একটি ইলেক্‌ট্রন নিয়েই হাইড্রোজেনের সংসার। কিন্তু অন্য সব পদার্থে পরমাণুপিণ্ডে থাকে একাধিক প্রোটন।

প্রশ্ন ওঠে, একটা পরমাণুপিণ্ডে অনেকগুলো প্রোটন জোট বেঁধে থাকতে পারে কি ? প্রত্যেকটি প্রোটনে প-বিদ্যুৎ আছে, তারা পরস্পরকে repel বা বিকর্ষণ ক'রে ছিটকে সরিয়ে দেয় না কেন ? কোন্ শক্তির সাহায্যে পরমাণুপিণ্ডে প্রোটন-সমূহের সহাবস্থান সম্ভবপর এ নিয়ে বিজ্ঞানিগণ নানাবিধ চিন্তাভাবনা করে থাকেন। পিণ্ডমধ্যে ক্রিয়াশীল ঐ শক্তিসমূহ exchange force নামে অভিহিত হয়। তাদের উদ্ভব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে meson নামক পিণ্ড-কণিকাসমূহের উপর।

কোনো পরমাণু মধ্যে যদি একাধিক ইলেক্‌ট্রন থাকে তাহলে তাদের বিন্যাস কেমন হবে, এ প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী Niels Bohr একটি

* হাইড্রোজেনের isotope আছে ; সেক্ষেত্রে ১টি প্রোটন, ১টি ইলেক্‌ট্রন ও ১ অথবা ২টি নিউট্রন থাকে একটি পরমাণুমধ্যে।

চমৎকার রূপরেখা উপস্থিত করেন। তদবধি সেই রূপরেখা পরমাণুর 'বোহর মডেল' নামে পরিচিত। তিনি কল্পনা করেন, পরমাণুপিণ্ডকে বেষ্টন করে ইলেক্‌ট্রনসমূহ একাধিক কক্ষপথে আবর্তিত হতে থাকে, অনেকটা স্থর্যের চারিদিকে পরিভ্রমণশীল গ্রহসমূহের মতো। তাই এইসব ইলেক্‌ট্রনকে **planetary electron** বলা হয়। অনুমিত হয়, পরমাণুপিণ্ড থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব অনুযায়ী এক-একটা স্তরে ইলেক্‌ট্রনগুলি বিন্যস্ত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় এক-একটি স্তর হচ্ছে এক-একটা **energy level.** স্থতরাং স্তরভেদ অর্থে বোঝায় শক্তির তারতম্য। একটা স্তর থেকে যদি ইলেক্‌ট্রন অন্য স্তরে ঝম্পপ্রদান করে তাহলে বুঝতে হবে তার শক্তিমত্তার পরিবর্তন হচ্ছে। উচ্চ স্তর (higher energy level) থেকে নিম্নস্তরে (lower energy level-এ) পৌঁছানোর অর্থ এক ঝাঁক শক্তির বিকিরণ। কেন এমন হয় সেকথা বুঝতে হলে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হবে। ম্যাক্স প্লাঙ্ক নামক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এই তত্ত্বের প্রবর্তক। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি এই তত্ত্ব উদ্ভাবন ক'রে বিজ্ঞান জগতে এক নূতন যুগের স্থচনা করেন। শক্তির বিকিরণ যে একটানা (continuous) হয় না, সেটি হয় ঝাঁকে ঝাঁকে এই হচ্ছে ঐ তত্ত্বের মূলকথা। অর্থাৎ, শক্তির পরিমাণ নির্ণয়েও একটা ন্যূনতা বা আণবিকতা আছে, এই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব।

একটা পরমাণুর অভ্যন্তরে কী আছে, ইলেক্‌ট্রনগুলি কিভাবে বিন্যস্ত থাকে এ-সব আলোচনা প্রসঙ্গে শক্তি-বিকিরণের কথা এসে পড়ল কেন? তার কারণ, বিজ্ঞানে কোনো কিছুই খাপছাড়া নয়, সবই যেন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। তাই দেখি, পরমাণু থেকে নির্গত তেজ বা শক্তি স্থষ্টি করে নির্দিষ্ট বর্ণের আলোক। হাইড্রোজেন গ্যাসের বর্ণালী-বিশ্লেষণে আমরা পাই ঐ পরমাণুটির বিশেষ পরিচয়, তার আভ্যন্তরীণ সংগঠনের বিচিত্র সংবাদ। উক্ত তত্ত্ব অনুযায়ী ইলেক্‌ট্রনের কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ঝম্পপ্রদান এবং তজ্জনিত নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক বিকিরণ ইত্যাদির ব্যাখ্যা যথার্থই অভিনব। তিনটি মৌলিক অনুমানের (**basic postulate**-এর) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই তত্ত্ব।

(১) পরমাণুপিণ্ডের চারপাশে কোনো নির্দিষ্ট কক্ষপথে যখন কোনো ইলেক্‌ট্রন আবর্তনরত থাকে তখন ঐ অবস্থায় ইলেক্‌ট্রনটি কোনো শক্তি বিকিরণ করে না।

(২) পরমাণুপিণ্ড থেকে ইলেক্‌ট্রনের কক্ষপথগুলির সম্ভাব্য দূরত্ব একটা আঙ্কিক নিয়মে স্থনির্দিষ্ট।*

---

* অঙ্কের ভাষায় আবর্তনরত ইলেক্‌ট্রনের angular momentum বা কৌণিক ভরবেগ (৯৯ পাতায়)

(৩) এক-একটি সম্ভাব্য কক্ষপথে আবর্তনরত ইলেক্‌ট্রনের energy বা শক্তি এক-এক পরিমাণ হওয়ায়, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঝম্পপ্রদানের সময় ইলেক্‌ট্রনের শক্তিসম্পন্নতার পরিবর্তন ঘটে। উচ্চাবস্থা থেকে নিম্নাবস্থায় আসার সময় তদনুযায়ী শক্তির নির্গমন হয়। আবার, নিম্নাবস্থা থেকে উচ্চাবস্থায় উপনীত হবার সময় হয় শক্তির শোষণ।*

উপরি-উক্ত অনুমানত্রয় থেকে বোঝা যায়, কি চমৎকার কল্পনার আশ্রয়ে বোহর সাহেব গড়ে তুলেছিলেন তাঁর তত্ত্ব! একদিকে ইলেক্‌ট্রনসমূহের কক্ষবিন্যাস, অন্যদিকে উত্তেজিত পরমাণু থেকে প্রাপ্তব্য বিকিরণের তরঙ্গভঙ্গি যেন বিজ্ঞানরাজ্যে দুটি পৃথক্ ক্ষেত্রের একীকরণ। এ-বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য সন্দেহ নেই, তথাপি বুঝতে হবে পরমাণু বিজ্ঞানে বোহর তত্ত্ব শেষ কথা নয়। হাইড্রোজেন গ্যাসের বর্ণালী ব্যাখ্যায় এই তত্ত্বের সাফল্য অর্জিত হলেও একাধিক ইলেক্‌ট্রনযুক্ত পদার্থের ক্ষেত্রে এটির প্রয়োগে অনেক জটিলতা এসে পড়ে। সেই জটিলতা পরিহার করার জন্য বিজ্ঞানিগণ ভাবতে থাকেন, বোহর মডেলের কোনো বিকল্প উদ্ভাবন করা যায় কিনা।

ইতিমধ্যে বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে বিজ্ঞানজগতে বহুবিধ ধারণাগত পরিবর্তন সাধিত হয়। গণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে সে-সবের মূল্যায়ন প্রায় অসম্ভব। তথাপি সাধারণভাবে এটি জ্ঞাতব্য যে, পদার্থ ও শক্তি, কণিকা ও তরঙ্গ একটা দ্বৈত-আচরণে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। একই সত্তা কখনো পদার্থরূপে কখনো শক্তিরূপে প্রতিভাত। একই মৌলিক কখনো কণিকারূপে কখনো তরঙ্গরূপে আপন পরিচয় প্রদান করে। পরমাণুমধ্যে অবস্থিত ইলেক্‌ট্রনের এই দ্বৈতভাব (dual existence) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যার ফলে পরমাণুর নবতর মডেলের

$\frac{h}{2\pi}$ নামক একটা নির্দিষ্ট রাশির সঙ্গে কোনো পূর্ণসংখ্যার গুণফলের সমান। h=Planck's constant $=6 \cdot 62559 \times 10^{-27}$ erg-seconds. এই h-কে ধরা হয় universal constant রূপে। Max Planck (1858-1947)-এর নাম অনুযায়ী এই নামকরণ।

* শক্তির এরূপ ক্ষরণ বা শোষণের পরিমাণ একটি আঙ্কিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। অঙ্কের ভাষায়

$E_1 \sim E_2 = h.\nu$

E_1 অর্থে এক নম্বর কক্ষে অবস্থানরত ইলেক্‌ট্রনের শক্তি

E_2 „ দুই নম্বর „ „ „ „

$\nu =$ শক্তি বিকিরণের কম্পনাঙ্ক।

উদ্ভব। বিজ্ঞানের ভাষায় এটি wave mechanical model নামে পরিচিত। এই মডেল অনুযায়ী একটা পরমাণুপিণ্ডের পরিমণ্ডলে অবস্থিত ইলেক্‌ট্রনসমূহ এক-একটা সম্ভাব্যতার প্রতীক মাত্র। তাদের আচরণ কণিকাবৎ হলেও তাদের অবস্থিতি (অর্থাৎ কোথায় কখন কিভাবে থাকবে) একটা অনিশ্চয়তাযুক্ত। সুতরাং এহেন ইলেক্‌ট্রন শেষ বিচারে একটা আঙ্কিক ধারণায় পর্যবসিত!

পদার্থের অভ্যন্তরে নিহিত বস্তুর সন্ধানে অগ্রসর হয়ে কোথায় এসে পড়েছি তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কোনো আঙ্কিক ধারণাকে বাস্তব ব'লে গ্রহণ করা সহজসাধ্য নয়। মনে হয় যেন কল্পনার জাল বুনে বাস্তব থেকে সরে যাচ্ছি। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তা নয়। পরিচয় ও প্রত্যয়ের ফলে আঙ্কিক ধারণা কতোখানি বাস্তবিক সত্যে পরিণত হয় তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা। দুটি পাথর, দুটি ফুল, দুটি ফলের মধ্যে গণনাগত যে ঐক্য তার বাচক হচ্ছে 'দুই' নামক সংখ্যা। দুই আর দুই মিলে চার হয়, এই সত্যকে মেনে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, ২, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা এবং যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি প্রক্রিয়া একটা abstract system বা শুদ্ধ ধারণাগত পদ্ধতির অঙ্গস্বরূপ। ভর, বেগ, দৈর্ঘ্য, সময় ইত্যাদি সবই তো অনুরূপ abstraction বা কল্পনাপ্রসূত চিন্তা-প্রণালীর ফলশ্রুতি। সুতরাং পরমাণুমধ্যে ইলেক্‌ট্রন বিন্যাসকে সম্ভাব্যতার একটা বিন্যাস (probability distribution) রূপে স্বীকার করে নিতে কোনো মানসিক বাধা থাকা উচিত নয়।

যাই হোক, সম্ভাব্যতা ও সত্যতা সম্বন্ধে নৈয়ায়িক বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে ফিরে আসি পরমাণুমধ্যে সংগঠন প্রসঙ্গে। একটা পরমাণুপিণ্ডে যতগুলি প্রোটন থাকবে, তার পরিমণ্ডলে তত সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন থাকতে হবে পরমাণুটিকে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ রাখার জন্য, একথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কোনো পদার্থের পরমাণুপিণ্ডে কতো সংখ্যক প্রোটন থাকে তা ঐ পদার্থের পরিচায়ক। বিজ্ঞানের ভাষায় ঐ সংখ্যাকে বলা হয় atomic number. এটি যেন পদার্থের রোল-নম্বর বা মার্কা। যাবতীয় পদার্থ এই atomic number দিয়ে পরিচিত।

সমগুণসম্পন্ন পদার্থগুলিকে এক-একটা গোত্র বা শ্রেণীতে বিভক্ত করার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পদার্থসমূহের ভেদাভেদ নিরূপণ করা। কোথায় ঐক্য, কোথায় অনৈক্য তার সন্ধান মেলে এরূপ classification বা বর্গীকরণের মধ্য দিয়ে। এই কাজে পূর্বোক্ত atomic number অতীব সহায়ক।

এযাবৎ আবিষ্কৃত বা চিহ্নিত মৌলিক পদার্থসমূহের প্রত্যেকটির এক-একটা নিজস্ব

এটম-নম্বর আছে। সেই এটম-নম্বর বা পরমাণু অঙ্কের ক্রম অনুযায়ী বিজ্ঞানিগণ একটা তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তালিকাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কেননা ঐ তালিকার সারি ও স্তম্ভ (row and column) অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ পদার্থগুলির মধ্যে গুণাগুণের সাদৃশ্য অথবা ক্রম-পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এই তালিকাকে বলা হয় Periodic Table. ইংরেজি নাম থেকেই বোঝা যায়, তালিকাভুক্ত পদার্থসমূহের গুণভেদ একটা ক্রম অনুযায়ী হয়ে থাকে। কেন এই periodicity বা পৌনঃপুনিকতা, সে-বিচার স্বতন্ত্র। তবে বিজ্ঞানীদের কাছে এরূপ একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা বড়ই আদরণীয়, কেননা তাঁদের কাজই তো প্রকৃতি-রাজ্যে নিয়মানুবর্তিতার সূত্র সন্ধান।

বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে জার্মান বিজ্ঞানী লোথার মেয়র ও রুশ বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ বহুবিধ পর্যবেক্ষণের পর একটা সারণি (table) প্রস্তুত করেন যেটি periodic table নামে খ্যাত। তাঁরা পদার্থসমূহের atomic weight বা আণবিক ভরের ভিত্তিতে তাদের ঐ সারণিভুক্ত করেন। তাতে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য থেকে যায়। এ-বিষয়ে পরবর্তী বিজ্ঞানিগণ বহু জল্পনা-কল্পনার পর স্থির করেন যে পরমাণুর ভরের পরিবর্তে পরমাণু-অঙ্ক (এটম-নম্বর) অনুযায়ী পদার্থগুলিকে তালিকাবদ্ধ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেননা, পদার্থের গুণাগুণ বিচারে কোনো পদার্থের পরমাণু কতো ভারী বা কতো হাল্কা তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেই পরমাণুমধ্যে ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা ও স্তর-বিন্যাস কেমন এবং পরমাণুটির প্রান্তদেশে (outermost shell-এ) কতো সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন আবর্তনরত অবস্থায় বিদ্যমান।

রসায়ন বিজ্ঞানীদের মতে, দুই বা ততোধিক পদার্থের পরমাণুর সংযোগ বা মিলন তখনই হয় যখন তাদের পরমাণুপিণ্ড থেকে দূরতম স্তরের (outermost shell-এর) ইলেক্‌ট্রনসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় (transfer) অথবা ভাগাভাগি (sharing) হয়। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, এরূপ বিনিময় বা ভাগাভাগি আদৌ এলোমেলো নয়। সেটি নির্ভর করে মিলনমুখী পরমাণুদ্বয়ের প্রান্তবর্তী ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যার উপর, আর তাদের বিন্যাসের উপর।

একটা পরমাণুমধ্যে আবর্তনরত ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা যদি একাধিক হয় তাহলে সেগুলি কয়টি স্তরে কতো সংখ্যায় বিন্যস্ত হয়ে থাকবে তার একটা নিয়ম আছে। কোন্ স্তরে সর্বোচ্চ কত সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন থাকতে পারে তারও একটা হিসাব*

* পরমাণুপিণ্ডের নিকটতম স্তরকে যদি E_1 ধরা হয়, পরবর্তী স্তরকে যদি E_2, E_3, E_4 ইত্যাদি ধরা হয় তাহলে E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6, স্তরে সর্বোচ্চ সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন থাকতে পারে যথাক্রমে 2, 8, 18, 32, 18, 8।

আছে। সুতরাং পরমাণু সংযোগের ক্ষেত্রে ইলেক্‌ট্রনের যে transfer বা sharing (ভাগাভাগি) ঘটে তার অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে স্তর-বিন্যাসের পূর্বোক্ত নিয়ম।

পদার্থভেদে পরমাণুর ওজন বা ভর কি বিভিন্ন? প্রশ্নটি বিজ্ঞানীদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে পরমাণু বিজ্ঞান রচনার প্রায় প্রারম্ভ থেকে। সাধারণভাবে তাঁদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে কোনো পদার্থের পরমাণু ভারী, কোনোটি অপেক্ষাকৃত হালকা। ডাল্টন-কল্পিত দানা-দানা এটমগুলি পদার্থ অনুযায়ী বড় সাইজের বা ছোট সাইজের এবং তাদের মধ্যে ওজনের তারতম্য আছে। কিন্তু একটা এটম এতোই ক্ষুদ্র যে, প্রত্যক্ষভাবে এই তারতম্য নিরূপণের কোনো উপায় সে-যুগের বিজ্ঞানিগণ উদ্ভাবন করতে পারেননি। সুতরাং কিছুটা পরোক্ষভাবে, কিছুটা অনুমান সহায়ে তাঁদের অগ্রসর হতে হয়েছিল এ-বিষয়ে।

এই অবস্থার break through বা অর্গলমোচন ঘটিয়েছিলেন F W Aston নামক জনৈক বিজ্ঞানী আনুমানিক ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে। তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের নাম Mass Spectrograph. যন্ত্রটির সাহায্যে বিভিন্ন পরমাণুর ভর (mass) প্রায় নিখুঁতভাবে নিরূপিত হয়। ঐ যন্ত্রের নির্মাণ-কৌশল তেমন জটিল না হলেও তৎকালে যথেষ্ট অভিনব ছিল। তাই পরমাণু-রহস্য উদ্ঘাটনে এস্টন সাহেবের নাম ও অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে।

উক্ত যন্ত্র সহায়ে শুধু যে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু-ভরে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছিল তা নয়, পরন্তু একই পদার্থের রকমারি ওজনের (ভরের) পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছিল সন্দেহাতীত ভাবে। শেষোক্ত আবিষ্কারের গুরুত্ব ও চমৎকারিত্ব কেন ও কোথায় তা জানা প্রয়োজন। কেননা, পরমাণুর পিণ্ড (nucleus) সম্বন্ধে ধারণাগত পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল এর ফলে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক হাই-ড্রোজেনের কথা। এটির এটম-নম্বর হচ্ছে ১, অর্থাৎ তার পরমাণুপিণ্ডে আছে ১টি প্রোটন এবং সেই কারণে পিণ্ডের বাইরে আবর্তনরত ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যাও ১। একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ধরা হয় ১, যেহেতু ইলেক্‌ট্রনটির ভর নগণ্য, যা-কিছু ভর তা ঐ প্রোটনটির জন্য। এখন Mass spectrograph যন্ত্রের সাহায্যে হাইড্রোজেন গ্যাস পরীক্ষা করে দেখা যায়, হাইড্রোজেন পরমাণুর অধি-কাংশের ওজন (ভর) ১ হলেও ছিটেফোঁটা কোনো কোনোটির ভর ২, এমনকি সংখ্যায় অত্যল্প হলেও কোনো কোনো হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর ৩। এ যেন এক রাশি মিহি বালির মধ্যে মিশে আছে দু-পাঁচ দানা ভারী কাঁকর। চালুনির সাহায্যে বালুকারাশি থেকে যেমন ভারী কাঁকর পৃথক্ করা যায় তেমনি mass

spectrograph যন্ত্রের সাহায্যে ভারী হাইড্রোজেন পরমাণুর পৃথক্ অস্তিত্ব ধরা পড়ে। একই পদার্থ, অথচ তার পরমাণু-ভরে তফাত এরকম হলে বিজ্ঞানের ভাষায় সেগুলিকে বলা হয় 'আইসোটোপ'।

হাইড্রোজেনের তিনটি isotope আছে, তাদের পরমাণু-ভর যথাক্রমে ১, ২, ৩। প্রথমটি হচ্ছে সাধারণ হাইড্রোজেন যার সঙ্গে আমরা পরিচিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি Deuterium ও Tritium নামে চিহ্নিত (প্রথমটির নাম তদনুযায়ী Protium)। ১-ভর বিশিষ্ট অর্থাৎ সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুই সংখ্যায় বেশী, প্রায় ৯৯·৯%। বাকি পরমাণু সংখ্যায় ০·০২% অথবা তার চেয়েও কম।

কার্বন-পরমাণুর ভর ১২, তার একটি আইসোটোপ আছে যার ভর হচ্ছে ১৩। শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ কার্বন-পরমাণু ১২-ভর-বিশিষ্ট, সুতরাং এক্ষেত্রেও অন্য আইসোটোপ ছিটেফোঁটা। অক্সিজেনের বেলাতেও আইসোটোপের অস্তিত্ব আছে। কোনোটির পরমাণু-ভর ১৬ (সংখ্যায় এরাই বেশী), কোনোটির ১৭ বা ১৮।

সংখ্যায় স্বল্প হলেও পদার্থের পরমাণুমধ্যে এরূপ ভেজাল অর্থাৎ একই পদার্থে রকমারি ভর-বিশিষ্ট পরমাণুর অস্তিত্ব বিজ্ঞানিগণকে যথেষ্ট চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। তখনো নিউট্রন নামক মৌলিক কণিকা আবিষ্কৃত হয়নি। পরমাণুপিণ্ডে শুধু প্রোটন থাকে, এই তাঁদের নিশ্চিত অনুমান ছিল। তাঁরা ভাবতেন, একই পদার্থের পরমাণুপিণ্ডে একই সংখ্যক প্রোটন থাকতে হবে (কেননা সেই সংখ্যা দিয়েই তো পদার্থের পরিচয়)। একটা পরমাণুর ভর ওই প্রোটনসমূহের ভরের সমষ্টি। অতএব পদার্থের পরমাণু-ভর সুনির্দিষ্ট, তার কোনো হেরফের হওয়া উচিত নয়।

তাছাড়া, পরমাণু-ভর তো একটা পূর্ণ সংখ্যায় সূচিত হওয়া উচিত, যদি প্রোটনের ভরকে ১ ধরা হয়। কেননা, প্রোটন সংখ্যাকে ১ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া উচিত পরমাণু-ভরের পরিমাণ। কিন্তু পরীক্ষণ-লব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় অনেক ক্ষেত্রে তা হয় না।

তাহলে কি বুঝতে হবে, পরমাণুপিণ্ডে প্রোটন ছাড়া অন্য কিছু কণিকাও থাকতে পারে যার ভর পরমাণু-ভরের ইতরবিশেষ ঘটায়? এ প্রশ্ন তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের মনে জেগেছিল, কিন্তু তার সদুত্তর মেলে অনেক পরে। J chadwik নামক জনৈক ইংরেজ বিজ্ঞানী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন নিউট্রন। এই মৌলিক কণিকায় কোনো বিদ্যুৎ (charge) নেই, আছে শুধু ভর (mass)। একটা নিউট্রনের ভর একটা প্রোটনের ভরের প্রায় সমান (অতি সামান্য বেশী)। সুতরাং কোনো পদার্থের পরমাণুপিণ্ডে নিউট্রনের উপস্থিতি পরমাণুটির ভরকে

বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু পিণ্ডস্থিত প-বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়ায় না। সেই কারণে এটম-নম্বর বা আবর্তনরত ইলেকট্রন-সংখ্যারও কোনো হেরফের ঘটায় না।

নিউট্রন আবিষ্কারের ফলে আইসোটোপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা মেলে। কোনো পদার্থ ও তার আইসোটোপের মধ্যে পার্থক্য নিরূপিত হয় তাদের পরমাণুপিণ্ডে নিউট্রন-সংখ্যার পার্থক্য দিয়ে। সুতরাং পরমাণুপিণ্ডে নিউট্রন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি পরমাণু বিজ্ঞানে সূচিত করে এক নূতন অধ্যায়। শুধু প্রোটন নয়, নিউট্রন ও প্রোটন মিলে পরমাণুপিণ্ড যেন এক গৃহ-বন্ধনে আবদ্ধ, আর আবর্তনশীল ইলেকট্রনগুলি যেন সেই গৃহকে আবেষ্টন করে অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত। সংক্ষেপে এই হচ্ছে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ পরিচয়।

কয়েকটি পদার্থের পরমাণু-অঙ্ক (atomic number), নাম, পরমাণু-ভর (atomic weight), ও পরমাণুমধ্যে বিভিন্ন মৌলিক কণিকার সংখ্যা তালিকা-বদ্ধ আকারে দেওয়া হোল পাঠকবর্গের অবগতির জন্য।

তালিকা

পরমাণু			:	কণিকা সংখ্যা		
নম্বর	নাম	ভর		নিউট্রন	প্রোটন	ইলেক্ট্রন
১	হাইড্রোজেন	১·০০৮	...	০	১	১
৬	কার্বন	১২·০১১	...	৬	৬	৬
৭	নাইট্রোজেন	১৪·০০৮	...	৭	৭	৭
৮	অক্সিজেন	১৬·০০০	...	৮	৮	৮
২৬	লোহা	৫৫·৮৫০	...	২৯	২৬	২৬
৪৭	রূপা	১০৭·৮৮০	...	৬০	৪৭	৪৭
৭৯	সোনা	১৯৭·০০০	...	১১৮	৭৯	৭৯
৮০	পারদ	২০০·৬১০	...	১২০	৮০	৮০
৯২	ইউরেনিয়ম	২৩৮·০৭০	...	১৪৬	৯২	৯২

দ্রষ্টব্য : (১) এটম-নম্বর = প্রোটন সংখ্যা = ইলেক্ট্রন সংখ্যা

(২) মূল পদার্থ ও তার আইসোটোপের অনুপাত অনুযায়ী হিসাব করা হয় ভরের গড়।

৯

শক্তি

—নানাবিধ রূপ ও রূপান্তর—

শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা ইত্যাদি শব্দ প্রায় একই অর্থে সাধারণভাবে প্রযুক্ত হলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে energy নামক ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয় 'শক্তি'। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে ও ধর্মগ্রন্থে ঐ শব্দটির connotation বা অর্থ-জ্ঞাপকতা একটু ভিন্নতর। ক্রিয়মানা প্রকৃতির অন্যতম রূপ হচ্ছে শক্তি*। যান্ত্রিক কর্মক্ষমতা বা বিজ্ঞান-প্রতিপাদ্য এনার্জির তুলনায় ভারতীয় ধারণাপুষ্ট শক্তি শব্দটি অধিকতর গাম্ভীর্যপূর্ণ ও শক্তিশালী। প্রাণশক্তি জীব-প্রাণের আধার। মানসিক শক্তি মনন-প্রক্রিয়ার উৎসস্বরূপ। সর্বোপরি চিৎ-শক্তি জড়-শক্তির তুলনায় অনেক অনেক বেশী গুণসম্পন্ন।

ঐহিক জ্ঞান বা সায়েন্সের ক্ষেত্রে এনার্জি বা শক্তির অর্থ সুনির্দিষ্ট। নিউটন সূত্র অনুযায়ী কোনো বস্তুখণ্ডের উপর বলপ্রয়োগ করলে বস্তুটির স্থানান্তর ঘটে (অথবা ঘটবার উপক্রম হয়)। এই স্থানান্তরকে বলা হয় displacement. যেহেতু প্রযুক্ত বল ও তজ্জনিত স্থানান্তর উভয়েই পরিমাপযোগ্য। সেজন্য এ দুয়ের গুণফলকে ধরা হয় ঐ বল কর্তৃক সাধিত কর্মের পরিমাণ।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক একটা বস্তুখণ্ডের কথা, যেটি কেবলমাত্র মাধ্যাকর্ষণের ফলে উপর থেকে নীচের দিকে (vertically downward) পড়ছে। এখানে বলের পরিমাণ হচ্ছে mg (নিউটন সূত্র অনুযায়ী)।** অতএব বস্তুটির পতন-পরিমাণ (বলের অভিমুখে অতিক্রান্ত দূরত্ব) যদি হয় h, তাহলে বুঝতে হবে বল-কর্তৃক কর্ম-সম্পাদনের পরিমাণ হচ্ছে $mg \times h = mgh$. এই কাজটুকু করার ফলে কি হয়? শক্তির কি কোনো রূপান্তর ঘটে? ঘটে নিশ্চয়, কেননা বস্তুখণ্ডটি যদি পড়তে শুরু করার আগে স্থির-অবস্থায় থেকে থাকে তাহলে তখন তার কোনো গতিশক্তি ছিল না। পড়ন্ত অবস্থায় গতিসম্পন্ন হওয়ার ফলে সেটি গতিশক্তি অর্জন করেছে। হিসাব করলে দেখা যায় তার স্থিতিশক্তি যতটুকু কমেছে, ততটুকুই

---

* যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫/৩২)—এই মন্ত্রে শক্তির সর্ব-ব্যাপ্তিত্ব প্রকটিত। প্রকৃতির অপর নাম শক্তি। শক্তিবাদ, শক্তিপূজা ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত।

** m = mass বা ভর; g = acceleration due to gravity বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ।

বেড়েছে তার গতিশক্তি (অঙ্কের ভাষায় $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$)। বিজ্ঞানের ভাষায় স্থিতিশক্তিকে বলা হয় potential energy এবং গতিশক্তিকে kinetic energy. সুতরাং বুঝতে হবে উপরে স্থির-অবস্থায় বস্তুটির potential energy ক্ষয়িত হতে হতে বৃদ্ধি করে তার kinetic energy। এও প্রমাণ করা যায় যে একটা বস্তুখণ্ড যখন উপরের দিকে (vertically upward) উৎক্ষিপ্ত হয় তখন যতোই উপরে উঠতে থাকে ততোই তার বেগ কমে আসে অর্থাৎ kinetic energy ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।*

শক্তির রূপান্তরের এটি এক সহজ অথচ মৌলিক দৃষ্টান্ত। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, এরূপ অঙ্কপাতের ভিত্তি হচ্ছে (১) নিউটনের সূত্রাবলী (২) একটি মৌলিক অনুমান, বস্তু গতিসম্পন্ন হলেও তার ভরের (mass-এর) কোনো পরিবর্তন ঘটে না। (৩) শক্তির একক ও কাজের (work-এর) একক অভিন্ন।

অনুমানসমূহের ক্রমবিকাশ জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ নানাবিধ অনুমান সহায়ে দৃশ্যমান জীবজগৎকে ধারণাবদ্ধ করতে চেয়েছে অথবা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে বেষ্টিত হয়েছে। সহজ বুদ্ধিজাত সেইসব অনুমান উত্তরকালে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কখনো পরিপুষ্ট হয়েছে, কখনো বা পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই জিজ্ঞাসা স্তিমিত হয়নি। সম্ভবতঃ এটাই বিজ্ঞানের প্রকৃত ইতিহাস।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক তাপশক্তি ও আলোকশক্তি সম্বন্ধে ধারণার ক্রমবিকাশের কথা। জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পরিচিত হয় এ দুটির সাথে। প্রথম চোখ-মেলে যার সাহায্যে শিশু ধরণীকে অবলোকন করে তার নাম আলোক। প্রথম হৃৎ-স্পন্দনকে স্বস্থ রাখার জন্য যে-শক্তির প্রয়োজন হয় তা মেটায় উত্তাপ। তাই তাপ ও আলোক প্রাণী মাত্রের জীবনবন্ধু। তথাপি এ দুটি যে প্রকৃতিদত্ত শক্তি-বিশেষ, এরূপ জ্ঞান সঞ্জাত হতে সময় লাগে। তাতে দোষের কি আছে? জীবনধারণের জন্য প্রতি মুহূর্তে অবশ্য-প্রয়োজন যতো-কিছু আছে, তার কয়েকটির সম্বন্ধে আমারা সচেতন থাকি বা জানতে তৎপর হই?

তাপ ও আলোককে ঠিকমত চিনতে ও জানতে বিজ্ঞানীদেরও সময় লেগেছিল যথেষ্ট। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত

---

* সহজ কথায় নিয়মটি হচ্ছে, (১) অর্জিত গতিশক্তি = ক্ষয়িত স্থিতিশক্তি অথবা লব্ধ স্থিতিশক্তি = ব্যয়িত গতিশক্তি।

(২) স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির যোগফলের কোনো হেরফের হয় না এরূপ ক্ষেত্রে।

ছিল যে, তাপ হচ্ছে একটা substance বা পদার্থ। উত্তপ্ত বস্তু থেকে নির্গত হয়ে সেই পদার্থ অন্য বস্তুতে প্রবেশ করে। এই মতবাদ caloric theory নামে খ্যাত। ক্যালোরি নামক পদার্থটি হচ্ছে একটা অদৃশ্য (invisible) ও ভরহীন (weightless) fluid (আধা-তরল) বস্তু যা সকল বস্তুখণ্ডে কমবেশী অন্তর্নিহিত থাকে। অগ্নি-সংযোগের ফলে সেই ক্যালোরি এক বস্তু থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্য বস্তুতে সংক্রামিত হয় এবং শেষোক্ত বস্তুটিকে উত্তপ্ত করে তোলে, এই ছিল সে-যুগের বিজ্ঞানীদের ধারণা। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, এহেন ক্যালোরি-ভিত্তিক তাপতত্ত্ব যেমন কষ্ট-কল্পিত তেমনি অস্পষ্ট। কিন্তু সে-যুগে সব কিছুর মধ্যে এক-একটা invisible weightless fluid বা অদৃশ্য ও ভরহীন তরল-জাতীয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করাটা যেন বৈজ্ঞানিক চিন্তার ফ্যাসানে পরিণত হয়েছিল। ফলে কি তাপে, কি বিদ্যুতে, এমনকি শূন্যস্থানে এক-এক রকম fluid-এর বিদ্যমানতা যেন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অঙ্গস্বরূপ হয়ে উঠেছিল।

তাপশক্তি সম্পর্কে এরূপ ক্যালোরি-ধারণার বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত হানেন কাউন্ট রামফোর্ড নামক জনৈক বিজ্ঞানী আনুমানিক ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে। কামান ও বন্দুকের নল তৈরির এক কারখানায় পরিদর্শকের কাজ করার সময় তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, একটা ভোঁতা আগর যন্ত্র (blunt boring drill) দিয়ে কোনো ধাতব রড ছেঁদা করার সময় অফুরন্ত তাপের উৎপত্তি হয় এবং উৎপন্ন তাপের পরিমাণ কতোটা ধাতু ছিন্নভিন্ন হোল তার উপর আদৌ নির্ভর করে না। ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য হলেও বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ। আগর যন্ত্রের ভোঁতা মুখের সঙ্গে ধাতব নলের সংঘর্ষণ হওয়ায় রড ও যন্ত্র দুই-ই বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রচলিত ক্যালোরিক থিয়োরী অনুযায়ী এই তাপকে ক্যালোরি রূপে আসতে হবে কোনো-না-কোনো বস্তু হতে। সুতরাং ঘর্ষণের ফলে রডের যে ছিল্‌কা বা গুঁড়ো উৎপন্ন হয় তা থেকে বেরিয়ে এসে ঐ ক্যালোরিকে রডে ও ড্রিলযন্ত্রে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ক'রে রামফোর্ড সাহেব দেখেছিলেন, অত্যল্প পরিমাণ ছিল্‌কে বা গুঁড়ো নির্গত হলেও প্রভূত পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় রডে ও আগর যন্ত্রে। তাপ যদি কোনো substance বা পদার্থ হয় তাহলে সেটি এমন অফুরন্ত কেন হবে? এ-সংশয় উদিত হয়েছিল তাঁর মনে। তবে কি উৎপন্ন তাপ আশ-পাশের বাতাস থেকে আসছে? সন্দেহমুক্ত হবার জন্য তিনি পরীক্ষাটি নিষ্পন্ন করেন ধাতব রডটিকে চারিপাশে জলবেষ্টিত রেখে। কিন্তু দেখা গেল ঘর্ষণজনিত তাপ ঐ জলকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করে তুলছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আশপাশ থেকে

ক্যালোরি নামক পদার্থের আগমন নিতান্তই অবিশ্বাস্য। বারংবার পরীক্ষা অন্তে সন্দেহমুক্ত হয়ে তিনি অনুমান করেন,

(১) তাপ কোনো ভৌতিক পদার্থ বা material substance নয়

(২) তাপ হচ্ছে একপ্রকারের গতিশীলতা (a form of motion)।

কার গতি, কেমন গতিশীলতা সে-সম্বন্ধে অবশ্য তৎকালীন ধারণা অস্পষ্ট ছিল। লর্ড বেকন প্রমুখ কোনো কোনো বিজ্ঞানী যদিও বলে আসছিলেন যে, তাপ হচ্ছে বিশেষ একরকমের গতি যার উপর নিউটনসূত্রাদি প্রযোজ্য তথাপি প্রত্যক্ষ কার্য-কারণ সম্পর্ক নিরূপণের অভাবে তাদের সেই তত্ত্ব তেমন সমাদৃত হয়নি।

ক্যালোরিক থিয়োরীর উপর চূড়ান্ত আঘাত আসে আনুমানিক ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে। James Prescott Joule (১৮১৮-১৮৮৯) নামক জনৈক বিজ্ঞানী এক বিখ্যাত পরীক্ষা সহায়ে প্রমাণ করেন যে, তাপ হচ্ছে একপ্রকার শক্তি এবং যান্ত্রিক শক্তিকে (পেশীশক্তি যার অন্যতম) তাপে পরিণত করা যায়। যন্ত্রশক্তি ও তাপশক্তির তুল্য-মূল্যতা তিনি প্রমাণ করেন শুধু কথার কথায় নয়, একেবারে হাতেকলমে। এক ক্যালোরি তাপ উৎপাদন করতে কতোটা যন্ত্রশক্তি ব্যয়িত হয় তাও তিনি নির্ণয় করেন নিখুঁতভাবে। তদবধি শক্তির রূপান্তর বিষয়ে তাঁর সূত্রটি Joule's Law নামে খ্যাত হয়ে আছে।

বিজ্ঞানের ভাষায় সূত্রটি এইরূপ : $W = J.H$ (W = work done, H = heat developed, J = constant = $4{\cdot}186 \times 10^7$ ergs)।

সূত্রটির মর্মার্থ হচ্ছে যে, ব্যয়িত যন্ত্রশক্তির পরিমাণ ও তজ্জনিত তাপশক্তির পরিমাণ সমানুপাত সম্পর্কযুক্ত। এক ক্যালোরি পরিমিত তাপশক্তি উৎপন্ন করতে যে-পরিমাণ যন্ত্রশক্তি (mechanical energy) ক্ষয়িত হয় তা সুনির্দিষ্ট ($৪{\cdot}১৮৬ \times ১০^৭$ আর্গ)।

এক ক্যালোরি বলতে কি বোঝায়? ১ গ্রাম জলের তাপমান ১ ডিগ্রী (সেলসিয়াস) বাড়াতে যতটুকু তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাকে ধরা হয় ১ ক্যালোরি। '১ ডিগ্রী' কথাটির তাৎপর্য কি? এর সঠিক উত্তর পেতে হলে ভাবতে হবে থার্মোমিটারের কথা। কাজ-চলা বুদ্ধি দিয়ে টেম্পারেচার, থার্মোমিটার, ডিগ্রী ইত্যাদি আমরা বুঝে থাকি। কিন্তু এদের প্রত্যেকটির বৈজ্ঞানিক অর্থ ও তাৎপর্য আছে। সেগুলি জানার নাম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন।

ধরুন, রোগীর জ্বর বেড়েছে, থার্মোমিটার দিয়ে দেখলেন জ্বর ১০৪ ডিগ্রী

উঠেছে। কাজ-চলার পক্ষে এটুকু বিবৃতি যথেষ্ট। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বুঝতে হবে, যেমন-তেমন থার্মোমিটারের ব্যবহার এক্ষেত্রে চলবে না। আপনাকে নিতে হবে এমন একটি থার্মোমিটার যার ভিতরের পারদ-সূত্রটি রোগীর গরমদেহে সংলগ্ন হবার পর যতোটা উঠবে ততটাই থেকে যাবে রোগীর দেহ থেকে থার্মোমিটারটি সরিয়ে আনার পরেও। বিজ্ঞানের ভাষায় এরূপ তাপমান যন্ত্রকে বলা হয় maximum thermometer ; এদের নির্মাণকৌশল এমনি যে, সর্বোচ্চ তাপমান জানানোর জন্য ভিতরের পারদ-সূত্রটি তপ্ত বস্তুর সংস্পর্শে উঠবে, এবং উঠে স্থির হয়ে থাকবে ; ঝাঁকুনি না দিলে নামবে না। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহৃত থার্মোমিটারটি কিন্তু সেলসিয়াস (বা সেন্টিগ্রেড) স্কেলের নয়, এটি ফারেনহাইট স্কেলের, থার্মোমিটারের এই দুই স্কেলের মধ্যে পার্থক্য আছে। রোগীদেহে যখন জর 104°F তখন বুঝতে হবে সেন্টিগ্রেড স্কেল অনুযায়ী দেহের তাপমান হচ্ছে 40°C*। থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র ব্যাপারে আরো কয়েকটি সূক্ষ্ম অনুমান আছে যেগুলি পৃথকভাবে আলোচ্য।

তাপ একপ্রকার শক্তি এবং যান্ত্রিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, এ দুটি অনুমানকে সত্য বলে গ্রহণ করলে কয়েকটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন এসে পড়ে।

(১) কোনো বস্তুমধ্যে তাপশক্তি সঞ্চারিত হলে বস্তুটির মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটে এবং সেই পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ কিরূপ হতে পারে ?

(২) পদার্থমধ্যে যে-সকল অণু-পরমাণু থাকে সেগুলির উপর তাপশক্তির কোনো প্রভাব আছে কি ?

(৩) তাপের মাত্রা (তাপমান) কিভাবে নিরূপিত হওয়া উচিত ? এটির কি কোনো absolute value বা আত্যন্তিক মান আছে ? নাকি এটি তাপমানযন্ত্রে ব্যবহৃত পদার্থের গুণধর্মের উপর নির্ভরশীল ?

(৪) তাপশক্তিকে কি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় ? এরূপ রূপান্তরকরণের কি কোনো প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা আছে ?

কয়েকটি পরিচিত ঘটনা বা উদাহরণ সহায়ে প্রশ্নগুলির উত্তর সংগ্রহ করতে পারা যায়। যেমন ধরুন, উনুনে আগুন জলছে, তার উপর পাত্রমধ্যে জল গরম হচ্ছে, ফুটন্ত জল থেকে বাষ্প নির্গত হচ্ছে। এ দৃশ্য সকলের পরিচিত। অগ্নি কিনা

---

* এক স্কেল থেকে অন্য স্কেলে পরিবর্তনের ফরমুলাটি এইরূপ $\frac{C}{5}=\frac{F-32}{9}$. C=Centigrade reading, F=Farenheit reading এই ফরমুলায় F=104 হলে C=40

তাপের উৎস। কাঠ, কয়লা, কেরোসিন, গ্যাস ইত্যাদির নাম fuel বা জ্বালানি। সেই দাহ্যবস্তুর দহনের ফলে তাপশক্তি কখনো পরিবাহিত কখনো সঞ্চালিত হয়ে, কখনো বা বিকিরণরূপে অন্য বস্তুতে সঞ্চারিত হয়। ভৌতিক বা রাসায়নিক অথবা উভয়বিধ পরিবর্তন ঘটে এর ফলে। সেই পরিবর্তনকে কখনো চোখে দেখে, কখনো স্পর্শ করে, কখনো বা যন্ত্রসাহায্যে বিশেষভাবে অনুভব করতে পারা যায়। তাপশক্তি প্রয়োগের ফলে জড়বস্তুর অবস্থান্তর (কঠিন, তরল, বায়ব) আকার-আয়তনের বিকৃতি ইত্যাদি সহজেই চোখে পড়ে। স্থূল পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত সহজে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এছাড়া অনেক সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে যেগুলি প্রত্যক্ষ করার জন্য বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের প্রয়োজন হয়।

তাপের ক্যালোরি-থিয়োরী পরিত্যক্ত হবার পর বিজ্ঞানিগণ ভাবতে থাকেন পদার্থের kinetic theory বা গতিতত্ত্বের সঙ্গে তাপশক্তির কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। তাঁরা অনুমান করেন, অণু-পরমাণুর চঞ্চলতা ও স্পন্দনশীলতা তাপশক্তি কর্তৃক প্রভাবিত হতে পারে। কিভাবে তার বহিঃপ্রকাশ সম্ভবপর সেটাই বিবেচ্য। গ্যাসের বেলায় দেখা যায়, তাপমান বাড়লে তার চাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, গ্যাসের মধ্যে অণুসমূহের ছোটাছুটির মাত্রা বেড়ে যায়। সুতরাং গতিশক্তির আধিক্য ঘটে এবং সেই কারণে তাপই শক্তি ও সেই শক্তি পদার্থমধ্যে অন্তর্নিহিত থাকতে পারে, এ অনুমান বাস্তব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ধরা যেতে পারে।

টেম্পারেচার বা তাপমানের সঙ্গে তাপশক্তির কোনো সম্পর্ক আছে কি? কোনো বস্তুকে উত্তপ্ত করলে তার তাপমান বেড়ে যায়, এটি দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু তাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে অথচ তার ফলে তাপমান বাড়ছে না, এমন ঘটনাও তো দেখা যায়। গলন্ত বরফ (melting ice)-এর উদাহরণ। সাধারণ অবস্থায় বরফ গলে সেলসিয়াস স্কেলের শূন্যডিগ্রিতে ($0°C$)। একটা পাত্রে কিছু বরফ রেখে তাতে তাপপ্রয়োগ করলে দেখা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সব বরফটুকু গলে যাচ্ছে ততক্ষণ তার তাপমান স্থির হয়ে শূন্যডিগ্রিতেই থাকছে। বিজ্ঞানিগণ বলেন, অবস্থান্তর ঘটানোর জন্য তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। সুতরাং কঠিন বরফ তরল জলে পরিণত হতে যেটুকু তাপশক্তি লাগে তার জোগান দিতে হয়। তাপ-প্রয়োগ তখন অবস্থান্তর ঘটাতে ব্যস্ত, তাপমান বাড়ানোর জন্য কোনো অবসর নেই। অণুসমূহের চঞ্চলতা কঠিন অবস্থায় একরকম, তরল অবস্থায় অন্যরূপ। সেই পরিবর্তন সংসাধনের জন্য তাপশক্তি ব্যয়িত হয়। তখন তাপমান বৃদ্ধির কোনো কারণ থাকে না। জল যখন জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় তখন অনুরূপভাবে অবস্থান্তর

ঘটানোর জন্য তাপশক্তি ব্যয়িত হতে থাকে। সে-সময় তাপমানের কোনো বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না।

তাপ ও শক্তির অভিন্নতা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় বিজ্ঞানিগণকে অনেক গভীরতর বিষয়ের অনুশীলনে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। তার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা পেয়েছি বিজ্ঞানের একটি শাখা যার নাম **thermodynamics.** উক্ত বিভাগীয় সূত্রগুলি **Laws of thermodynamics** নামে পরিচিত। প্রথম সূত্রটি অপেক্ষাকৃত সহজ-বোধ্য এবং শক্তি-সংরক্ষণ নীতির নামান্তর। দ্বিতীয় সূত্রটি তাপশক্তিকে যন্ত্র-শক্তিতে রূপান্তরকরণের সম্ভাব্যতা বিষয়ক।

যান্ত্রিক শক্তিকে তাপশক্তিতে পরিণত করা কঠিন কাজ নয়, সামান্য পেশীশক্তি ব্যয় করে দুটি বস্তুখণ্ডকে ঘর্ষণ করলে সহজেই তাপ উৎপন্ন হয়। এ-ঘটনা সকলের পরিচিত। কিন্তু উল্টো ঘটনা অর্থাৎ তাপশক্তি খরচ ক'রে তা থেকে যন্ত্রশক্তি উৎপাদন করা তেমন সহজসাধ্য নয়। এর জন্য প্রয়োজন হয় একটা সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা যার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে 'এঞ্জিন'। এরূপ এঞ্জিনের মূলনীতি হচ্ছে, (১) উচ্চতাপমানযুক্ত কোনো উৎস থেকে তাপশক্তি আহরণ করা (২) সেই আহৃত তাপের কিছু অংশ অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমানযুক্ত কোনো আধারে ছেড়ে দেওয়া (৩) ১নং ও ২নং ঘটনার মধ্যবর্তী কালে (অর্থাৎ তাপশক্তির উক্ত আদান-প্রদানের অন্তর্বর্তী প্রক্রিয়ায়) তাপশক্তির কিয়দংশকে কাজে লাগানো। এই ব্যবস্থা যেন একটি **cycle** বা কর্মচক্র যার বিনিয়োগে আমরা পাই তাপশক্তির কর্মশক্তিতে রূপান্তর। Second Law of Thermodynamics বা তাপ-গতি-তত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্রটি এই রূপান্তরের সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত। সূত্রটির নানা ব্যাখ্যা আছে। সেগুলির মধ্যে কেলভিন সাহেবের (Lord Kelvin, 1824—1907) বিবৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার মর্মার্থ এইরূপ,

'তাপশক্তিকে কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে একটা সীমবদ্ধতা আছে। কোনো স্বয়ং-নির্ভর প্রক্রিয়ায় নিম্ন তাপমানযুক্ত বস্তু থেকে উচ্চ তাপমানের বস্তুতে তাপশক্তি স্থানান্তরিত করা যায় না। বহিরাগত শক্তি ব্যতিরেকে কোনো এঞ্জিন নিজে থেকে অফুরন্তভাবে কর্মশক্তির যোগান দিতে পারে না।'

শেষোক্ত সীমাবদ্ধতার কথা স্পষ্টভাবে বলার প্রয়োজন ছিল সে-যুগে। কেননা, সব ধাতুকে সোনায় পরিণত করার এবং বিনা শক্তিব্যয়ে একটা অফুরন্ত কর্মশক্তির উৎস উদ্ভাবনের স্বপ্ন দেখতেন সে-যুগের বৈজ্ঞানিকবৃন্দ। সুতরাং এরূপ অবাস্তব চিন্তার অবসান ঘটানোর জন্য কেলভিন সাহেবের মৌলিক চিন্তাপ্রসূত বিবৃতিকে

নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী বলা চলে। তাঁর আরেকটি অবদান এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাপমান (temperature) নির্ণয়ের ব্যাপারে একটি নূতন স্কেল বা পরিমাপের উদ্ভাবক তিনি। তার নাম অনুযায়ী সেটি Kelvin Scale নামে পরিচিত। অপর নাম হচ্ছে absolute scale বা thermodynamic scale. কেন এরূপ নামকরণ হয়েছে? তদুত্তরে বলা যায়, থার্মোমিটারে ব্যবহৃত পদার্থের জড়ধর্মের উপর এই পরিমাপ আদৌ নির্ভরশীল নয়, তাই এটি absolute scale আর যেহেতু এই স্কেলে মাপা তাপমানের পরিমাণ আঙ্কিক নিয়মে তাপ-গতিতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেইহেতু এটির নাম thermodynamic scale.*

পদার্থ-নিরপেক্ষ তাপমানের ধারণাটি তাপশক্তির আত্যন্তিক পরিচয় বহন করে। তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধারণা সমাদৃত হয়ে আসছে। আর একটি মৌলিক ধারণা পূর্বোক্ত thermodynamics বা তাপ-গতি-বিজ্ঞান থেকে উপজাত হয়েছে, যার নাম entropy। এণ্ট্রাপি হচ্ছে তাপ-গতি সম্পর্কিত অবস্থার পরিচায়ক। কোনো উত্তপ্ত বস্তু থেকে যদি তার T তাপমানযুক্ত অবস্থায় Q পরিমাণ তাপশক্তি আহৃত হয় তাহলে বুঝতে হবে বস্তুটির এণ্ট্রাপির পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই পরিবর্তনের পরিমাণ হচ্ছে $\frac{Q}{T}$ (অঙ্কের ভাষায় $ds=\frac{dq}{T}$; ds=এণ্ট্রাপির পরিবর্তন dq=তাপশক্তির নির্গমন, T^0K তাপমানে)।

এরূপ আঙ্কিক ধারণার প্রবর্তন কেন করতে হয়েছিল তার উত্তরে বলা যায়, প্রাকৃতিক ঘটনার পরিমাপমূলক বিবরণ প্রকাশে অনেক ক্ষেত্রে আঙ্কিক ধারণা বড়ই সহায়ক। তাতে বিষয়টির স্পষ্টতর চিত্র ফুটে ওঠে এবং গণনারও সুবিধা হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক তাপশক্তিকে কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত করার কাজে ব্যবহৃত একটি এঞ্জিনের কথা। এঞ্জিনটি যদি আদর্শ এঞ্জিন হয় অর্থাৎ যদি তাতে শক্তির কোনো অপব্যয় না ঘটে এবং প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে reversible (প্রত্যাবর্তনযোগ্য

---

* তাপ-গতি বিজ্ঞান অনুযায়ী

mean molecular kinetic energy $=\frac{3}{2}$ KT

T=absolute temperature

K=Constant $=1{\cdot}33\times10^{-23}$ Joule per Kelvin

1 joule $=10^7$ ergs

মোটামুটি হিসাবে $0°C=273K$.

Absolute scale অনুযায়ী তাপমানের একক হচ্ছে 1 Kelvin (K)

হয় তাহলে দেখা যাবে, এই ব্যবস্থায় মোট এণ্ট্রোপির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে। অন্যথা তাপশক্তির আদান-প্রদান ব্যাপারে এণ্ট্রোপি বাড়তে থাকবে। সচরাচর যে-সব তাপ-বিনিময়ের ঘটনা ঘটে, ঘর্ষণের ফলে অথবা উষ্ণ-শীতল বস্তুদ্বয়ের মিশ্রণের ফলে, তাতে মোট এণ্ট্রোপির পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেহেতু বিশ্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইভাবে এণ্ট্রোপির বৃদ্ধি ঘটে, সেজন্য বিজ্ঞানিগণ অনুমান করেন সমগ্র বিশ্বে এণ্ট্রোপি বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় পৌঁছাবে যখন প্রাপ্তব্য তাপশক্তির পরিমাণ নিঃশেষ হয়ে যাবে। **Heat death of the universe** বা নিখিল বিশ্বের তাপ-মৃত্যুর কথা এই কারণে প্রচলিত। এজন্য অবশ্য আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। কেননা যদি আদৌ সে-অবস্থার উদ্ভব হয় তাহলে তা ঘটবে বহু লক্ষ বৎসরান্তে। তাছাড়া এই বিশ্বকে একটা **closed system** বা স্বয়ং-নিরুদ্ধ বস্তুপিণ্ডরূপে কল্পনা করাটা যুক্তিযুক্ত কিনা সে-বিষয়ে মতভেদ আছে। মহাবিশ্বের কতো ঘটনাই তো অজানা! একদিকে প্রলয়, অন্যদিকে নব জন্ম, নূতন সূর্যের (প্রতীক অর্থে) সৃষ্টি, তাও তো হতে পারে!

তাপশক্তির উৎস সন্ধানে শুধু এ-যুগের বৈজ্ঞানিকবৃন্দ নয়, প্রাচীন যুগের সত্য-দ্রষ্টাগণও সূর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। সৌরবিশ্বের প্রাণকেন্দ্ররূপে সূর্যকে চিন্তন করেছেন তাঁরা। বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষায়, সূর্য হতে প্রাপ্ত **radiant energy** বা বিকিরণ-শক্তি নানাবিধ উপায়ে জাগতিক বস্তুপুঞ্জকে শক্তি-সম্পন্ন ও সংরক্ষিত করে রাখে। বৈদিক যুগের ঋষিগণ বলেছেন, 'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ' (ঋগ্বেদ ১/১৫), স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা হচ্ছে সূর্য। আত্মা শব্দটি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়বিধ অর্থেই প্রযোজ্য। যে-সত্তা যার উপর আত্যন্তিকভাবে নির্ভরশীল তাকে ঐ সত্তার আত্মা নিশ্চয় বলা যেতে পারে। শুধু কর্মশক্তি কেন, ধীশক্তিরও উৎসরূপে কল্পিত হয়েছেন সবিতা (তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো ইত্যাদি মন্ত্রে (ঋগ্বেদ, ৩।৬২) ধীশক্তির প্রেরয়িতা রূপে।)

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূর্য বিপুল শক্তির অধিকারী ও জাগতিক শক্তির মূলাধার। পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বহ্নিমান সূর্যদেহের অভ্যন্তরে অবিরাম বিস্ফোরণ ঘটছে, গ্যাসপিণ্ড জলছে, তাপমাত্রা প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডিগ্রী। ঐ তাপে প্রতিনিয়ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে এবং পরমাণুপিণ্ডে তাপঘটিত বিক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব ঘটছে। বিকিরণ শক্তি বা **radiant energy**-র কিয়দংশ তাপ, আলোক ও অন্যান্য রশ্মিরূপে পৃথিবীতে এসে পড়ছে এবং যাবতীয় প্রাণীকে প্রাণ-ধারণের শক্তি-সামর্থ্য জোগাচ্ছে। সুতরাং

'জ্যোতিস্কৃদসি স্বর্য, বিশ্বমাভাসি রোচনম্' (ঋগ্বেদ, ১।৫০) ইত্যাদি মন্ত্রে যদি সেই স্বর্য পার্থিব মানব কর্তৃক বন্দিত হন, তাহলে সেটি কি অত্যুক্তি ?

আকাশ পানে চেয়ে আমরা যে উজ্জ্বল স্বর্যকে দেখতে পাই, সেটি কিন্তু স্বর্য-দেহের বহিরংশ মাত্র। বিজ্ঞানিগণ অনুমান করেন, ঐ বহিরংশ (outer surface) অপেক্ষাকৃত শীতল (তাও তার তাপমাত্রা প্রায় ৬ হাজার ডিগ্রী !)। ঐ অংশের নাম photosphere ; তাকে ভেদ করে অভ্যন্তরের আলো নির্গত হওয়ার দরুন স্বর্যের বর্ণালীতে আলোক-শোষণের চিহ্ন (spectral lines) দেখা যায়। আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই সব লাইন দেখে স্বর্যদেহে ও তার পরিমণ্ডলে অবস্থিত গ্যাসসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাবিশ্বে এরূপ প্রচণ্ড শক্তিধর স্বর্য কি একটি ? আকাশবিজ্ঞানিগণ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন বহু বহু স্বর্যের অস্তিত্ব। যে-তারকাপুঞ্জের অন্তর্গত হয়ে আমরা বেঁচে আছি সেই galaxy মধ্যে কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি তারকা বিদ্যমান। আমাদের স্বর্য হচ্ছে সেই main sequence star সমূহের অন্যতম (Hertz prung-Russell diagram অনুযায়ী)। মহাবিশ্বে এরূপ তারকাপুঞ্জ ও তদন্তর্গত কতো স্বর্যই না প্রকটিত ! আকাশবিজ্ঞানের হিসাবনিকাশ ও জ্যোতিষ্ক-সমূহের বৃত্তান্ত শুনে অবাক্ হতে হয়, সে তুলনায় আমাদের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অস্তিত্বের কথা ভেবে।

বিস্ময়ের অবধি থাকে না যখন ভাবা যায় কতো দূরে সঞ্জাত সৌরশক্তি কিভাবে পৃথিবীর বুকে এসে পড়ছে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে। স্বর্য থেকে তাপ ও আলোক আমরা যে পাচ্ছি, এটাই প্রমাণ করে ঐ শক্তি মহাশূন্য অতিক্রম ক'রে আসতে পারে। বস্তুহীন মাধ্যমে শক্তির স্থানান্তর ঘটতে পারে কি উপায়ে, এ-প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বিজ্ঞানিগণকে ভাবতে হয়েছে অনেক কথা। বিকিরণ শক্তির নানাবিধ রূপ ও রূপান্তর তাদের মনে জাগিয়েছে অনেক জিজ্ঞাসা ও তত্ত্বভাবনা।

১০

তরঙ্গ

—স্পন্দনভঙ্গি ও প্রবাহ—

প্রশান্ত পুষ্করিণীর জলে একটা ঢিল ফেললে অথবা ঘটিবাটি দিয়ে একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলে উপজাত হয় জলের তরঙ্গ। ঢেউগুলি ধীরে-আস্তে অগ্রসর হতে হতে পুকুরের কিনারায় গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। অশান্ত সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ, একটার পর একটা, সমুদ্রতটে আছাড় খেয়ে পড়ে। তরঙ্গ কী বস্তু, সেটি আদৌ বস্তু কিনা, তার গতিপ্রকৃতি কিরূপ ইত্যাদি নিয়ে তেমন মাথা না ঘামালেও বুদ্ধিযুক্ত মানুষ নিশ্চয় লক্ষ্য করেন যে, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দিকে ধাবমান ঢেউগুলির সঙ্গে কিন্তু এ-ঘাটের জল ও-ঘাটে গিয়ে পৌঁছায় না। যেখানকার জল সেখানেই রয়ে যায়, শুধু বয়ে যায় একটা-কিছু যার নাম ঢেউ।

কবিতায় আছে, 'ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে'। কবি কল্পনানয়নে প্রত্যক্ষ করেন, ধান্যশীর্ষগুলি বাতাসের আঘাতে আন্দোলিত হয়। সেই মৃদুমন্দ আন্দোলন যেন শস্যক্ষেত্রের এক অংশ থেকে অপর অংশে পৌঁছে যায়, কিন্তু তার ফলে কোনো ধানগাছ উৎপাটিত হয়ে ঢেউয়ের সঙ্গে অন্যত্র চলে যায় না। তাহলে প্রবাহিত হয় কোন্‌টি? কবি নীরব থাকেন, কিন্তু বিজ্ঞানী উত্তর দিয়ে বলেন, যা এগিয়ে চলে তা হচ্ছে তরঙ্গভঙ্গি, একটা অবস্থা, একটা স্পন্দনশীলতা।

চোখে দেখা না গেলেও আরেক রকম ঢেউ-এর সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় আছে, তার নাম শব্দতরঙ্গ। কম্পমান কোনো বস্তু থেকে উদ্ভূত হয়ে সেই তরঙ্গ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, কানের পর্দাকে কাঁপিয়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত শব্দ-শ্রবণের অনুভূতি জাগায়। শব্দতরঙ্গের উৎপত্তি, বিস্তার এবং ধ্বনিসঞ্চার এ-সব শব্দবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কতোরকম শব্দই না আমরা প্রতিনিয়ত শুনে থাকি! তাদের কোনোটি শ্রুতিমধুর কোনোটি বিরক্তিকর, কোনটির স্বর তীক্ষ্ণ কোনোটির স্বর গম্ভীর। বিজ্ঞানের বিচারে এ-সবের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা যায়। শব্দতরঙ্গগুলি ছোট না বড়, হ্রস্ব না দীর্ঘ, তার উপর নির্ভর করে স্বরের তীক্ষ্ণতা। ঢেউগুলির আয়তন (amplitude) কমবেশী হলে আওয়াজের জোর (intensity)

কমবেশী হয়। তাছাড়া রকমারি তরঙ্গের মিশ্রণ অনুযায়ী শব্দলালিত্য অনেকাংশে নিরূপিত হয়ে থাকে।

শব্দ হচ্ছে একপ্রকারের তরঙ্গবাহিত শক্তি। তাপ আলোক ইত্যাদিও তরঙ্গ-বাহিত বিকিরণ শক্তি। কিন্তু এদের তুলনায় শব্দতরঙ্গের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। শব্দতরঙ্গ প্রবাহের জন্য প্রয়োজন হয় একটা জড় মাধ্যমের, কিন্তু তাপ বা আলোক জড়বিহীন মাধ্যমেও প্রবাহিত হতে পারে। একটা বায়ুশূন্য ঘরে ঢাক বাজালেও তার আওয়াজ পাওয়া যায় না। জড় মাধ্যমের অভাবে বাদ্যযন্ত্রের কম্পন কোনো শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু ঐ বায়ুশূন্য ঘরে একটা ইলেকট্রিক বাল্ব (bulb) জ্বালালে তার আলোক স্বচ্ছন্দে ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া, শব্দতরঙ্গ ও আলোকতরঙ্গের মধ্যে আর এক পার্থক্য আছে তাদের তরঙ্গ-ভঙ্গিতে। বিজ্ঞানের ভাষায় শব্দতরঙ্গ হচ্ছে longitudinal waves, আর আলোকতরঙ্গকে ধরা হয় transverse waves রূপে। প্রথম ক্ষেত্রে তরঙ্গ যে-মুখে প্রবাহিত হয় সেই মুখেই মাধ্যমের বিভিন্ন স্তরের কম্পন ঘটে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যা-কিছু কম্পন বা পৌনঃপুনিকতার সৃষ্টি, তা হয় তরঙ্গ-প্রবাহের আড়াআড়ি (transverse) বা লম্বভাবে।

উপরি-উক্ত পার্থক্য সহজবোধ্য করার জন্য দুটি চিত্রের আশ্রয় নিচ্ছি। প্রথম চিত্রে দেখানো হয়েছে কিভাবে একটা শব্দ-শলাকা (tuning fork) কম্পিত হয়ে
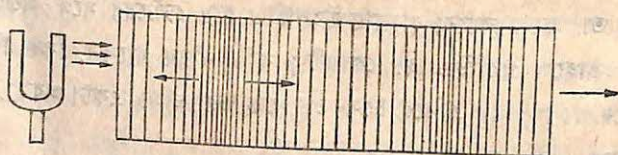
চিত্র—১

চিত্র—২

সন্নিহিত বায়ুস্তরকে আন্দোলিত করে এবং চাপপিষ্ট প্রত্যেকটি বায়ুস্তর আগুপিছু কম্পিত হতে হতে সেই আন্দোলনকে মাধ্যমের মধ্যে প্রবাহিত রাখে। শব্দতরঙ্গের উৎপত্তি ও বিস্তার হয় এইভাবে। দ্বিতীয় চিত্রে দেখানো হয়েছে কিভাবে জলের

উপরিভাগে অবস্থিত জলবিন্দু উঁচুনীচু দিকে কম্পিত হতে থাকে এবং সেই কম্পনভঙ্গি অগ্রসর হয় জলতলের সমান্তরাল দিকে। এক্ষেত্রে কম্পনের দিক ও তরঙ্গপ্রবাহের দিক পরস্পরের সঙ্গে সমকোণ সৃষ্টি করে। এই কারণে এ-ধরনের তরঙ্গকে বলা হয় transverse waves।

সংজ্ঞা :

তরঙ্গ কাকে বলে ? বিজ্ঞানিগণ তরঙ্গ সম্পর্কে একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন যার ফলে তরঙ্গ বা ঢেউ শুধু অবলোকনের ব্যাপারে নয়। এটি time and space বা দেশ ও কালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও পরিমাপযোগ্য।

'কোনো স্থানে' যদি 'কোনো কিছু'র পরিবর্তন (হ্রাসবৃদ্ধি) নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে একইভাবে ঘটতে থাকে তাহলে সেই পুনরাবৃত্ত চাঞ্চল্যকে বলা হয় তরঙ্গ।

ব্যাখ্যা :

(১) 'কোনো স্থানে' অর্থে space বা স্থানে অবস্থিত কোনো বিন্দুতে। সেই স্থানবিন্দুতে যে-স্পন্দন পরিদৃষ্ট হয় তারই অগ্রগতির নাম তরঙ্গ-প্রবাহ।

(২) 'কোনো কিছু' অর্থে কোন গুণ বা অবস্থা, যার পরিবর্তন পরিমাপযোগ্য। যথা, স্থানচ্যুতি, তাপমানের হ্রাসবৃদ্ধি, চাপের কমবেশী হওয়া, বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের বা চুম্বকক্ষেত্রের উদ্ভব ইত্যাদি। ধারণা করা হয় এই 'কোনো কিছু'টারই যেন পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

(৩) 'পুনরাবৃত্ত ঘটনা' অর্থে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একই অবস্থার (বা ঘটনার) বারংবার উদ্ভব। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় periodic event।

উপরি-উক্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাকে সহজবোধ্য করার জন্য ধরা যেতে পারে একটি দোলকের (pendulum-এর) উদাহরণ। দেওয়াল-ঘড়ির দোলকের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। দোলকটির টক-টক শব্দে প্রতিটি সেকেণ্ড মুখরিত, সময়ের নির্দিষ্ট ব্যবধান চমৎকারভাবে সূচিত। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমরা ধরব একটি সরল দোলকের কথা। একটা শক্ত অবলম্বন (support) থেকে একটা লম্বা সুতোয় বাঁধা একখণ্ড বস্তু ঝুলছে (চিত্র ৩ দ্রষ্টব্য)। মাধ্যাকর্ষণের ফলে সহজ অবস্থায় সেটি লম্বভাবে (vertically) ঝুলবে। বস্তুখণ্ডটিকে পাশ থেকে একটু টেনে ছেড়ে দিলে দোলকটি দুলতে শুরু করবে।

বস্তুখণ্ডটি মধ্যস্থল থেকে একদিকে A বিন্দু পর্যন্ত, অন্যদিকে B বিন্দু পর্যন্ত যাতায়াত করবে। এর নাম দোলন। একবার দোলন সম্পূর্ণ করতে অর্থাৎ A থেকে B-তে গিয়ে পুনরায় A-তে ফিরে আসতে দোলকটি যে-সময় নেয় তার কোনো হেরফের হয় না। এই সময়ান্তরকে বলা হয় time period বা দোলনকাল।
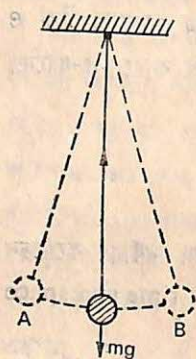
চিত্র—৩

এক দোলনকালমধ্যে ঝুলন্ত দোলকপিণ্ডটি মধ্য-স্থল থেকে যতটা দূরে থাকে তার নাম সরণ (displacement)। স্পষ্টতঃ এই সরণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে দোলনকালে। সর্বাধিক সরণ ঘটে যখন দোলকপিণ্ডটি A অথবা B বিন্দুতে অবস্থিত হয়। সুতরাং বলা যায় এই সরণ হচ্ছে একটি পুনরাবৃত্ত ঘটনা এবং তা পরিমাপযোগ্য।

তরঙ্গ-প্রবাহ ঃ

কোনো তরঙ্গ বা পুনরাবৃত্ত ঘটনা যদি একই স্থানে সীমাবদ্ধ না থেকে কোনো মাধ্যমে এগিয়ে যায় তাহলে সৃষ্ট হয় তরঙ্গ-প্রবাহ। যে-গতিতে ঐ পুনরাবৃত্ত ঘটনা অগ্রসর হতে থাকে তাকে বলা হয় তরঙ্গগতি (wave velocity)। বহমান তরঙ্গ যখন নির্দিষ্ট গতিতে এগিয়ে চলে তখন তার গতিবেগ, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও পৌনঃপুনিকতা একটা আঙ্কিক সম্পর্কযুক্ত। অঙ্কের ভাষায় $v = n\lambda$ (v = তরঙ্গের গতিবেগ, λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য, n = কম্পনাঙ্ক অর্থাৎ ১ সেকেণ্ডে কত সংখ্যক কম্পন হয়)।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য কাকে বলে ? যে-সময়ে একটি কম্পন বা পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণ হয় সেই সময়ে তরঙ্গের যতটুকু অগ্রগতি হয় তাকে বলা হয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য। অতএব ১ সেকেণ্ডে যদি n সংখ্যক দোলন বা কম্পন সম্পূর্ণ হয় তাহলে বুঝতে হবে ঐ সংখ্যা ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের গুণফল সমান প্রতি সেকেণ্ডে তরঙ্গের অগ্রগতি অর্থাৎ তরঙ্গের গতিবেগ। সহজ ঐকিক নিয়মে লব্ধ এই ফর্মুলাটি ($v = n\lambda$) তরঙ্গবিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ বলা চলে।

প্রবাহিত কোনো তরঙ্গ ছোট না বড় তা নির্ভর করে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর। জলের তরঙ্গ চোখে দেখা যায় ; চলন্ত ঢেউ উঁচুনীচু আকার ধারণ করে। পরপর দুটি ঢেউ-এর মাথার (crest-এর) মধ্যে দূরত্ব যদি বেশী হয় তাহলে আমরা বলি বড় মাপের ঢেউ, দূরত্ব কম হলে বলি ছোট ঢেউ।

তরঙ্গের এইসব রকমারি পরিচয়-সংগ্রহের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলা যায় আধুনিক বিজ্ঞানে তরঙ্গ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা এতোই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে যে তরঙ্গবিজ্ঞান ব্যতীত পদার্থজ্ঞান প্রায় অসম্ভব। তরঙ্গসত্তা আজ বস্তু-সত্তার মতোই অতীব বাস্তব রূপে স্বীকৃত। এই ধারণা বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল সাহেব কল্পিত বিদ্যুৎ-চুম্বকক্ষেত্র তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণের পর থেকে। Electromagnetic waves বা বিদ্যুৎ-চুম্বক সম্পর্কিত ক্ষেত্রতরঙ্গের নানাবিধ রূপ আজ অনেকেই প্রত্যক্ষ করেন উন্নততর যন্ত্রকৌশল সহায়ে। সে-সবের মূলে আছে তরঙ্গতত্ত্ব এবং তরঙ্গবিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুশীলন।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রসঙ্গে মনে পড়ে বেতারযন্ত্রের কথা। ঘরে বসে রেডিও শোনার সময় ঠিক করে নিতে হয় 'সেণ্টার'। প্রত্যহ সকালবেলায় আকাশবাণীর ঘোষক জানিয়ে দেন, transmission বা প্রসারণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য। তিনি বলেন, কলকাতা ক ৪৫৬·৬ মিটার। সেই সঙ্গে আরেকটি সংখ্যাও জ্ঞাপন করেন তিনি, ৬৫৭ কিলোহার্জ। এ-দুটি সংখ্যার তাৎপর্য কি? বেতারযন্ত্রে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটে? গায়ক বা কথকের কণ্ঠনিঃসৃত শব্দধ্বনি মাইক্রোফোন মুখে যে কম্পন সৃষ্টি করে তা একটি যন্ত্রসহায়ে বিদ্যুৎ-বিকম্পে (electric pulse-এ) পরিণত হয়। সেই বিকম্পগুচ্ছ একটি বাহকতরঙ্গের সাহায্যে দূরদূরান্তে প্রেরিত হয় (বাহকতরঙ্গ carrier waves নামে পরিচিত)। সেই তরঙ্গসমূহকে ধরবার ব্যবস্থা থাকে রেডিও যন্ত্রে এবং সেখানে পূর্বোক্ত বিদ্যুৎ-বিকম্পগুলি যথাযথভাবে শব্দকম্পনে পরিণত হয়ে গায়ক বা কথকের কণ্ঠস্বরের পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

'কলকাতা-ক' ৪৫৬·৬ মিটারে চলছে একথার অর্থ হচ্ছে বাহকতরঙ্গের এক-একটি ঢেউ লম্বায় ৪৫৬·৬ মিটার। বেশ বড়-মাপের ঢেউ সন্দেহ নেই, কেননা ৪৫৬·৬ মিটার মানে প্রায় সিকি-মাইল লম্বা। এক সেকেণ্ডে একবার কম্পন সম্পূর্ণ হলে (one cycle per second) সেই কম্পনকে বলা হয় এক হার্জ (বৈজ্ঞানিক Hertz-এর নামাঙ্কিত একক)। এককিলো হার্জের অর্থ প্রতি সেকেণ্ডে ১ হাজার বার কম্পন। সুতরাং ৬৫৭ কিলোহার্জ মানে প্রতি সেকেণ্ডে ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার বার কম্পন সম্পূর্ণ হচ্ছে। অবাক্ কাণ্ড অবশ্যই!

এতো দ্রুত-কম্পনবিশিষ্ট তরঙ্গ-প্রসার কি সম্ভবপর? সম্ভব নিশ্চয়ই, নতুবা এতো সাফল্য অর্জিত হয়েছে কেমন ক'রে? ঊনবিংশ শতকে একদা ফ্যারাডে সাহেব তড়িৎ ও চুম্বকের পারস্পরিক প্রভাব সম্বন্ধে তথ্য উদঘাটন ক'রে বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তড়িৎক্ষেত্র ও চুম্বকক্ষেত্রকে গণিতের বন্ধনে

আবদ্ধ ক'রে আর এক ইতিহাস রচনা করেন বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল। তারপর থেকে বিজ্ঞানে তাত্ত্বিক প্রগতি হয়েছে অনেক। সেই প্রসঙ্গে আর একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হচ্ছেন Heinrich Hertz (1857-94)। ম্যাক্সওয়েল সাহেব তাঁর সমীকরণগুচ্ছ সহায়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, বিশেষ অবস্থায় কম্পনরত বিদ্যুৎ-কণা দূরে দূরান্তরে সৃষ্টি করতে পারে ক্ষেত্রতরঙ্গ। হার্জ সাহেবের কৃতিত্ব, তিনি হাতেকলমে প্রমাণ করেন, এরূপ তরঙ্গ আলোকের গতিতে প্রবাহিত হয়। শুধু তাই নয়, আলোকতরঙ্গ, তাপতরঙ্গ, ইন্‌ফ্রা, আল্‌ট্রা, এক্সরে প্রভৃতি অদৃশ্য তরঙ্গ প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন ক্ষেত্রতরঙ্গের রূপভেদ মাত্র। মূলতঃ সেগুলি সবই electromagnetic waves, পার্থক্য কেবল তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। অতি-বৃহৎ, বৃহৎ, ক্ষুদ্র, অতি-ক্ষুদ্র ঢেউগুলি গুণ-বৈচিত্র্যে পৃথক্ প্রতিভাত হলেও তারা সকলেই শক্তিবহনকারী তরঙ্গবিশেষ এবং শূন্য মাধ্যমে (in vacuum) অভিন্ন গতিবেগে প্রবহমান থাকে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এরূপ সমধর্মী আচরণ নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য।

পদার্থভেদে পরমাণুর মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও, তাদের মূল কণিকাসমূহ যেমন একটা অন্তর্নিহিত ঐক্যের ইঙ্গিত প্রদান করে, তেমনি তরঙ্গবাহিত শক্তির রূপভেদ থাকলেও বুঝতে হবে তাদের মধ্যে চমৎকার অভিন্নত্ব বর্তমান। পদার্থ-পরমাণুর ন্যায় তরঙ্গায়িত শক্তির কি কোনো ক্ষুদ্রতম মাত্রা আছে? কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবক্তাগণ বলেন, হাঁ আছে। সেই সর্বকনিষ্ঠ মাত্রার নাম 'ফোটন'। বিজ্ঞানের ভাষায় ফোটন হচ্ছে 'a quantum of electromagnetic radiation'* ফোটনের শক্তিমত্তা কতটুকু? সেটি নির্ভর করে তরঙ্গের কম্পনাঙ্কের উপর। ($e = h\nu$) কম্পনাঙ্ক যতো বেশী হবে (অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্য যতো কম হবে) ততই বাড়বে শক্তিমত্তা।

এই ফোটনের আচরণ কেমন? উত্তর, কখনো কণিকাবৎ কখনো তরঙ্গবৎ। উভয়বিধ আচরণ কি একসঙ্গে হতে পারে? তাত্ত্বিকগণ বলেন, তার সম্ভাব্যতা আছে বৈকি! নিশ্চয়তার পরিবর্তে সম্ভাব্যতার কথা বলছেন কেন? উত্তরে তাঁরা বলেন, অতি সূক্ষ্মের রাজ্যে সম্ভাব্যতা ও নিশ্চয়তার মধ্যে তেমন কোনো ইতর-বিশেষ নেই। সেকি, এতো হেঁয়ালি? না, তা নয়। পদার্থসত্তা ও তরঙ্গসত্তার একীকরণ সম্ভব হয়েছে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার মিলন-মোহানায়।

---

* A Dictionary of Science—Uvarov, Chapman & Isaacs.

১১

আলোক

—আলোকরেখা ও আলোকতরঙ্গ—

আশ্চর্যের ব্যাপারই বটে, যার সাহায্যে বস্তু সম্বন্ধে দৃষ্টিবোধ ঘটে তাকে কিন্তু আদৌ চোখে দেখা যায় না! আলোক নিজে অদৃশ্য থেকে অপরকে দৃশ্যমান করে। আলোকনের এই প্রক্রিয়া খুব স্বাভাবিক মনে হলেও এ-ব্যাপারে জটিলতার অবধি নেই। উজ্জ্বল সূর্যের দিকে অথবা স্নিগ্ধ-কিরণ চন্দ্রের পানে তাকিয়ে আমরা ভাবি, ঐতো আলো দেখা যাচ্ছে। লণ্ঠন, ঝাড়বাতি, প্রদীপ, ইলেক্‌ট্রিক বাল্ব ইত্যাদি দেখে তৎক্ষণাৎ আমরা ধরে নিই, আলোক দেখা যায়। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায়, এগুলি আলোকের উৎস বা আলোকপ্রদানকারী বস্তুর উজ্জ্বল গাত্র মাত্র। তাদের থেকে নির্গত অদৃশ্য আলোক অন্য বস্তুর উপর আপতিত হয়ে আলোকন সৃষ্টি করে এবং উৎসারিত রশ্মি চক্ষুগোলকের ছিদ্রপথে প্রবেশপূর্বক চোখের পর্দায় একটা ছবির উদ্ভব ঘটায়। অজানা উপায়ে তার সংকেত স্নায়ুবাহিত হয়ে আলোক-সচেতন মানুষের মস্তিষ্কে ও মনে ধারণা সঞ্চার করে। কতো যে কাণ্ড ঘটতে থাকে দৃষ্টিবোধের অন্তঃপুরে, তার সামান্য অংশই মানুষের বাহ্যিকভাবে বোধগম্য, বাকী সবটুকুই রহস্যে ঢাকা।

শুধু দৃষ্টিজ্ঞান ও চক্ষুরিন্দ্রিয় কেন, সকল ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ এবং তজ্জনিত জ্ঞানলাভ দৃশ্যতঃ সহজ সরল মনে হলেও তাদের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া যথেষ্ট জটিল। ভারতীয় দার্শনিকগণ সেই কারণে স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহের স্বভাব নিরূপণ করতে গিয়ে বারংবার সূক্ষ্মরাজ্যে উপনীত হয়েছেন; ইন্দ্রিয়াদির পিছনে মনের খেলা, এবং মনের খেলার পিছনে চেতনশক্তির সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন।

বিজ্ঞানিগণের দৃষ্টিভঙ্গি কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। তাঁরা জড়শক্তির বহিরাবরণ উন্মোচনে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে চান বস্তুনিষ্ঠ উপায়ে ও পরিমাপযোগ্যতার yard stick বা মাপকাঠি অবলম্বনে। উদাহরণস্বরূপ, আলোকের উৎস হতে উৎসারিত রশ্মি সরলরেখা পথে গমনপূর্বক আলোকন সৃষ্টি করে, দর্পণে প্রতিফলিত হয়, এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রতিসরিত হয়, প্রতিসরণের সময় একই রশ্মি বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হয়ে বর্ণালী উৎপাদন করে, রশ্মিসমূহ মিলিত হয়ে কখনো সঠিক ছবি কখনো আপাতছবি তৈরি করে, দৃষ্ট ছবি কখনো ক্ষুদ্রাকার কখনো বৃহদাকার ধারণ করে।

এইসব বিষয় অনুশীলনের ভিত্তিতে বিজ্ঞানিগণ রচনা করেন আলোক-সম্পর্কিত একটি বিভাগ যার বৈজ্ঞানিক নাম আলোক-জ্যামিতি বা geometrical optics। বিজ্ঞানের এই বিভাগে আলোকের প্রকৃত স্বরূপ কী তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। অর্থাৎ আলোকরশ্মি প্রকৃতপক্ষে কী, উৎস থেকে তারা কি কণার আকারে নির্গত হয়, অথবা তরঙ্গবাহিত শক্তিরূপে ছড়িয়ে পড়ে এ-সব প্রশ্ন উহ্য রেখেই আলোক-জ্যামিতির বিস্তার।

এরূপ সীমাবদ্ধ অনুশীলনেরও উপযোগিতা আছে। কতো প্রযুক্তিই না গড়ে উঠেছে আলোক-জ্যামিতির মাধ্যমে! অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে অতি ক্ষুদ্র বস্তুকে বৃহদাকার দেখা যায়, দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সুদূর নভোমণ্ডলে জ্যোতিষ্কসমূহের কতো তথ্যই না আমরা অবগত হই! বর্ণবিশ্লেষণ যন্ত্র সহায়ে পদার্থ সম্বন্ধে কতো বিস্ময়কর তথ্য উদ্ঘাটিত হয় আমাদের কাছে! এ-সবের মূলে আছে আলোক-জ্যামিতি। বিজ্ঞানের ঐ বিভাগটি যে-কয়েকটি সহজ সরল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত তা সংক্ষেপে এইরূপ,

(১) আলোকরশ্মি বাধাপ্রাপ্ত না হলে সরলরেখাপথগামী হয়ে থাকে।

(২) প্রতিফলনে কোণ-সমত্ব রক্ষিত হয়।

(৩) প্রতিসরণে আলোকরেখার দিক্ পরিবর্তন ঘটে আঙ্কিক নিয়মে।

(৪) বর্ণভেদে প্রতিসরণের কৌণিক পরিমাণ বিভিন্ন।

চিত্র চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে দেখানো হয়েছে, আলোক **A** বিন্দু থেকে B বিন্দুতে উপনীত হয়েছে $\overrightarrow{AB}$ সরলরেখা পথ বেয়ে। দুটি বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্বের পথ হচ্ছে সরলরেখা। সুতরাং আলোকের গতিপথ এমনই যে, সবচেয়ে কম সময়ে আলোক স্থান থেকে স্থানান্তরে উপস্থিত হয়।
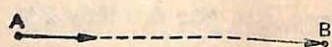
চিত্র—১
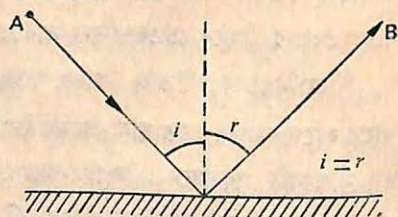
চিত্র—২

দ্বিতীয় চিত্রে দেখানো হয়েছে আলোকরশ্মির প্রতিফলন। আপতিত রশ্মি **AO** প্রতিফলনের পর **OB** অভিমুখে যাচ্ছে। **AO** এবং **OB**, **O** বিন্দুতে সমান কোণ

উৎপন্ন করে। তাই, প্রতিফলনে কোণসমত্বের কথা সূত্রে লিপিবদ্ধ। কেন এমন হয়? এক্ষেত্রেও কি কোনো মূলনীতি অনুসৃত হচ্ছে? জ্যামিতির সাহায্যে অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়, A বিন্দু থেকে উৎসারিত আলোকরেখা (ray) প্রতিফলনের পর B বিন্দুতে উপস্থিত হতে যে-পথটি বেছে নেয় সেটি হচ্ছে সবচেয়ে কম দৈর্ঘ্যের পথ অর্থাৎ যে-পথে গেলে সবচেয়ে কম সময় লাগে সেই পথই বেছে নেয় আলোকরেখা।
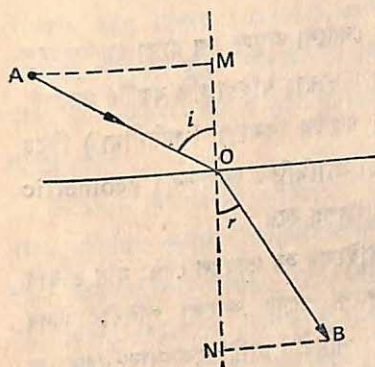
চিত্র—৩
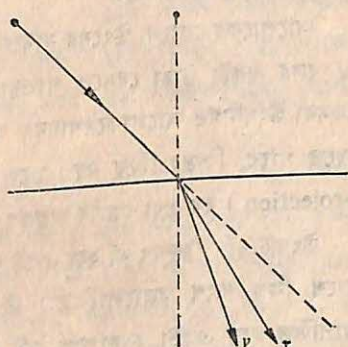
চিত্র—৪

তৃতীয় চিত্রে দেখানো হয়েছে আলোকরশ্মির এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রতিসরণ। A বিন্দু থেকে O বিন্দুতে প্রথম মাধ্যমে v_1 বেগে AO পথ অতিক্রম করতে আলোক যেটুকু সময় নেয় এবং দ্বিতীয় মাধ্যমে v_2 বেগে OB পথ অতিক্রম করতে যত সময় লাগে তাদের যোগফল হচ্ছে আলোকের A থেকে Bতে উপনীত হবার জন্য মোট সময়। (অঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় এই যোগফল তখনই সবচেয়ে কম হবে যখন $\frac{AM}{BN} = \frac{v_1}{v_2}$ অর্থাৎ $\frac{\text{Sin } i}{\text{Sin } r} = \frac{v_1}{v_2}$)

সুতরাং দেখা যায়, কি প্রতিফলন কি প্রতিসরণ উভয় ক্ষেত্রেই আলোক একটা নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে চলে এবং সেই কারণে আলোকের যাবতীয় জ্যামিতিক আচরণ এক অভিন্ন সূত্রে আবদ্ধ। সেই মূলসূত্রটি আবিষ্কার করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী Fermat আনুমানিক ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে। তাঁর নামাঙ্কিত Fermat's Principle of least time-এর মর্মার্থ হচ্ছে, আলোকরশ্মি প্রতিফলন ও প্রতি-

সরণের বেলায় এমন পথ বেছে নেয় যাতে এক বিন্দু হতে অপর বিন্দুতে পৌঁছাতে তার সবচেয়ে কম সময় লাগে।*

আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিচার যাই হোক না কেন, আলোক সম্পর্কিত নানাবিধ ঘটনার একটা সহজ সরল ব্যাখ্যাপ্রদান সম্ভবপর হয় আলোকের সরলরেখা-গতির অনুমান সহায়ে এবং সেই সঙ্গে প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সরল সূত্রদ্বয় অবলম্বনে। কয়েকটি পরিচিত ঘটনা উদাহরণস্বরূপ উপস্থিত করছি।

আলোকন ও ছায়াগঠন

আলোকের কোনো উৎসের সামনে যদি কোনো অস্বচ্ছ বস্তু রাখা হয় তাহলে ঐ বস্তুর একটা ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। ছায়ার বহিরাকৃতি বস্তুটির মতোই, কেননা উৎসনির্গত আলোকরেখাসমূহ অস্বচ্ছ বস্তুটির কিনারা (পরিসীমা) দিয়ে যেতে পারে, ভিতর দিয়ে নয়। ফলে একটা জ্যামিতিক আপতন (geometric projection) হয় এবং বস্তুটির অনুরূপ ছায়া উৎপন্ন করে।

উৎসটি যদি বিন্দুবৎ না হয়ে একটু বড় সাইজের হয় তাহলে দেখা যায় ছায়ার পাশে কিছু অংশ স্বল্পালোকিত। ঐ অংশকে সূর্যের আলো পৃথিবীর উপর আপতিত হয়ে একটা ছায়াপুচ্ছ সৃষ্টি করে। পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তনরত চন্দ্র যখন ঐ ছায়াপুচ্ছের অভ্যন্তরে এসে যায় তখন সে সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। সে-অবস্থায় চাঁদকে দেখা যায় না। ঐরূপ পরিস্থিতির নাম চন্দ্রগ্রহণ। অনুরূপভাবে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে যদি চন্দ্রের অবস্থান ঘটে তাহলে পৃথিবীর কোনো কোনো অংশের লোক সূর্যকে দেখতে পায় না চাঁদের ছায়ায় সূর্য ঢাকা পড়ে যায় বলে। এর নাম সূর্যগ্রহণ। সুতরাং আলোকের উৎসের সামনে কোনো বাধা উপস্থিত হবার ফলে যে ছায়াপাত ঘটে জ্যামিতিক নিয়মে, তাই হচ্ছে গ্রহণ নামক প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা। এই ঘটনা আলোকরশ্মির রেখাগতির একটা বাস্তব প্রমাণ।

---

* অঙ্কের বিচারে এই নীতির বিবৃতিকে কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে প্রকাশ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিফলন ও প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আলোক এমন পথ নির্বাচন করে নেয় যে-পথের যৎসামান্য পরিবর্তন ঘটালেও সেই পথ অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন সময়ের কোনো হেরফের ঘটে না। এহেন অবস্থাকে অঙ্কের ভাষায় বলা হয় 'stationary condition'। Calculus-এর ভাষায় তখন $\frac{\delta t}{\delta x}=0$ এবং এরূপ অবস্থায় t-এর value minimum অথবা maximum হতে পারে।

প্রতিফলন

নিজের মুখ দেখার জন্য যে-আয়না ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটি বিজ্ঞানের ভাষায় একটি reflector বা প্রতিফলনকারী বস্তু, যার কাজ হচ্ছে প্রতিফলন সহায়ে কোনো কিছুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করা। এর অপর নাম দর্পণ। এটি সমতল হলে বলা হয় সমতল দর্পণ বা plane mirror।

কে না জানে সমতল দর্পণের সামনে কোনো বস্তু রাখলে ঐ আয়নার ভিতর দিয়ে যে-ছবিটি দেখা যায় তা সাইজে বস্তুটির সঙ্গে হুবহু সমান? তবে ডান-পাশটা বাঁ-পাশ হয়ে দেখায় (lateral inversion)। তাছাড়া বস্তুটি আয়না থেকে যত দূরে অবস্থিত থাকে তার ছবিটা ঠিক তত দূরেই আয়নার পিছন দিকে থাকে মনে হয়। সুতরাং বস্তু ও তার আপাতদৃষ্ট ছবি সকল সময় সমতল দর্পণের থেকে সমদূরবর্তী।

আয়নার মধ্য দিয়ে যে-ছবি দেখা যায় তাকে 'আপাত ছবি' (অসৎ-বিম্ব) নামে অভিহিত করার কারণ প্রতিফলিত রশ্মি যেন ঐ ছবি থেকে নির্গত হচ্ছে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে আয়নার পিছন দিকে তো কোনো রশ্মির অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কেননা আয়নাটি প্রতিফলক হলেও সেটি তো এক অস্বচ্ছ বস্তু। তাকে ভেদ ক'রে আলোকরশ্মি যাবে কেমন করে? তাই দৃশ্যমান ছবিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় (১) আপাত ছবি (২) সঠিক ছবি (সাধু ভাষায় অসৎ-বিম্ব ও সৎবিম্ব)। বিজ্ঞানের ভাষায় যথাক্রমে virtual image ও real image। সঠিক ছবির বৈশিষ্ট্য, তাকে পর্দার উপর ধরা যায় বা দেখা যায়। সিনেমার পর্দায় যে-ছবি দেখা যায় তা real image-এর এক উদাহরণ।

সমতল দর্পণে প্রতিফলনের ফলে যে-ছবি দেখতে পাওয়া যায় তার বিশেষত্ব,

(১) বস্তু ও তার ছবি প্রতিফলকের সামনে ও পিছনে সমদূরে অবস্থিত থাকে।
(object distance = image distance)

(২) বস্তু ও তার ছবির আকৃতি সমান সমান। (কোনো পরিবর্ধন বা magnification হয় না)

(৩) ছবিটি erect কিন্তু laterally inverted অর্থাৎ প্রতিফলিত ছবিতে পার্শ্ব পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেলেও সেটি উঁচুনীচু দিকে বস্তুটির মতোই দেখায়।

(৪) ছবিটিকে পর্দায় ফেলা যায় না; চোখে দেখা যায় মাত্র।

এই চতুর্বিধ বিশেষত্বের সহজ ব্যাখ্যা মেলে আলোক সম্বন্ধে দুটি অনুমানের সাহায্যে।

(১) আলোক সরলরেখা পথে গমনাগমন করে।

(২) প্রতিফলনে কোণ-সমত্ব রক্ষিত হয়।

এই দুটি অনুমান আবার **Fermat's Principle** থেকে উদ্ভূত। সুতরাং বলা যায়, একটিমাত্র মূলনীতি নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিফলনের যাবতীয় ঘটনাকে। বিজ্ঞান-বিকাশের এই তো **beauty** বা চমৎকারিত্ব, যেখানে বহু ঘটনার ব্যাখ্যা একৈক সূত্র দিয়ে জ্ঞাতব্য।

প্রতিসরণ

একটা মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবাহিত হবার মুখে আলোকরশ্মির পথ-পরিবর্তনের ফলে যে-সব ঘটনা চোখে পড়ে তাদের সঙ্গে পরিচিত হলেও তাদের মূল কারণ সম্বন্ধে আমরা তেমন অবহিত থাকি না। উদাহরণস্বরূপ, একটা খালি চৌবাচ্চা দেখতে যতটা গভীর মনে হয়, চৌবাচ্চাটি জলপূর্ণ থাকলে ততটা গভীর দেখায় না। নিজের হাতের আঙুল (অঙ্গুলি) জলে ডুবিয়ে দেখলে মনে হয় আঙুলগুলো খর্বাকৃতি হয়ে গেছে। তাপদগ্ধ দিনে উত্তপ্ত বাতাসের মধ্য দিয়ে দূরের গাছপালা ঝিলমিলে ও আবছা দেখায়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে দূরবর্তী বস্তু থেকে আলোক প্রতিসরিত হতে হতে চক্ষুগোলকে উপস্থিত হয়। গরমের দিনে বাতাসের উষ্ণতা এবং সেই কারণে তার ঘনত্ব ঘন ঘন পরিবর্তিত হতে থাকে। তার ফলে প্রতিসরণেও পরিবর্তন ঘটে এবং দূরস্থিত বস্তুটির ছবিটি এলোমেলো দেখা যায়।

মরুভূমি অঞ্চলে উত্তপ্ত বালুকার সংস্পর্শে এসে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে লঘু মাধ্যমে পরিণত হয়। উপরের বাতাস ভারী, নিচের বাতাস হাল্কা, এরূপ একটা অবস্থার ফলে প্রতিসরণে বেশ মজার ব্যাপার ঘটে। ঘন থেকে লঘু মাধ্যমে প্রতিসরণের সময় আলোকরেখার দিক্ পরিবর্তন হয়। কিন্তু এমনও হতে পারে যখন আর প্রতিসরণের উপায় থাকে না; ঐ অবস্থায় আলোকরেখা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। মরুভূমিতে স্থানে স্থানে এরূপ অবস্থা সৃষ্ট হবার ফলে প্রতিফলন দেখে তৃষ্ণাকাতর মরুযাত্রীর মনে হয় দূরে যেন কোনো জলাশয় আছে যার জলতল থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে দূরস্থিত বস্তুর ছবি। মরীচিকা বা দৃষ্টিবিভ্রমের সৃষ্টি এভাবেই হয়ে থাকে মরুপ্রদেশে এবং এই ঘটনার জন্য দায়ী হচ্ছে আলোকের প্রতিসরণ।

আকাশে রামধনু দেখে আমরা পুলকিত বোধ করি, ভাবি কোন্ নিপুণ শিল্পী

এমন চমৎকার ছবি সৃষ্টি করেন মানুষের মনে বিস্ময় জাগানোর জন্য। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ঝিরঝিরে বৃষ্টির জলকণার উপর আপতিত এদিক্-থেকে-আসা সূর্যরশ্মি অপর-দিকের-আকাশে ধনুকাকৃতি বর্ণালী সৃষ্টি করে, যার নাম রামধনু। এই বর্ণালীতে থাকে লাল থেকে বেগুনী পর্যন্ত পর পর সাতটি রঙ (v i b g y o r)। বাংলা ভাষায় লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, অতি-নীল ও বেগুনী। ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যায়, একটি রামধনুর কোলে একটু ফাঁক রেখে আর একটি রামধনুর উপস্থিতি যাতে ঐ রঙগুলি উল্টো ক্রমে (in reverse order) সাজানো থাকে।

যেদিকে সূর্য থাকে তার অপরদিকে রামধনুর অবস্থান দেখে নিশ্চয় অনুমান করা যায় যে, সূর্যরশ্মি আকাশে ভাসমান জলবিন্দুর ভিতর দিয়ে একাধিকবার প্রতিসরিত ও প্রতিফলিত হয়ে এমন ঘটনা ঘটায়। সূর্যের সাদা আলোকে থাকে সাতটি রঙের সংমিশ্রণ। মহামতি নিউটন নিখুঁত পরীক্ষা সহায়ে দেখাতে সমর্থ হন কিভাবে ঐ সাতটি রঙ পুনর্মিলিত হয়ে সাদা আলোয় পরিণত হতে পারে। সাত রঙে উপযুক্তভাবে রঞ্জিত একটা চাকি যখন স্থির থাকে তখন তার প্রত্যেক রঙের ছবি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখা যায়। কিন্তু ঐ চাকিটি যদি প্রচণ্ডবেগে ঘোরানো যায় তখন চোখের পর্দায় একটা রঙের ছবি মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই আর একটা রঙের ছবি এসে পড়ে। ফলে চোখের পর্দায় বিভিন্ন রঙের পুনর্মিলন ঘটে এবং তখন দেখা যায় চাকির রঙ সাদা হয়ে গেছে। বিজ্ঞানে এই পরীক্ষা বিখ্যাত হয়ে আছে Newton's Colour Disc experiment নামে।

শুধু রামধনু নয়, আলোকের নানাবিধ বর্ণবিন্যাস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও কৌতূহল জাগায়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে মেঘের কোলে রঙের খেলা দেখতে কার-না ভাল লাগে, কার মনে না জিজ্ঞাসার উদয় হয়? সুদূর আকাশপানে চেয়ে নীলাভ নভোমণ্ডল দৃষ্টে কার-না মনে হয়, কোন্ আলোকে ছড়িয়ে আছে আকাশ-জোড়া নীল বাহার? দীঘির কালো জল, সত্যই তো কালো নয়, তবু কেন দেখায় কৃষ্ণবর্ণ? পুকুরের জলে বা কোনো জলপাত্রে তৈলাক্ত হাত ধুয়ে ফেলার সময় কেন ছড়িয়ে-পড়া তেলের সরে (layer-এ) রামধনুর মতো রঙ-বাহার দেখা যায়?

আলোক-জ্যামিতির সাহায্যে এ-সব ঘটনার পূর্ণ ব্যাখ্যা মেলে না। তাই বিজ্ঞানিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ-সবের পূর্ণতর ব্যাখ্যা পেতে হলে আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা সঞ্চয় করা একান্ত আবশ্যক। তাঁরা

অনুমান করেন, আলোক তরঙ্গবিশেষ এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তারতম্যই বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ। দৃশ্যমান বর্ণালীমধ্যে লাল রঙের আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী এবং বেগুনী রঙের আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। একটা বর্ণালীতে পরপর সাজানো থাকে নানারঙের আলো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্রম (sequence) অনুযায়ী। সেই কারণে বর্ণালী-বিশ্লেষণের এতো গুরুত্ব। আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্যটুকু সুন্দরভাবে ধরা পড়ে ঐ বর্ণালীর উপযুক্ত বিশ্লেষণে।

যে-কোনো বর্ণের হোক-না কেন, আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অতীব ক্ষুদ্র। তাই তার পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয় এমন একটি একক যেটি নিজেও অতীব ক্ষুদ্র। বিজ্ঞানী Angstrom-এর নামাঙ্কিত এই এককটিকে বলা হয় Angstrom unit বা সংক্ষেপে A.u., যার পরিমাণ হচ্ছে 10^{-8} cm বা এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ।

সূর্য-নির্গত আলোক সাদা রঙের আলোক (white light) রূপে সকলের কাছে পরিচিত। সূর্যালোকে থাকে সপ্তবর্ণের সমাবেশ। বর্ণের সংখ্যা ৭ ধরা হয় এই কারণে যে, ঐ সাতটি রঙের বিভিন্নতা সহজেই চোখে পড়ে বা বোধগম্য হয়। সাত-রঙ কিনা v i b g y o r-এর প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক-একটা range বা পরিসর আছে। অখণ্ড বর্ণালীতে এই পরিসর-বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে দেখা যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় continuous spectrum-এ পরপর বিস্তৃত থাকে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো। একটিমাত্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যযুক্ত আলোক দেখা যায় line spectrum-এ বা রেখা-বর্ণালীতে। এই বর্ণরেখার গুরুত্ব পদার্থবিজ্ঞানে অপরিসীম কেননা, ঐ রেখা দিয়ে সূচিত হয় উৎসের আভ্যন্তরীণ সংগঠন। অর্থাৎ আলোকরেখা দিয়ে চেনা যায় উৎস মধ্যে অবস্থিত পরমাণুকে। অতএব বর্ণালী যেন উৎসের পরিচয়-পত্র বা আইডেন্টিটি-কার্ড।

বিভিন্ন রঙের দৃশ্যমান আলোক ও তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তালিকা অনেকটা এইরূপ :*

		বর্ণ		তরঙ্গদৈর্ঘ্য
violet	...	বেগুনী	...	৪০০০-৪২৪০ Au
indigo	...	গাঢ়-নীল	...	
blue	...	নীল	...	৪২৪০-৪৯১২ ,,

* A Dictionary of Science—Uvarov, Chapman & Isaacs.

	বর্ণ		তরঙ্গদৈর্ঘ্য
green …	সবুজ	…	৪৯১২-৫৭৫০ Au
yellow …	হলুদ	…	৫৭৫০-৫৮৫০ ,,
orange …	কমলা	…	৫৮৫০-৬৪৭০ ,,
red …	লাল	…	৬৪৭০-৭০০০ ,,

মন্তব্য :—

(১) সুবিস্তৃত **electromagnetic spectrum** বা চুম্বক বিদ্যুৎ ক্ষেত্র-তরঙ্গের বিস্তৃতির একটি ক্ষুদ্রাংশ হচ্ছে দৃশ্যমান বর্ণালী।

(২) সূর্যালোক-প্রাপ্ত বর্ণালীর বেগুনী রঙের সীমারেখা ছাড়িয়ে একদিকে থাকে অদৃশ্য আলট্রা-ভায়োলেট বা অতি-বেগুনী অংশ। আবার লাল রঙের আলোকের প্রান্ত ছাড়িয়ে বিস্তৃত থাকে ইনফ্রা-রেড (**infra-red**) রূপে অদৃশ্য বিকিরণ। আলট্রা-ভায়োলেটের অস্তিত্ব চোখে ধরা না পড়লেও তার উপস্থিতি বোঝা যায় উপযুক্ত ফটো-ফিল্মের সাহায্যে। ইনফ্রা-রেড বিকিরণ ধরা পড়ে তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে।

(৩) বেগুনী আলোকের সর্বকনিষ্ঠ বর্ণরেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি ৪০০০ (চার হাজার Au) ধরা যায় তাহলে ঐরূপ একটি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কতটুকু ? তদুত্তরে বলা যায় সেটি হচ্ছে ১ সেন্টিমিটারের ২৫০০০ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ ১ সেমি পরিমিত স্থান অধিকার করতে পারে পরপর সাজানো ২৫০০০ সংখ্যক বেগুনী আলোকের তরঙ্গ।

(৪) বেতার-তরঙ্গের তুলনায় আলোক-তরঙ্গ কতটুকু ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, কলকাতা-ক কেন্দ্র থেকে প্রসারিত একটি বেতার-তরঙ্গের (৪৭০ মিটার দৈর্ঘ্যের) মধ্যে পাশাপাশি সাজানো হতে পারে ৪৭০০০×২৫০০০ সংখ্যক বেগুনী আলোক-তরঙ্গ।

(৫) গুণধর্মে পৃথক্ প্রতিভাত হলেও বেতার-তরঙ্গ ও আলোক-তরঙ্গ মূলতঃ একই গোত্রভুক্ত তরঙ্গ ; পার্থক্য শুধু দৈর্ঘ্যে, একটি বৃহদাকার, অন্যটি ক্ষুদ্রাকার।

প্রশ্ন জাগতে পারে, যদি সকল আলোক-তরঙ্গ একই গোষ্ঠীভুক্ত হয় তাহলে কেবলমাত্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিভিন্নতায় এমন বর্ণ-বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় কেন এবং কিভাবে ? মানতে হবে, এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর আজও মেলেনি ; **theory of colour vision** এখনো পূর্ণতা লাভ করেনি, যদিও বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে এ-বিষয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে আসছে। **Young** এবং

Helmholtz নামক বিজ্ঞানিদ্বয় কল্পনা করেন, সাদা আলোর বর্ণালীমধ্যে নানা রঙের সমাবেশ থাকলেও বর্ণ মূলতঃ তিনটি, লাল, সবুজ ও নীল। বিজ্ঞানের ভাষায় এই বর্ণত্রয়কে বলা হয় primary colours (red, green and blue)। বাকী রঙগুলি এইসব রঙের এক-একটা সংমিশ্রণ মাত্র।

বর্ণতত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে, কোনো বস্তুকে রঙীন দেখায় আলোকের গুণে। বস্তুটির উপর আপতিত আলোকরশ্মি ঐ বস্তুর সংস্পর্শে এসে প্রতিফলিত, প্রতিসরিত, বিচ্ছুরিত হয়। এরূপ ঘটনার ফলে বস্তুনির্গত রশ্মিতে বিদ্যমান থাকে বিশেষ বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক। সেই আলোক চক্ষুগোলকের মধ্য দিয়ে রেটিনা নামক চোখের আভ্যন্তরীণ পর্দায় উপনীত হয় এবং বিচিত্র উপায়ে এক বা একাধিক বর্ণের অনুভূতি সৃষ্টি করে। পূর্বোক্ত বিজ্ঞানিদ্বয়ের অভিমত অনুযায়ী, ঐ রেটিনায় থাকে তিন রকমের স্নায়ুগুচ্ছ। তাদের কোনোটি লাল রঙের সংকেতবাহক, কোনোটি সবুজের, কোনোটি নীল রঙের। সঠিক কোন্ কারণে স্নায়ুগুচ্ছত্রয়ের এই গুণগত তারতম্য তা নিরূপণ করা কঠিন। রেটিনাকে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে বহু কোষের এবং rods, cones ইত্যাদি অংশবিশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে সত্য, কিন্তু অনুভূতি-প্রবণতার মূল কারণ, বর্ণবোধ বা colour vision-এর প্রকৃত প্রক্রিয়া, রেটিনার অন্তর্গত pigment-সমূহের photo-chemical behaviour এ-সব অনেকটাই রহস্যাবৃত।

যাই হোক, বর্ণ সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এটি কোনো বস্তুর লেবেল-আঁটা পরিচয়বাহক নয়। বস্তুটির উপর কেমন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (বা স্পন্দনভঙ্গির) আলোক আপতিত হচ্ছে এবং কেমন আলোকতরঙ্গ বস্তুটির দেহ থেকে নির্গত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে বস্তুটির বর্ণ বা দৃশ্যমান রঙ। সাদা আলোকে জবাফুলটি লাল দেখায়। তার কারণ, সাদা আলোকে অবস্থিত বিভিন্ন রঙের আলোর মধ্যে লাল ব্যতীত অন্য সব রঙের আলো শোষণ করে নেয় জবাফুল, ছেড়ে দেয় শুধু লাল আলোটুকু। তাই পুষ্পটিকে আমরা লোহিতবর্ণ দেখি। কিন্তু সেই ফুলের উপর যদি হলুদ রঙের আলোক ফেলা হয় তাহলে যেহেতু হলুদ আলোর মধ্যে লাল আলো নেই সেজন্য হলুদ আলোটুকু ফুলে শোষিত হয়ে যাবার পর তা থেকে নির্গত হবার মতো কোনো রঙের আলোই অবশিষ্ট থাকবে না। জবাফুলটি তখন দেখাবে সম্পূর্ণ কালো। সবুজ ঘাস অথবা নীল ফুল একই কারণে লাল আলোয় দেখাবে কালো। বর্ণতত্ত্ব অনুযায়ী, বর্ণালোকের অভাব মানেই কালো-অন্ধকার।

বর্ণবৈচিত্র্য সম্বন্ধে বহু উদাহরণ উপস্থিত করা যায় যেগুলি আমাদের সুপরিচিত অথচ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নীলাভ আকাশ কার না চোখে পড়ে? কিন্তু ঐ আকাশ কেন নীল দেখায় তা ভাবতে গিয়ে এসে পড়ে অনেক বিজ্ঞানকথা। বিজ্ঞানিগণ বলেন, আলোকের বিচ্ছুরণ (scattering) ঘটে। পৃথিবীর পরিমণ্ডলে অবস্থিত অসংখ্য বস্তুকণার সংস্পর্শে এসে আপতিত রশ্মি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে-পড়াটার পরিমাণ নির্ভর করে আগত আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর। বিজ্ঞানী র‍্যালে সাহেব (Raleigh) এ-সম্পর্কে একটা সূত্র উদ্ভাবন করেন। তাঁর মতে তরঙ্গদৈর্ঘ্য যতো ছোট হয় তত বেশী ঘটে তার বিচ্ছুরণ। এখন লাল আলোকের তুলনায় নীল আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক কম। সুতরাং নীল আলো তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী পরিমাণে বিচ্ছুরিত হবে এবং সেই কারণে আকাশ দেখাবে নীলাভ।

কোনো বস্তুর উপর আলোকের আপতন ঘটলে শুধু যে বস্তুটি আলোকিত হয় তা নয়, আরো যে কতো কি পরিবর্তন সাধিত হয়, তার ইয়ত্তা নেই। সেই পরিবর্তনের সবটুকু চোখে পড়ে না, কিন্তু তার পরিচয় পাওয়া যায় নানাভাবে। এমন অনেক পদার্থ আছে যার উপর একরকম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকপাতের ফলে তা থেকে নির্গত হয় অন্যরকম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো (কুইনাইন-গোলা জল তার উদাহরণ)। বেরিয়াম সল্টের (barium salt-এর) উপর অদৃশ্য আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি আপতিত হলে বস্তুটিতে বর্ণময় আলোক সৃষ্ট হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এরূপ ঘটনাকে বলা হয় fluorescence।

ঘড়ির ডায়েলের (dial-এর) উপর বেরিয়ম সাল্ফাইড নামক একরকম রাসায়নিক পদার্থ মাখিয়ে রাখলে অন্ধকারেও ঐ ডায়েল স্পষ্ট দেখা যায়। প্রচলিত কথায় বলা হয় 'রেডিয়ম ডায়েল'। কিন্তু কণামাত্র রেডিয়ম থাকে না ঐ ডায়েলে। আসলে যা ঘটে তা হচ্ছে ঐ রাসায়নিক পদার্থের অণুসমূহ আলোকের আপতনকালে এতোই বিচলিত হয় যে আলোকের উৎস অপসারিত হবার পরেও অণু-চঞ্চলতার রেশ থেকে যায় এবং তার ফলে আলোকরশ্মি নির্গত হতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে। ইংরেজিতে এই ঘটনাকে বলা হয় after glow অর্থাৎ 'পরক্ষণের আভা।' আজকাল অনেক paint বা রঙে রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে এরূপ রঙবাহার সৃষ্টি করা হয় যার ফলে ঐ রঙ-মাখানো বস্তুটি অন্ধকারেও জলন্ত দেখায়।

এক কথায় এ-সব হচ্ছে আলোকের খেলা। সেই খেলার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হচ্ছে আলোকতত্ত্ব যা দিয়ে বোধগম্য হয় আলোকের তরঙ্গপ্রকৃতি। কিসের তরঙ্গ?

কেমন তরঙ্গ ? জিজ্ঞাসু মনে এ-সব প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এককালে বিজ্ঞানিগণ ভাবতেন সর্বব্যাপী 'ঈথরে'র (aether-এর) কথা। আলোকের তরঙ্গ উদ্ভূত হয় ঈথরমধ্যে এবং তার স্পন্দন ঈথর-মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, এই ছিল তখনকার ধারণা। পরবর্তী কালে ঈথর-কল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছে। তার স্থলে এসেছে ক্ষেত্র-তরঙ্গের ধারণা। বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের এবং তৎসম্পর্কিত চুম্বক-ক্ষেত্রের পৌনঃপুনিক পরিবর্তনের অপর নাম স্পন্দন। পরিবর্তন-সূচক সেই স্পন্দন যদি তরঙ্গের ন্যায় অগ্রসর হতে থাকে তাহলে বলা হয় ক্ষেত্র-তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। শূন্যস্থানেও সেই প্রবাহ ধাবমান থাকতে পারে। আলোক-তরঙ্গ, তাপ-তরঙ্গ, বেতার-তরঙ্গ ইত্যাদি তার উদাহরণ। এ-সবই হচ্ছে **electromagnetic waves**, পার্থক্য শুধু তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যে।

স্যার আইজাক নিউটন বিজ্ঞানজগতে এক প্রতিভাধর ব্যক্তি। শুধু গণিতে নয়, পদার্থ-বিজ্ঞানেও তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর কল্পনাশক্তি ও দূরদর্শিতার ফলে একাধিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল, অতিদ্রুত ধাবমান অসংখ্য আলোককণার সমষ্টি হচ্ছে আলোক-রশ্মি। ঝাঁকে ঝাঁকে সেই কণাসমূহ কোনো বস্তুর উপর আপতিত হয়ে বস্তুটিকে আলোকিত করে। প্রতিফলনের সময় সেগুলি বস্তুগাত্র থেকে ঠিক্‌রে আসে, প্রতিফলনের সময় বস্তুটির অভ্যন্তর ভেদ ক'রে নির্গত হয়ে যায়। এই মতবাদ **corpuscular theory of light** নামে পরিচিত। এই তত্ত্বের সাহায্যে আলোকের সরলরেখাগতি, ছায়াপাত, জ্যামিতিক ছবি গঠন ইত্যাদি ব্যাপার সহজেই ব্যাখ্যাপ্রদত্ত হয়। সেই কারণে নিউটন-সমর্থিত আলোককণাতত্ত্বের কোনো বিকল্প সহসা স্বীকৃতি লাভ করেনি। **Huygens** নামক এক বিজ্ঞানী ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে আলোকের তরঙ্গপ্রকৃতি নিয়ে একটা তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেও নিউটনের কণাতত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়েছিল অনেক পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অভিমতের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবশালী হচ্ছে পরীক্ষণ-লব্ধ তথ্যরাজি। ঘনতর মাধ্যমে প্রতিসরিত হবার পথে আলোকের বেগ বাড়ে না কমে এই প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে একটা চূড়ান্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় কণা-তত্ত্ব ও তার বিকল্প তরঙ্গ-তত্ত্বকে। প্রথম তত্ত্ব অনুযায়ী ঘনতর মাধ্যমে আলোক-বেগ বাড়বে, দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুযায়ী বেগ কমবে। বাস্তব পরীক্ষায় দেখা যায় লব্ধ ফল দ্বিতীয়টির অনুকূলে। শুধু তাই নয়, আলোক-বেগ কতোটুকু কমবে তাও নির্ধারণ করা যায় আঙ্কিক নিয়মে।

এছাড়া, আরো কয়েকটি পরীক্ষণ-লব্ধ ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। Thomas Young নামক এক বিজ্ঞানী ১৮০১ খৃষ্টাব্দে একটি চমৎকার পরীক্ষার সাহায্যে প্রদর্শন করেন আলোকের interference বা ব্যতিচার (ব্যতিচার শব্দটি কিঞ্চিৎ অপরিচিত, এর সরলার্থ হচ্ছে একের উপর অন্যের ফল-প্রভাব)। দুটি সর্বসম (সব দিক্ দিয়ে একরকম) উৎসবিন্দু থেকে নির্গত আলোক দূরবর্তী পর্দায় আলো-আঁধার সৃষ্টি করতে পারে। ডোরা দাগ-কাটা এরূপ আলো-আঁধার রচনাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় interference fringes। এগুলি তৈরি হয় সুনির্দিষ্ট ব্যবধানে। এদের পরিমাপ (একটা দাগ থেকে পরবর্তী দাগের দূরত্ব ইত্যাদি) থেকে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। আলোক যদি কণাবৎ হয় তাহলে একটি আলোককণা অপর একটি কণার অতিচারে বা আঘাতে অন্ধকার সৃষ্টি করবে কেন? কিন্তু আলোক যদি তরঙ্গবৎ হয় তাহলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে যখন উক্ত উৎসদ্বয় থেকে নির্গত তরঙ্গ কোনো দূরবর্তী বিন্দুতে পরস্পর বিপরীতমুখী স্পন্দনভঙ্গিতে উপস্থিত হবে অর্থাৎ একটির ফল অন্যটির ফলকে বিনষ্ট করে দেবে। এহেন অবস্থায় বিন্দুটি আলোকবিহীন হয়ে যাওয়ায় অন্ধকার দেখাবে। অনুরূপে যে-বিন্দুতে দুইয়ের ফল একমুখী সেখানে উজ্জ্বলতর আলোক প্রতিভাত হবে। সুতরাং এরূপ interference-এর ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করে আলোকের তরঙ্গতত্ত্বকে।

আলোকের diffraction হচ্ছে আরেকটি ঘটনা যার ব্যাখ্যা কণাতত্ত্ব দিয়ে মেলে না। কোনো উৎসবিন্দুর সামনে একটা অস্বচ্ছ বস্তু রাখলে উৎসনির্গত আলোক ঐ বস্তুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দূরে একটা জ্যামিতিক ছায়া উৎপন্ন করবে, এটাই আলোকের রেখাগতি ও কণা-তত্ত্বের প্রত্যাশা। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায়, বাধাটি ক্ষুরধার (sharp edge) হলে অনেক ক্ষেত্রে আলোকরশ্মি ঐ বাধার প্রান্ত-দেশ অতিক্রম করে (অর্থাৎ বাধা টপ্‌কে) দূরের পর্দায় আলোকন সৃষ্টি করে এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে ডোরা-দাগ (fringes) দেখা যায়। একটা সূচি-ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আগত সূর্যালোকের সামনে একটা coin (গোলাকার চাকৃতি) রাখলে একটু দূর পর্দায় গোলাকার ছায়া দেখা যায় বটে, কিন্তু ঐ ছায়ার মধ্যবিন্দুতে আশ্চর্যজনক ভাবে দেখা যায় একটি আলোকবিন্দু। ছায়ার মধ্যে এরূপ আলোকবিন্দু কিভাবে উৎপন্ন হয়? এক্ষেত্রেও কি অস্বচ্ছ বাধার পরিসীমা উল্লঙ্ঘন করে আলোকরশ্মি এগিয়ে এসেছে? আলোক যদি তরঙ্গবৎ না হয় তাহলে এরূপ ঘটনা ঘটবে কেমন করে?

পর্যবেক্ষণ-লব্ধ এইসব তথ্য আলোকের কণা-তত্ত্বকে স্তিমিত করে দিয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তরঙ্গ-তত্ত্ব রাতারাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিসের তরঙ্গ ও কেমন তরঙ্গ এ-নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অন্ত ছিল না অনেক দিন। পরিশেষে শূন্য মাধ্যমে ক্ষেত্রতরঙ্গের অস্তিত্ব ও বিস্তার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে বিগত শতাব্দীর প্রায় শেষ দিকে। ম্যাক্সওয়েল সাহেবের প্রতিভা-স্পর্শে তরঙ্গ-কল্পনা একদিকে যেমন গণিত-তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে অন্যদিকে তেমনি বিদ্যুৎ-চুম্বক-ক্ষেত্রতরঙ্গ ও আলোক-তরঙ্গের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয় বিজ্ঞানী হার্জের পরীক্ষণ-সহায়ে। শক্তি তরঙ্গবাহিত হয়ে স্থানান্তরিত হতে পারে এ-ধারণা তারই ফলশ্রুতি।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও জানার যেন শেষ নেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো কথাই যে শেষ কথা নয় তার প্রমাণ মিলেছে বারংবার। আলোকতত্ত্বের বেলাতেও ঘটেছিল তাই। আপাতদৃষ্টে অকিঞ্চিৎকর কোনো ঘটনা কতো যে চিন্তাসঙ্কট উপস্থিত করে তার এক দৃষ্টান্ত হচ্ছে photoelectric effect বা আলোক-সংঘাতের ফলে বিদ্যুৎ-নির্গমন। একটা ধাতুনির্মিত পাতের (metal plate-এর) উপর আলোকরশ্মি আপতিত হলে দেখা যায়, ঐ ধাতব বস্তু থেকে নির্গত হচ্ছে ইলেক্ট্রনের ঝাঁক। যে-কোনো রকমের আলো ফেললে যে এমন ঘটবে তা নয়। প্রত্যেক ধাতুর জন্য একটা নিম্নতম কম্পনাঙ্ক (frequency) চিহ্নিত আছে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে threshold frequency. তার চেয়ে বেশী কম্পনাঙ্কের (higher frequency-র) আলোক ধাতুটির উপর আপতিত হলে তবেই ঐ ধাতুগাত্র থেকে ইলেক্ট্রন-নির্গমন সম্ভব হয়, নতুবা নয়। অনুমান করা যায়, অলোক শক্তির একটা অংশ ধাতুটির উপর আঘাত হেনে বস্তুস্থিত ইলেক্ট্রনসমূহের একাংশকে বাস্তুচ্যুত করে এবং তারা গতিসম্পন্নতা লাভপূর্বক বাইরে আসতে থাকে। সুতরাং বুঝতে হবে এক্ষেত্রে আলোকশক্তির একাংশ রূপান্তরিত হচ্ছে বিদ্যুৎশক্তিতে।

আধুনিক বিজ্ঞানের কলাকৌশল সহায়ে ইলেক্ট্রনের গতি-সম্পন্নতা নিরূপণ করা যায়। অতএব নির্গত ইলেক্ট্রনের গতি বা শক্তি সেইভাবে মেপে দেখা যেতে পারে। যদি ধাতব বস্তুটির উপর জোর আলো অর্থাৎ more intense light ফেলা হয় তাহলে নির্গত ইলেক্ট্রনসমূহ অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হবে, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু বাস্তব পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, এরূপ কোনো হেরফের ঘটে না, অর্থাৎ একই রঙের (কম্পনাঙ্কের বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের) আলো, তার প্রাবল্য যাই হোক না কেন, একই শক্তিসম্পন্ন ইলেক্ট্রন নির্গত করে থাকে।

রঙবেরঙের অর্থাৎ বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের আলো একটা ধাতব চাক্তির উপর ফেলে ভালভাবে পরীক্ষা অন্তে আরো দেখা যায়, নির্গত ইলেক্‌ট্রনসমূহের গতিসম্পন্নতা (সেই কারণে তাদের শক্তি) নির্ভর করে আপতিত আলোর কম্পনাঙ্ক অর্থাৎ তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর। লাল আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশী, বেগুনীর কম। পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, ধাতুদেহনির্গত ইলেক্‌ট্রনের শক্তি (energy) প্রথম ক্ষেত্রে কম, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বেশী। একেবারে বিপরীত অনুপাত। তরঙ্গদৈর্ঘ্য যতো বাড়বে, নির্গত ইলেক্‌ট্রনের শক্তি ততো কমবে।

কেন এমন হয়, এ-প্রশ্নের সদুত্তর আলোকের তরঙ্গতত্ত্বে মেলে না। তবে কি আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে নূতনতর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে? পরীক্ষা-লব্ধ ফলে কৃতনিশ্চয় হয়ে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ একটা সঙ্কটে উপস্থিত হয়েছিলেন আলোকের স্বরূপ নির্ণয়ে।

ইতিমধ্যে শক্তিপ্রবাহ সম্বন্ধে একটা নূতন ধারণা সৃষ্টি করেন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক (Max Planck, 1858—1947)। তিনি বিখ্যাত কোয়াণ্টাম তত্ত্বের উদ্ভাবক। শক্তিপ্রবাহ একটানা ঘটে না, তা ঘটে ঝাঁকে ঝাঁকে। শক্তি-প্রবাহের একটা ন্যূনতম পরিমাণ আছে যেটি নির্ভর করে বিকিরণের কম্পনাঙ্কের অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর। এই হচ্ছে ঐ তত্ত্বের মূলকথা।

আলোক-বিকিরণের ক্ষেত্রে কোয়াণ্টাম-নীতি প্রযোজ্য, এই অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল আলোক-কণিকার নূতনতর ধারণাটি। এরূপ কণিকার বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয় 'ফোটন' (photon) যার মধ্যে সূচিত হয়েছে আলোক-সম্পর্কিত নবতর কণা-তত্ত্ব। একযুগে নিউটন কল্পনা করেছিলেন আলোকের কণাবৎ আচরণ। কিন্তু তাঁর চিন্তাপ্রসূত কণা বা corpuscle-এর সঙ্গে এ-যুগের আলোক-কণিকার বা photon-এর পার্থক্য আছে অনেক। তবু নীতিগত বিচারে বলা যায়, উভয়বিধ তত্ত্বের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে, আছে আলোকের কণিকা-প্রবৃত্তি উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা।

প্রশ্ন ওঠে, আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোককে তাহলে কি বলা যায়, কণা না তরঙ্গ? কতকগুলি ঘটনার যথা interference, diffraction ইত্যাদির ব্যাখ্যা মেলে আলোকের তরঙ্গবৎ আচরণে, আবার কোনো কোনো ঘটনা যথা photoelectric effect ইত্যাদিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে ধরতে হয় আলোকের কণাবৎ আচরণ। আলোকের এই দ্বিবিধ আচরণ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী। অথচ কোনোটাই তো অবজ্ঞা করা চলে না। এহেন চিন্তা-সঙ্কট নিরসনকল্পে

বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানিগণ উপনীত হয়েছিলেন তত্ত্বসমূহের গভীরতর প্রদেশে। একটা মৌলিক প্রশ্নের উদয় হয়েছিল তাঁদের মনে, বাস্তবের অন্তর্নিহিত সত্য (truth behind reality) কি সকল সময় একটা ছকেই (system-এ) নিরূপিত হতে পারে? নাকি একই সত্তার একাধিক মডেল বিদ্যমান? শক্তিকণা কি পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো কণিকারূপে, কখনো তরঙ্গরূপে প্রতিভাত হতে পারে? যদি এরূপ দ্বৈত আচরণ প্রকাশ পায়, তাতে ক্ষতি কি? এমনও তো হতে পারে যে, কণিকাসত্তা ও তরঙ্গসত্তা পরস্পর পরিপূরক এবং দুয়ে মিলে সম্পূর্ণতা।

বিজ্ঞানী Niels Bohr কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব বিস্তার প্রসঙ্গে একটি শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন যার নাম complementarity বা পরিপূরকতা। একৈক মডেলের চিন্তা-সংকীর্ণতা পরিত্যাগপূর্বক একাধিক মডেলকে যদি বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচায়ক-রূপে গ্রহণ করা যায় এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি যদি বিজ্ঞানদর্শনে একটা পরিবর্তন এনে দেয়, সর্বোপরি যদি সেইভাবে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে সেরূপ চিন্তা-ভাবনা বর্জনীয় হবে কেন?

ইলেকট্রন নামক তড়িৎ-কণা, ফোটন নামক আলোক-কণা আজ আধুনিক বিজ্ঞানে দ্বৈতসত্তায় প্রতিষ্ঠিত। তরঙ্গ ও কণিকার মধ্যে বিরোধ বিদূরিত হয়েছে এবং আলোক-তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব ও পদার্থ-তত্ত্বের মধ্যে রচিত হয়েছে চমৎকার এক বৈজ্ঞানিক সূত্র।

১২

বিদ্যুৎ

—বিদ্যুৎ চুম্বক সম্পর্কিত ঘটনাবলী—

আধুনিক জীবনযাপনে বিদ্যুতের ব্যবহার এতোই ব্যাপক যে, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অল্পবিস্তর জ্ঞানসঞ্চয় সচেতন মানুষের পক্ষে প্রায় অপরিহার্য। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জটিল ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সকলকে অবহিত থাকতে হবে। সেটি সম্ভবপর নয়, তার প্রয়োজনও নেই। বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিদ্যার প্রয়োগ আজ শুধু পদার্থবিজ্ঞানে নিবদ্ধ নয়, জীববিদ্যা, জীবনবিজ্ঞান, মনস্তত্ব ইত্যাদি বিষয়েও ঐ বিদ্যা অনেকখানি ছড়িয়ে পড়েছে। এইসব বিবরণ চমক্‌প্রদ, সন্দেহ নেই। কিন্তু যন্ত্রসাফল্যে চমৎকৃত বা অভিভূত হওয়া এক কথা, আর এইসব বিস্তারিতের অন্তরালে অবস্থিত জ্ঞানবিকাশের পথরেখা ধরে চলতে প্রবৃত্ত হওয়া আর এক কথা। শেষোক্ত পথেই সায়েন্সের অভ্যুদয়, বুদ্ধিযুক্ত মানুষের জয়যাত্রা।

গ্রন্থের প্রারম্ভে জনৈক জিজ্ঞাসু ব্যক্তির উল্লেখ করেছিলাম যিনি বিজ্ঞানকে বুঝতে চান সাধারণ বুদ্ধি সহায়ে এবং প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে চান উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে। তাঁকে আবার উপস্থিত করছি বর্তমান প্রসঙ্গে। বিদ্যুৎ-বিষয়ে তাঁর প্রথম জিজ্ঞাসা, এটি আসলে কী, একে কি চোখে দেখা যায়? প্রশ্নটির প্রথমাংশের উত্তর দিতে গিয়ে একটু ইতস্ততঃ বোধ করেছি, কেননা বিজ্ঞানিগণ আজও সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না, what electricity is অর্থাৎ একটা ইলেকট্রিক চার্জ প্রকৃতপক্ষে কী? কোনো বস্তু বিদ্যুতাবিষ্ট হলে কি হয়, তা অবশ্য বলা যায়। কোনো তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে কি ঘটে তাও দেখা যায়। কিন্তু বিদ্যুৎ নিজে কী তা সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না। নেতি-বিচারে অবশ্য বলা চলে, বিদ্যুৎ ইট-কাঠ-পাথরের মতো কোনো জড়বস্তু নয়, তার না আছে ভর, না আছে আয়তন। অথচ এটির উপস্থিতি একটা সুদূরব্যাপী ক্ষেত্র রচনা করে, ক্ষেত্রস্থিত অপর একটা চার্জের উপর বা দূরস্থিত চুম্বকের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই প্রভাব নির্দিষ্টভাবে পরিমাপযোগ্য।

বিদ্যুৎ কি চোখে দেখা যায়, এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর 'না'। সেকি কথা? আকাশে মেঘের ঘনঘটায় বিদ্যুতের চমক্ কে না দেখেছে? প্রচণ্ড বিদ্যুৎ স্ফুরণে ক্ষণেকের জন্য ধরণী আলোকিত হয়ে ওঠে, বজ্রপাত হয়, এ দৃশ্য তো অতি প্রত্যক্ষ!

ঘরে ঘরে ইলেকৃট্রিকের সুইচ অফ্ করার সময় বিদ্যুতের ফিন্‌কি দেখা যায় না কি ? এ-সব যদি বিদ্যুৎ না হয় তাহলে কি দেখার কোনো ভুল হচ্ছে ?

উত্তরে বলা যায়, ভুল হচ্ছে বৈকি। যা দেখা যায় তা হচ্ছে বিদ্যুতের স্ফুরণ-জনিত spark বা স্ফুলিঙ্গ, সাময়িক বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে উৎপন্ন ঝিলিক। প্রদীপের জলন্ত শিখাকে আলোক বলাটা যেমন ভ্রান্ত তেমনি বিদ্যুৎপ্রবাহসৃষ্ট স্ফুলিঙ্গকে বিদ্যুৎ নামে অভিহিত করাটা ভুল। আলোক নিজে অদৃশ্য থেকে যেমন অপরকে দৃশ্যমান করে তোলে তেমনি বিদ্যুৎ নিজে অদৃশ্য থেকে নানা ঘটনা ঘটায়।

তবে কি বিদ্যুৎ শক্তি বিশেষ ? তাই-বা বলা যায় কেমন করে ? Electrical energy বা বিদ্যুৎশক্তি এবং electric charge বা বিদ্যুৎপুঞ্জ তো এক কথা নয়। শক্তির একক হচ্ছে আর্গ (erg), আর বিদ্যুৎ-পরিমাণের একক হচ্ছে কুলোম্ব (coulomb)*। এ দুটি এককের মধ্যে ভিন্নতা অবশ্যই আছে। তাদের মাত্রা বা dimensionও এক নয়। সুতরাং বুঝতে হবে বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎজনিত শক্তির মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য বিদ্যমান।

এ-বিষয়ে চুল-চেরা বিচার যাই হোক না কেন, সাধারণভাবে বিদ্যুৎকে শক্তি ব'লে ভাবতে বা চিহ্নিত করতে আমরা অভ্যস্ত। যেখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেই স্থানকে প্রচলিত ভাষায় বলা হয় 'শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র'। অনুরূপভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে বলা হয় Energy Supply System, অথবা Power Supply System, যদিও energy ও power নামক শব্দ দুটি বিজ্ঞানের অভিধানে সমার্থক নয়। শক্তি যে হারে ব্যয়িত বা ক্ষয়িত হয় তার সূচক হচ্ছে power, এবং এর এককের নাম watt.

বর্তমান 'লোড শেডিং'-এর যুগে মেগাওয়াট শব্দটি প্রায়শঃ উচ্চারিত হতে শোনা যায়। 'মেগা' কথাটির মানে কোনো কিছুর দশ-লক্ষ গুণ (১০^{৬})। অতএব এক মেগাওয়াট অর্থে বুঝতে হবে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের এমন একটা শক্তিসম্পন্নতা যার

---

* 'কুলোম্ব' নামক একক'টি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী C. A. Coulomb (1736-1806)-এর নাম অনুযায়ী প্রচলিত। বিদ্যুৎবাহী কোনো কুণ্ডলী (circuit) মধ্যে যদি এক অ্যাম্পিয়র (ampere) পরিমিত বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে তাহলে ঐ কুণ্ডলীতে প্রতি সেকেণ্ডে যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাই হচ্ছে ১ কুলোম্ব।

ফলে প্রতি সেকেণ্ডে দশ লক্ষ কুলোম্ব বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে ১ ভোল্ট বিভব পার্থক্যে ।*

বিভব-পার্থক্যের ইংরেজি নাম **potential difference,** সংক্ষেপে **p.d.** টর্চের আলো জ্বালানোর জন্য আমরা যে 'সেল' (**cell**) ব্যবহার করে থাকি তাকে চলতি ভাষায় বলা হয় battery, কিন্তু ব্যাটারী হচ্ছে cell-এর সমষ্টি এবং ইংরেজি cell শব্দের বাংলা নাম তড়িৎ-কোষ অর্থাৎ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের উৎস। সচরাচর-ব্যবহৃত cell বা কোষের বিভব-পার্থক্য থাকে দেড় ভোল্ট (1·5 volt)। একাধিক cell-কে বিশেষভাবে সাজালে আমরা পাই ব্যাটারী।

বিভব বা বিভব-পার্থক্যের ধারণাটি ক্ষেত্রবিষয়ক কল্পনার সঙ্গে জড়িত। বিভব অর্থে ক্ষেত্রমধ্যে কোনও বিন্দুর অবস্থানগত গুণসম্পন্নতা। পরস্পর সন্নিহিত দুটি বিন্দুর বিভব-পার্থক্যের হার দিয়ে নিরূপিত হয় ঐ বিন্দুতে ক্ষেত্রবল (calculas-এর ভাষায় $\frac{dv}{dx} = -F$)। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কোনো বিন্দুতে অবস্থিত একটি বিদ্যুৎপুঞ্জ যার পরিমাণ হচ্ছে q। সেই বিদ্যুৎপুঞ্জের প্রভাবে বিন্দুটির চতুর্দিকে সৃষ্ট হবে একটি বিদ্যুৎক্ষেত্র, যার ফলে q থেকে দূরে যে-কোনো বিন্দুতে একটা অনুরূপ বিদ্যুৎপুঞ্জ q´ রাখলে তাদের মধ্যে বিকর্ষণজনিত বল অনুভূত হবে। এই বলের পরিমাণ নির্ভর করে q, q´ ও তাদের মধ্যে দূরত্ব r-এর উপর। আর নির্ভর করে মাধ্যমের প্রকৃতির উপর। ($F = \frac{k\,q\,q'}{r^2}$, কুলোম্ব সূত্র)

কেন এরূপ বিকর্ষণ ঘটে, এ প্রশ্নের সদুত্তর পাবার চেষ্টা করে গেছেন তাবৎ বৈজ্ঞানিকবৃন্দ। মাধ্যাকর্ষণের বেলায় যেমন দুটি জড়কণার মধ্যে আকর্ষণকে জড়-বস্তুর জড়ধর্মরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল তেমনি বিদ্যুৎপুঞ্জের মধ্যে পারস্পরিক বিকর্ষণ বা আকর্ষণকে ধরা হয়েছিল বিদ্যুতের স্বাভাবিক গুণধর্মরূপে। এটি সঠিক-

---

* (১) অঙ্কের ভাষায়, unit of electrical power = 1 watt = 1 Joule per second $= 10^7$ ergs per second। বিজ্ঞানী James Watt (1736-1819)-এর নাম অনুযায়ী একক'টি চিহ্নিত।

(২) বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের প্রচলিত এককের নাম kilowatt hour বা B T U (Board of Trade Unit)। ঘরবাড়ি বা কলকারখানায় বিদ্যুৎশক্তি খরচের হিসাব হয় ঐ kilowatt hour অনুযায়ী। উদাহরণ, 100 watt একটি ল্যাম্প যদি 10 ঘণ্টা জ্বলে তাহলে $\frac{100 \times 10}{1000} = 1$ unit খরচ হয় বুঝতে হবে।

ভাবে কি কারণে উৎপন্ন হয় সে-বিচার গুরুত্বপূর্ণ কেননা কার্য-কারণ-সম্পর্ক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ধারণাসমূহের সত্যাসত্য নিরূপণের অন্যতম নিয়ামক।

Electric potential বা বিদ্যুৎ-বিভবের ধারণাটি স্পষ্টতর করার জন্য একটা উপমার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। উঁচু লেভেল থেকে নীচু লেভেলে তরল পদার্থ গড়িয়ে যায়। উষ্ণতর বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে তাপ প্রবাহিত হতে থাকে। উচ্চচাপ অবস্থা থেকে গ্যাসকে নিম্নচাপ অবস্থার দিকে ধাবিত হতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে কল্পনা করা যায়, বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় উচ্চাবস্থা থেকে নিম্নাবস্থার দিকে। এই যে অবস্থাবৈষম্য, তারই নাম দেওয়া যেতে পারে বিভব-পার্থক্য।

তবে কি বিদ্যুৎ-বিভবের অস্তিত্ব কেবলমাত্র অবস্থা-বৈষম্যের উপর নির্ভরশীল? তার কি কোনো আত্যন্তিক (absolute) সত্তা নেই? তাপমানের সংজ্ঞানিরূপণের ক্ষেত্রে এরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন বিজ্ঞানিগণ এবং তার উত্তরও খুঁজে পেয়েছেন। তাপমানের absolute value স্থিরীকৃত হয়েছে অণু-চঞ্চলতার সুস্পষ্ট পরিমাপ সহায়ে।

বিদ্যুৎ যদি শুধু চলমান সত্তা হোত, অর্থাৎ একটা কারেন্ট (current) বা প্রবাহের মধ্যেই তার অস্তিত্ব সীমিত থাকত, তাহলে ঐ বিদ্যুৎ চলাচলের কারণ-স্বরূপ 'বিভব-পার্থক্য' সংশয়াতীতভাবে চিহ্নিত হতে পারত। কিন্তু স্থির-বিদ্যুতেরও তো পরিচয় মেলে। একটা ধাতব বস্তুর উপর পুঞ্জীভূত হয়ে স্থির থাকতে পারে বিদ্যুৎ। স্থির-বিদ্যুৎ সমন্বিত আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। এখন বিচার্য, এরূপ একটা charged body বা বিদ্যুতাবিষ্ট বস্তু কি বিদ্যুৎ-বিভব সম্পন্ন হবে না? হবে নিশ্চয়। সেই বিভবের সংজ্ঞা ও পরিমাপ কি ও কেমন, তা জানার আগে স্থির-বিদ্যুৎ সম্বন্ধে স্বল্প পরিচয়লাভ আবশ্যক।

একটা কাচের দণ্ডকে (glass rod-কে) শুকনো সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষলে দেখা যায় ঐ ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। রডটিকে অথবা সিল্কের কাপড়টিকে পৃথক্‌ভাবে ধরলে দেখা যায় তারা টুকরো কাগজ বা ঐরকম হাল্কা বস্তুখণ্ডকে আকর্ষণ করে। অনুরূপভাবে একটা আবলুস কাঠের (বা ইবোনাইটের) রডকে ফ্লানেল বা পশমী কাপড় দিয়ে ঘষলে ঐ রড বা ফ্লানেল পৃথক্‌ভাবে কাগজ-টুকরোকে (হাল্কা বস্তুখণ্ডকে) আকর্ষণ করতে পারে। শীতকালে (যখন আবহাওয়া শুকনো থাকে) চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ানোর সময় চিরুনিটি মাথার চুল বা হাল্কা বস্তুখণ্ডকে আকর্ষণ করছে দেখা যায়। দৃশ্যতঃ এ-সবই ঘর্ষণের ফল। এরূপ ঘটনা স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের দৃষ্টিগোচর হলেও যাঁরা এগুলিকে

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুধাবন করেছেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ গিলবার্টের নাম অগ্রগণ্য। তাঁকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিদ্যুতের জনক নামে অভিহিত করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ঘর্ষ-বিদ্যুৎ বা স্থির-বিদ্যুৎ বিষয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন অনেকে। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন স্থির-বিদ্যুৎ দুই রকমের হয়, একটি পজিটিভ এবং অপরটি নেগেটিভ। দুটি বস্তুর ঘর্ষণের সময় একটিতে উৎপন্ন হয় পজিটিভ, অন্যটিতে নেগেটিভ বিদ্যুৎ। উদাহরণস্বরূপ, কাচ ও সিল্কের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে কাচে + বিদ্যুৎ ও সিল্কে − বিদ্যুতের উদ্ভব ঘটে। ইবোনাইট ও ফ্লানেল-এর মধ্যে ঘর্ষণের ফলে প্রথমটিতে − বিদ্যুৎ ও দ্বিতীয়টিতে + বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

কেন এরূপ একটিতে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে + (যুক্ত), অন্যটিতে − (বিযুক্ত) বলা হবে তার কোনো স্বযুক্তি সেদিন ছিল না, আজও নেই। শুদ্ধ ভাষায় এদের কেন ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বলা যায় তারও কোনো নিশ্চয়াত্মক কারণ নেই। আধিক্য ও স্বল্পতার পরিচায়ক রূপে যথাক্রমে + ও − চিহ্নদ্বয় বিদ্যুতে কিসের আধিক্য ঘটায় সে-ধারণা বিদ্যুৎবিজ্ঞানের প্রথম পর্বে ছিল না বলা চলে। (বিদ্যুতের ইলেক্‌ট্রন তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাপারটা একেবারে উল্টো। কেননা +বিদ্যুৎ মানে ইলেক্‌ট্রনের ঘাটতি, আর −বিদ্যুৎ মানে ইলেক্‌ট্রনের আধিক্য।)

সে যাই হোক, বিদ্যুতের নামকরণের + ও − চিহ্নের ব্যবহার কিছুটা যথেচ্ছ (arbitrary) হলেও সাধারণভাবে বিদ্যুতের ক্রিয়াকলাপ বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। সম-ধর্মী বিদ্যুৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এই মুখ্য তথ্য অবলম্বনে এগিয়ে যাওয়া যায়। আকর্ষণ বিকর্ষণের পরিমাণ এমন একটি সূত্র দিয়ে নিয়মিত যার সঙ্গে মিল আছে মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের। তবে পার্থক্যটুকুও লক্ষণীয়। জড়বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, সেখানে বিকর্ষণের কোনো নজির নেই। কিন্তু বিদ্যুতের বেলায় দুই-ই হতে পারে। কেন এমন হয় তার আত্যন্তিক ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক; কেননা অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক গুণধর্মের কথা বিজ্ঞানে স্বীকৃত।

কোনো বস্তু বিদ্যুৎমণ্ডিত হলে সেটি বিভবযুক্ত হয়। সেই বিভবের অর্থ কি? বুঝতে হবে, বস্তুটি বিদ্যুৎযুক্ত হবার জন্য তার এমন একটি ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে যার ফলে বহিরাগত কোনো সমধর্মী বিদ্যুৎপুঞ্জকে সে ঠেলে দিতে চাইবে। সুতরাং কিছু শক্তি ব্যয় না করলে বাইরের বিদ্যুৎকে বস্তুটির ধারে-কাছে আনা যাবে না। যদি অনুমান করা যায় যে দূরাতিদূর থেকে (from infinite

distance) একটু একটু ক'রে বিদ্যুৎ এনে বস্তুটিকে বিদ্যুৎমণ্ডিত করা হয়েছে, তাহলে সেই প্রক্রিয়ায় মোট যে শক্তি ব্যয়িত হয়েছে তাই হচ্ছে বস্তুটির অর্জিত বিভব। অঙ্কের সাহায্যে এই ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং এইভাবে সংজ্ঞাপ্রদত্ত হলে বিদ্যুৎ-বিভব পরিমাপযোগ্য সত্তায় পরিণত হয়।

বৈদ্যুতিক উচ্চবিভবসম্পন্ন বস্তুর লক্ষণ কি? তদুত্তরে বলা যায়, বিদ্যুৎবাহী কোনো কিছুর সঙ্গে তার সংযোগ হলে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ নির্গত হতে চাইবে। আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন বুঝতে হবে মেঘে ঘর্ষ-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবার ফলে মেঘে এতোই উচ্চবিভব সঞ্জাত হয়েছে যে, সেই মেঘ যেন আর বিদ্যুৎ ধরে রাখতে পারছে না এবং ধরণীতল ও মেঘের মধ্যবর্তী বাতাসের স্তর ভেদ করে ঐ বিদ্যুৎ যেন পৃথিবী-স্পৃষ্ট হয়ে নিঃশেষ হতে চাইছে। বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের বা sparking-এর এই হচ্ছে কারণ।

কেন এমন হয়, আকাশে মেঘে বিদ্যুৎ-সঞ্চারের কারণ কি, কোন্ অবস্থায় বিদ্যুতের চমক সৃষ্ট হয়, সুইচ অফ্ করার সময় সুইচে যে spark দেখা যায় তার সঙ্গে মেঘ-বিদ্যুতের কোনো সাদৃশ্য আছে কিনা এ-সব বিষয় জানতে কৌতূহল হয় বৈকি! সেই কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে একটা উড়ন্ত ঘুড়ির সাহায্যে মেঘ-বিদ্যুতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পেরেছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে একথার প্রমাণ রেখে গেছেন জনৈক রুশ বিজ্ঞানী।

মাত্র ১ সেন্টিমিটার পরিমিত একটা electric spark ঘটাতে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় ৩০,০০০ ভোল্টের উচ্চবিভব প্রয়োজন হয়। সুতরাং আকাশে দীর্ঘাকৃতি বিদ্যুৎচমক তৈরি হতে কতো লক্ষ ভোল্টের প্রয়োজন হয় তা ভাবতে অবাক বোধ হয়। এতো উচ্চবিভব হয় কিভাবে? এককালে বিজ্ঞানিগণ ভাবতেন, মেঘে মেঘে অথবা বায়ুমণ্ডলের কণায় কণায় ঘর্ষণের ফলে এহেন বিদ্যুতের উদ্ভব। বর্তমানে অনেকে অনুমান করেন এটি শুধু ঘর্ষণজনিত নয়, অন্য কারণও বিদ্যমান। মহাকাশ থেকে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর আপতিত হতে থাকে নানাবিধ অতি-জাগতিক রশ্মি। তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাবও ঘটে। সূর্যালোক নির্গত আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির উপস্থিতিও থাকে। এ-সবের সমবেত প্রভাবে সমগ্র পরিমণ্ডল এমনভাবে আয়নযুক্ত (ionised) হয় যে ঐ অবস্থায় সহজেই প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। আকাশে অতি-উচ্চ বিভবের সৃষ্টি সম্ভবতঃ এইসব কারণে।

বিদ্যুৎবিষয়ক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। স্থির-বিদ্যুৎ, চল-বিদ্যুৎ, তাদের

গুণাগুণ, বিশেষতঃ বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যুৎ-চুম্বক সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্য ও তত্ত্বাদির বিবরণ স্বল্প কথায় প্রকাশ করা যায় না। কয়েকটি মুখ্য বিষয়মাত্র বর্তমান অধ্যায়ে আলোচ্য।

বিদ্যুতের ইলেক্‌ট্রন তত্ত্ব

কোনো বস্তুতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলে আগের দিনে ভাবা হোত, বস্তুটির মধ্যে কোনো এক তরল জাতীয় পদার্থের (**fluid**-এর) আবির্ভাব ঘটেছে। অনুমিত হোত, ঐ ফ্লুয়িডটি অদ্ভুত ধরনের, অদৃশ্য, ভরহীন অথচ বস্তুব্যাপী অস্তিত্ব নিয়ে থাকতে পারে। যেহেতু দুই রকমের বিদ্যুৎ, পজিটিভ ও নেগেটিভ, দেখা যায় সেই হেতু পুরাতন যুগে **two-fluid theory** দিয়ে বিদ্যুতের উপস্থিতি ব্যাখ্যাত হোত, একটি পজিটিভ-মার্কা, অপরটি নেগেটিভ-মার্কা। এইসব কল্পনা আজ একান্ত উদ্ভট ও হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু এককালে বিদ্যুতের **fluid**-তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। কেন-না, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সাধারণ ঘটনাবলীর একটা সহজ-সরল ব্যাখ্যা মিলে যেত এর সাহায্যে।

কালক্রমে ঐ মতবাদ পরিত্যক্ত হয়। ইলেক্‌ট্রনের আবিষ্কার বিজ্ঞানচিন্তায় এনে দেয় এক নূতন মোড়। পদার্থতত্ত্ব ও বিদ্যুৎ-তত্ত্ব বহুল পরিমাণে একীকৃত হয়েছে এর দ্বারা, কেন-না পদার্থের অন্যতম মূল কণিকা এবং বিদ্যুতের মূলাধার যে-সত্তায় মিলিত হয়েছে তার নাম ইলেক্‌ট্রন।

কল্পনা করা হয়, নেগেটিভ বিদ্যুৎবাহী ইলেক্‌ট্রন কোনো পদার্থের পরমাণুমধ্যে সুসংবদ্ধ থাকলেও কিছুসংখ্যক ইলেক্‌ট্রন কিঞ্চিৎ আল্‌গা অবস্থায় থাকে। তারা সহজেই স্থানান্তরিত হতে পারে। এগুলিকে বলা হয় **free electron** বা মুক্ত বিদ্যুৎ-কণা। সামান্য উত্তেজনায় এরা যখন দল বেঁধে কোনো দিক্ অনুসরণ ক'রে চলতে থাকে তখন সৃষ্ট হয় বিদ্যুতের একটা প্রবাহ যাকে আমরা বলে থাকি 'কারেণ্ট'।

দুটি বস্তুতে ঘর্ষণের ফলে যখন বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তখন বুঝতে হবে একটা বস্তুর গাত্র থেকে কিছুসংখ্যক ইলেক্‌ট্রন বেরিয়ে এসে অন্য বস্তুতে সংক্রামিত হয়েছে। ফলে প্রথম বস্তুটিতে ঘটেছে ইলেক্‌ট্রনের ঘাটতি অর্থাৎ সেটি তখন পজিটিভ বিদ্যুতাবিষ্ট, আর দ্বিতীয়টিতে হয়েছে ইলেক্‌ট্রনের আধিক্য অর্থাৎ সেটি হয়েছে নেগেটিভ বিদ্যুৎসম্পন্ন।

এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে বিদ্যুৎ চলাচলের ঘটনাও সহজে ব্যাখ্যা করা যায়

ইলেকট্রনতত্ত্ব দিয়ে। বিদ্যুৎবাহিতার লক্ষণ হচ্ছে বিভব-পার্থক্য। উচ্চতাপমানযুক্ত বস্তু থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমানযুক্ত বস্তুতে যেমন তাপ প্রবাহিত হয় তেমনি বিদ্যুতের বেলা উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে ধাবিত হয় বিদ্যুৎ। প্রকৃতপক্ষে চলে ইলেকট্রনের স্রোত। সাধারণতঃ আমরা বলে থাকি, পজিটিভ-বিদ্যুৎপ্রান্ত থেকে বেরিয়ে নেগেটিভ-বিদ্যুৎপ্রান্তে উপনীত হয় বিদ্যুৎ। কিন্তু ইলেকট্রনতত্ত্বের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। কেন-না, নেগেটিভ প্রান্ত থেকেই তো ঘটে ইলেকট্রনের উদ্ভব এবং তারা যায় পজিটিভ প্রান্তের দিকে।

বৈদ্যুতিক আবেশ

বিদ্যুৎযুক্ত কোনো বস্তুতে হাত দিলে বিদ্যুতের অবস্থান্তর ঘটবে, এটা স্বাভাবিক। একটা উত্তম পরিবাহী (good conductor) দিয়ে বস্তুটিকে স্পর্শ করলে তাদের মধ্যে বিদ্যুৎ চলাচল হবে, এটাও স্বাভাবিক। স্পর্শদোষে কতো কি ঘটতে পারে! কিন্তু ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, একটা বিদ্যুৎযুক্ত বস্তু আপন প্রভাবে নিকটবর্তী অন্য একটা পরিবাহী বস্তুতে বিনাস্পর্শে কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে! বিজ্ঞানের ভাষায় এরূপ ঘটনাকে বলা হয় electrostatic induction। এর বিশেষত্ব হচ্ছে, প্রভাবিত (বা আবিষ্ট) বস্তুটিতে দুইপাশে দুইরকম বিদ্যুৎ (প অথবা ন)* উৎপন্ন হয়ে একটা সমতা রক্ষা করে। প্রভাববিস্তারকারী বস্তুতে যদি প-বিদ্যুৎ থাকে তাহলে প্রভাবিত বস্তুর নিকটতর অংশে উৎপন্ন হবে ন-বিদ্যুৎ আর দূরতর অংশে হবে প-বিদ্যুৎ।

ইলেকট্রনতত্ত্ব অনুযায়ী অনুমিত হয়, প্রভাবিত বস্তুটি প্রভাববিস্তারকারী বস্তুর নিকটবর্তী হবার আগে uncharged বা বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ থাকে। কিন্তু প্রভাবিত হবার পর বস্তুটির এক অংশে ইলেকট্রনের আধিক্য ঘটে এবং সেই কারণে অপর অংশে সমপরিমাণ ঘাটতি দেখা যায়। ঐ বস্তুটি যেহেতু উত্তম পরিবাহী সেজন্য এক অংশ থেকে অন্য অংশে ইলেকট্রনের গমনাগমনে কোনো বাধা সৃষ্ট হয় না।

স্থির-বিদ্যুতের এরূপ আবেশ (induction) আপাতদৃষ্টিতে সামান্য হলেও এই ঘটনাকে নানাভাবে কাজে লাগানো যায়। বিদ্যুৎকে সঞ্চিত করে রাখার জন্য condenser-এর ব্যবহার অনেকের কাছে পরিচিত। দুটি ধাতব পাতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি কাচখণ্ড বা অভ্রের পাত রেখে দেওয়া হয়। একটি ধাতব

---

* + বিদ্যুৎ বা পজিটিভ-বিদ্যুতের সংক্ষিপ্ত নাম প-বিদ্যুৎ এবং – বিদ্যুৎ বা নেগেটিভ-বিদ্যুতের সংক্ষিপ্ত নাম ন-বিদ্যুৎ ধরা হয়েছে।

পাত বিদ্যুৎধারণ করে, অন্যটির উপর তার আবেশ সৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় earth-connected বা ধরণীস্পৃষ্ট করে রাখলে প্রথমটির বিদ্যুৎধারণ ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। পাত দুটির আয়তন কমবেশী করে condenserটির capacity কমানো বাড়ানো হয়। মূলতঃ এইরূপ ব্যবস্থা বিদ্যুতের আবেশের উপর নির্ভরশীল।

এছাড়া বিপুল পরিমাণে স্থির-বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের মূলনীতিটিও বিদ্যুতাবেশ সম্পর্কিত। এরূপ একটি যন্ত্রের নাম Van de Graff generator যার সাহায্যে কয়েক লক্ষ ভোল্টের স্থির-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

বিদ্যুৎ ও চুম্বক ঘটিত আবেশ

ঘরে ঘরে বা কলকারখানায় যে-বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর আমরা নির্ভর করে থাকি তার অন্যতম উৎপাদন-ব্যবস্থাও আবেশের বা induction-এর উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের ভাষায় ঐ আবেশকে বলা হয় electromagnetic induction। তার মূলনীতিটির সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে এসে পড়ে চুম্বকের কথা। চুম্বক কাকে বলে? বিভিন্ন গুণধর্ম দিয়ে চুম্বকের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়। একখণ্ড লোহার বা ইস্পাতের শলাকা বিশেষ অবস্থায় অপর একটু লোহাকে টানে অর্থাৎ আকর্ষণ করে। আবার সেই শলাকাটির মাঝখানে একটা সুতো বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে দিলে দেখা যায়, ঝুলন্ত অবস্থায় শলাকাটি একটা নির্দিষ্ট অভিমুখে থাকে। তার মুখটিকে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে আপনা হতেই সেটি পুনরায় আগের অভিমুখে ফিরে যায় এবং সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

পূর্বোক্ত শলাকাটি যে-অবস্থালাভের ফলে এরূপ আচরণ করে তাই হচ্ছে তার চুম্বকত্বের পরিচায়ক। সুতরাং একটা চুম্বকের গুণধর্ম মোটামুটি, (১) লোহা, নিকেল ইত্যাদি চুম্বকপদার্থকে আকর্ষণ করা (২) স্বাধীনভাবে ঝুলতে দিলে একটা নির্দিষ্ট অভিমুখে দাঁড়িয়ে থাকা। তাছাড়া আরেকটি বিশেষ গুণ হচ্ছে, চুম্বককে ভেঙে দুটুকরো করলেও প্রত্যেক টুকরোই সম্পূর্ণ চুম্বকের মতো আচরণ করে।

কেন এমন হয়, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রবেশ করতে হবে চুম্বকতত্ত্বে। সেই তত্ত্বের মূল অনুমান, চুম্বকত্ব অনুস্যূত থাকে চুম্বকের অণুসমূহে অর্থাৎ তার প্রত্যেকটি অণু যেন এক-একটি পূর্ণ চুম্বক। প্রত্যেক চুম্বকের প্রান্তদেশে অবস্থিত থাকে দুটি মেরু (pole)। তাদের একটি উত্তর দিক্, অন্যটি দক্ষিণ দিক্ অভিমুখী। এই উত্তর-দক্ষিণ দিক্ কিন্তু পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ থেকে একটু স্বতন্ত্র, একটু কৌণিক দূরে। অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ লাইন আর চুম্বকের উত্তর-দক্ষিণ লাইন সমান নয়, তাদের মধ্যে এক-এক জায়গায় এক-এক রকম কোণ উৎপন্ন হয়।

বিজ্ঞানিগণ অনুমান করেন পৃথিবীটা যেন এক বিরাট চুম্বক, যার ভৌগোলিক উত্তরমেরুর একটু পশ্চিম ঘেঁষে (প্রচলিত দ্রাঘিমা অনুযায়ী) অবস্থিত আছে ঐ পৃথিবীরূপী চুম্বকের উত্তরমেরু। অনুরূপভাবে ভৌগোলিক দক্ষিণমেরুর একটু পূর্বদিক ঘেঁষে আছে পৃথিবীরূপী চুম্বকের দক্ষিণমেরু। আরো অনুমিত হয়, এই পৃথিবীরূপী বিরাট চুম্বক সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে এবং যাবতীয় চুম্বক পদার্থের উপর অনুক্ষণ প্রভাব বিস্তার করে।

মাটির পৃথিবী কেন চুম্বক-সদৃশ আচরণ করে, কিসের প্রভাবে পার্থিব চুম্বক-ক্ষেত্রের উদ্ভব, সে-বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ অনুমান উপস্থিত করেছেন সত্য, কিন্তু পার্থিব চুম্বকধর্মের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা আজও মেলেনি বলা চলে। কেউ কেউ ভাবেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরে মৃত্তিকা-স্তরের বহু গভীরে যে hard core বা শক্ত আঁঠির মতো আছে সেটাই চুম্বকদণ্ডের কাজ করে। কেউ কেউ অনুমান করেন, পৃথিবীর উপর অবিরত অতি-জাগতিক (cosmic) রশ্মিসমূহ সম্পাতের ফলে চুম্বকত্ব সৃষ্ট হয় কোনো দুর্জ্ঞেয় উপায়ে। তাছাড়া আছে সুনিশ্চিত সৌরপ্রভাব। বাস্তব পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে সৌরদেহে উদ্ভূত sunspot সমূহ (যা সৌরকলঙ্ক নামে খ্যাত) পার্থিব চুম্বকক্ষেত্রে এক-এক সময় দম্‌কা পরিবর্তন ঘটায়। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় magnetic storm বা চুম্বক ঝড়। সাধারণতঃ ১১ বৎসর পর পর এরূপ ঘটনা ঘটে। অনুমিত হয় সূর্যদেহে অত্যুষ্ণ গ্যাসপিণ্ডের মধ্যে নানারকম রাসায়নিক বিস্ফোরণ সদাসর্বদা ঘটতে থাকে। তার ফলে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয় এবং নানাবিধ thermonuclear reaction-এর জন্য প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয়। সেই শক্তির বহিঃপ্রকাশরূপে আমরা পাই তাপ, আলোক ও বহুবিধ বিকিরণ। সৌরদেহের জলন্ত গ্যাসের এক-এক অংশ আবর্তিত হবার সময় এক-একবার পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর হয়, সৌরকলঙ্করূপে। সম্ভবতঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে 'চুম্বক-ঝড়' নামক ঘটনার এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

ভাবলে অবাক বোধ হয় কিরূপে এ-সব ঘটনা সংঘটিত হয়। কোথায় প্রায় ২৫ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বিরাট সূর্য, আর কোথায় পৃথিবীস্থিত একটি ক্ষুদ্রকায় চুম্বকশলাকা ! কিন্তু প্রভাব অতীব প্রত্যক্ষ ! দূরত্ব কোনো অন্তরায় সৃষ্ট করে না। তাই কার্য-কারণ সম্পর্ক সঠিকভাবে জানা না গেলেও 'দূর-প্রভাব' বা action at a distance কি জ্ঞানরাজ্যে, কি বিজ্ঞানরাজ্যে এক বিস্ময়কর অস্তিত্বরূপে পরিগণিত।

সেই সূত্র অবলম্বনে ফিরে আসি induction বা আবেশের কথায়। স্থির-

বিদ্যুৎযুক্ত বস্তু যেমন আবেশ ও ক্ষেত্ররচনা করে তেমনি একটি চুম্বক অপর একটি চুম্বকধর্মী বস্তুর উপর প্রসারিত করে তার প্রভাবক্ষেত্র ও আবেশ। ফলে দ্বিতীয় বস্তুটিতে উৎপন্ন হয় চুম্বকমেরু। একটা N-pole-এর নিকটতর অংশে তৈরি হয় S-pole এবং দূরতর অংশে N-pole.

আবেশের ফলে এরূপ মেরু-উৎপত্তির কারণ খুঁজতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ কল্পনা করেন বল-রেখা বা lines of force-এর সমাবেশ। অনুমিত হয় যে, প্রত্যেক চুম্বকমেরু থেকে নির্গত হয়ে আসে অসংখ্য বল-রেখা এবং ক্ষেত্রস্থিত চুম্বকধর্মী বস্তুর উপর আপতিত হয়ে সেখানে তৈরি করে চুম্বকের মেরু। এই বল-রেখা কেউ কাউকে ছেদ করে না, কিন্তু একটা আঙ্কিক নিয়মে কোথাও ঘন-সন্নিবিষ্ট, কোথাও বিরল হয়ে যায়। আরো কল্পিত হয় যে, বল-রেখাগুলি N-pole থেকে উৎসারিত এবং S-pole-এ অনুপ্রবিষ্ট হয়। একটা চুম্বকের চারিপাশে কেমন চুম্বকক্ষেত্র রচিত হয়ে থাকে তার পরিচয় বহন করে ঐসব বল-রেখা। এই প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখতে হবে পৃথিবীর সবকিছুই পৃথিবীরূপী চুম্বকের ক্ষেত্রমধ্যে অবস্থিত। সুতরাং পার্থিব চুম্বকের প্রভাব থেকে কারও পরিত্রাণ নেই এবং সেই কারণে আপন-ক্ষেত্রকে উপযুক্তভাবে সংহত করে নিতে হয় প্রত্যেক চুম্বককে। বল-রেখার অস্তিত্ব একান্তভাবে কল্পনাপ্রসূত সন্দেহ নেই। তবু ঐ রেখার সাহায্যে ক্ষেত্র ও প্রভাব বিষয়ক অনেক ঘটনা আজও ব্যাখ্যাপ্রদত্ত হয়ে থাকে।

বিদ্যুৎ ও চুম্বক ঘটিত আবেশ প্রসঙ্গে আরো দুরকম আবেশের কথা উল্লেখযোগ্য।

(১) বিদ্যুৎ-প্রবাহজনিত চুম্বকক্ষেত্রের উদ্ভব।

(২) চুম্বকের স্থানপরিবর্তন বা ক্ষেত্রপরিবর্তনজনিত বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি।

প্রথমটির সাহায্যে গড়ে উঠেছে নানাবিধ যন্ত্রের নির্মাণকৌশল। দ্বিতীয়টি অবলম্বনে সফল হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিশাল উদ্যোগ। সেই কারণে এ-দুটি বিষয় বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(১) কোনো তারের মধ্য দিয়ে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে তখন বিদ্যুৎ-প্রভাবে তারটিকে ঘিরে সৃষ্ট হয় একটা চুম্বকক্ষেত্র। ঐ ক্ষেত্রমধ্যে যদি বহিরাগত কোনো চুম্বক-শলাকা রাখা হয় তাহলে দেখা যাবে সেটি ক্ষেত্রের বল-রেখা অভিমুখে ঘুরে যাবে, অর্থাৎ ক্ষেত্রের অস্তিত্ব জানিয়ে দেবে।

বিদ্যুৎবাহী তার-টি যদি কুণ্ডলীর আকারে (coil-এর মতো) রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে সেটিকে লম্বভাবে ভেদ ক'রে কুণ্ডলীর এক পাশ থেকে অন্য-

পাশে প্রসারিত হয়েছে আবেশজনিত চুম্বকক্ষেত্র। কুণ্ডলীটি যেন এক হয়ে গেছে চুম্বকের একটা চাকি যার এক পিঠে উত্তরমেরু অন্য পিঠে দক্ষিণমেরু (N-pole and S-pole)। বিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম magnetic shell।

একটা তার দিয়ে পরপর অনেকগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে লম্বা আকারে সাজিয়ে রাখলে তখন তাকে বলা হয় solenoid, তার মধ্যে কারেণ্ট চালালে (বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিলে) ঐ solenoid-টি একটা লম্বা চুম্বকের মতো আচরণ করবে ; তার এক প্রান্তে N-pole, অন্য প্রান্তে S-pole। এর নাম electromagnet যার মূলকথা হচ্ছে বিদ্যুৎ দিয়ে চুম্বক তৈরি করা। কৃত্রিম উপায়ে চুম্বক তৈরি করার এটি এক চমৎকার নিদর্শন। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে এরূপ electromagnet-এর ব্যবহার খুবই উপযোগী।

(২) দ্বিতীয়োক্ত আবেশের পারিভাষিক নাম electromagnetic induction। একটা তারের কুণ্ডলীর কাছে যদি একটা চুম্বক রাখা যায় এবং চুম্বকটি যদি হঠাৎ সরানো যায় তাহলে দেখা যাবে ঐ কুণ্ডলীর মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্ট হয়েছে। আবেশের ফলে এরূপ প্রবাহের উৎপত্তি বিস্ময়কর কেন-না, চুম্বকের স্থান-পরিবর্তনের সময়টুকুতেই তার অস্তিত্ব ; চুম্বকটি স্থানান্তরিত হয়ে স্থির থাকলে কুণ্ডলীতে কোনো প্রবাহ থাকে না। এই ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহকে বলা হয় induced current। খ্যাতনামা বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯৪—১৮৬৭) এরূপ একটা পরীক্ষার সাহায্যে প্রদর্শন করেন চুম্বকের স্থান-পরিবর্তন বা ক্ষেত্র-পরিবর্তনের সময় দূরস্থিত কোনো কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ঘটনা।

আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটি অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টির বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল ঐ আবিষ্কারের মধ্যে। একটা শক্তিশালী চুম্বকের মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে যদি একটা তারের কুণ্ডলী (coil) রাখা হয় এবং সেই coil-টিকে ঘোরানো যায় তাহলে তার উপর আপতিত চুম্বকক্ষেত্রের মুহুর্মুহু পরিবর্তন ঘটবে এবং তার ফলে ঐ কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হবে, ক্ষেত্রের পরিমাণ (flux-এর) বৃদ্ধির মুখে একদিকে এবং হ্রাসের মুখে বিপরীত দিকে। সুতরাং এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের মুখ-পরিবর্তন হবে ঘন ঘন। coil-টিকে সেকেণ্ডে যতোবার ঘোরানো হবে ততোবার হবে ঐ পরিবর্তনের cycle বা আবর্তন। এজন্য এরূপ প্রবাহকে বলা হয় alternating current বা সংক্ষেপে AC।

এরূপ আবেশের ফলে বিদ্যুৎ-প্রবাহে কতো বিভব (voltage) সৃষ্ট হবে, কোন্ অভিমুখে সেই প্রবাহ চলবে তার একটা নিয়ম আছে। বিজ্ঞানে সেই নিয়মটি

Lenz's Law নামে খ্যাত। মোট কথা, বিদ্যুৎ-উৎপাদনের জন্য আমরা কাজে লাগাতে পারি পদার্থের চুম্বকধর্মজনিত আবেশ-প্রক্রিয়াকে। একটা শক্তিশালী চুম্বকক্ষেত্রে একটি (বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক) coil রেখে তাকে যতো জোরে ঘোরাতে পারা যাবে ততো শক্তিশালী AC পেতে থাকব আমরা। যে-ব্যবস্থার সাহায্যে এ-কাজ করা যায় তাকেই বলে dynamo বা generator।

বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রে চুম্বকক্ষেত্রস্থিত তার-কুণ্ডলীকে প্রবলবেগে ঘোরানোর জন্য দরকার হয় শক্তির। সেই শক্তির জোগান কিভাবে দেওয়া যায় তার উপর কেন্দ্রটির নামকরণ হয় যথা thermal power station বা hydel power station, nuclear power station ইত্যাদি। একটা steam engine দিয়ে রেলগাড়ীর চাকা যখন ঘোরানো হয় তখন শক্তির জ্বালানি বা fuel হচ্ছে কয়লা। কয়লার সাহায্যে জল বাষ্পে পরিণত হচ্ছে, সেই বাষ্প চালনা করছে এঞ্জিনের পিস্টনদণ্ডকে। তাই আমরা বলে থাকি 'কয়লার এঞ্জিন'। ডিজেল-চালিত হলে বলি 'ডিজেল-এঞ্জিন'। আবার বৈদ্যুতিক শক্তিতে রেলগাড়ীর চাকা ঘুরলে বলা হয় ইলেকট্রিক এঞ্জিন। তেমনি, বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রে যখন অত্যুত্তপ্ত গ্যাসকে একটা টারবাইনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাকে ঘূর্ণায়মান রাখা হয় এবং সেই ঘূর্ণনকে কাজে লাগানো হয় আর্মেচার ঘোরানোর জন্য তখন আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি ঐ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের প্রকৃত উৎস হচ্ছে তাপশক্তি, জলপ্রপাতের চাপ সাহায্যে যখন টারবাইন ঘুরতে থাকে এবং তার ফলে আর্মেচারের ঘূর্ণন হয় তখন বিদ্যুৎ-উৎপাদনের প্রকৃত উৎস হচ্ছে জলপ্রপাতজনিত শক্তি। অনুরূপভাবে বলা যায়, ঘূর্ণনশক্তির উৎস যেখানে অণু-শক্তি, সেখানে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কেন্দ্রটি nuclear power station নামে পরিচিত।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানে শক্তি সংরক্ষণের মূলনীতিটিকে। কোনো শক্তি out of nothing বা শূন্য থেকে আসতে পারে না। বিদ্যুৎ-শক্তির যখন আবির্ভাব ঘটানো হয় তখন বুঝতে হবে কোনো-না-কোনো উৎস থেকে সেই শক্তি আহৃত হয়েছে উপযুক্ত প্রযুক্তি সহায়ে। সৌর-শক্তি ও সমুদ্র-শক্তি আপাত-দৃষ্টে অফুরন্ত। তাই বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌গণ চেষ্টা করছেন যাতে ঐ শক্তির সদ্ব্যবহারপূর্বক বিদ্যুতের বিপুল ভাণ্ডার গড়ে তোলা যায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে।

বিদ্যুৎ-কোষ

ঘরবাড়ী, ক্ষেতখামার ও কলকারখানায় ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য যেমন বৃহদায়তন বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের প্রয়োজন, তেমনি সূক্ষ্মতর ও

বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য চাই বিদ্যুৎ-উৎপাদনের সহজসাধ্য ব্যবস্থা। হাতের কাছে টর্চ জ্বালানোর জন্য চাই বিদ্যুৎ-কোষ যার চল্‌তি নাম ব্যাটারী। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-শক্তির উৎস হচ্ছে রাসায়নিক শক্তি। কে না জানে, টর্চের একটা cell-এ থাকে একটা কার্বন রড ও তার চারিদিকে একটা দস্তার পাত এবং তাদের মাঝ-খানে কিছু রাসায়নিক পদার্থ? মোটর গাড়ীতে যে ব্যাটারী ব্যবহৃত হয় তার নাম **storage cell**, বা বিদ্যুৎ জমিয়ে রাখার আধার।

এইসব cell-এ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় কিভাবে? বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কোনো কোনো রাসায়নিক পদার্থকে 'আয়নিত' (**ionise**) করা যায়, যার ফলে প-বিদ্যুৎযুক্ত অংশ ও ন-বিদ্যুৎযুক্ত অংশ কিঞ্চিৎ আল্‌গা হয়ে যায় এবং দুটি বিসম পদার্থের উপস্থিতিতে তারা এক-একটির দিকে ধাবমান হতে থাকে। বিচিত্র পদার্থধর্ম! তাদের উপস্থিতি বা সংস্পর্শ গুণে কতো কি ঘটে প্রকৃতিরাজ্যে তার হিসাব রাখা দুষ্কর!

একটি পাত্রে সালফিউরিক এসিড-গোলা জলে একটি তামার ও একটি দস্তার রড ডুবিয়ে রাখলে এসিড-জলে উৎপন্ন H^{++} আয়নগুলি তামার দিকে ও SO_4^{--} আয়নগুলি দস্তার দিকে কেন ছুটতে থাকে, তার ব্যাখ্যা মূলতঃ পদার্থধর্মের উপর নির্ভরশীল। মৌলিক পরমাণুমধ্যে যেমন + বিদ্যুৎ ও − বিদ্যুতের সমাবেশ, তেমনি যৌগিক অণুমধ্যে অবস্থিত পদার্থাংশ একটি + আয়নে অন্যটি − আয়নে পরিণত হয় বিশেষ প্রক্রিয়ায়। সেই ক্রিয়াশীলতা হচ্ছে বিদ্যুৎ-প্রভবের জনক। রাসায়নিক শক্তিকে সেইভাবে রূপান্তরিত করা যায় বিদ্যুৎ-শক্তিতে। এরূপ রূপান্তরের একটি দৃষ্টান্তস্থল হচ্ছে বিদ্যুৎ-কোষ।

Cell বা কোষ হচ্ছে একটি **common name** বা সাধারণ নাম। যেখানেই বিদ্যুতের বিভব-পার্থক্য সৃষ্টিকারী শক্তির উদ্ভব সেখানেই বুঝতে হবে বিদ্যুৎ-কোষের উৎপত্তি, স্থায়ী বা অস্থায়ী। কতো বিচিত্র উপায়ে বিদ্যুৎ-কোষ উৎপন্ন হয় এবং তাকে কাজে লাগানো যায় তার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে আলোক-বিদ্যুৎ কোষ বা **photoelectric cell.**

কোনো কোনো পদার্থ যথা সেলেনিয়ম (**selenium**) বিশেষভাবে আলোক-সচেতন বা **photosensitive** ঐসব পদার্থের উপর উপযুক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকসম্পাত ঘটলে দেখা যায় ঐ পদার্থ থেকে ইলেক্‌ট্রন নির্গত হচ্ছে। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় আলোকসম্পাত সহায়ে এইভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা যায়। উৎপন্ন প্রবাহের মাত্রা নির্ভর করে আপতিত আলোকের প্রাবল্যের উপর। সুতরাং

আলোকসম্পাতের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহে তারতম্য দেখা যাবে। আলোকশক্তি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হবার এটি এক চমৎকার উদাহরণ। এরূপ photoelectric cell-এর সাহায্যে দূরদূরান্তের দৃশ্যপটকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিণত ক'রে তাকে 'radiophoto' রূপে স্থানান্তরে পাঠানো যায়।

তাপশক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করার একটি উদাহরণ হচ্ছে thermocouple যেটিকে এক অর্থে বিদ্যুৎ-কোষ বলা যায়। দুটি বিভিন্ন ধাতুর তারকে জোড়া দিলে দুটি সংযোগস্থল পাওয়া যায়। সেই সংযোগপ্রান্তদ্বয়ের একটিকে উত্তপ্ত অন্যটিকে শীতল করে রাখলে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে তাপমানের বৈষম্য ঘটালে দেখা যায় ঐ তারযুগলের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্ট হচ্ছে। আবিষ্কর্তা Seebeck (1770—1831)-এর নাম অনুযায়ী এরূপ ঘটনার নাম Seebeck's effect। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টিকারী শক্তির প্রত্যক্ষ উৎস হচ্ছে তাপশক্তি। তার-কুণ্ডলীর মধ্যে যেন জেগে উঠেছে একটা বিদ্যুৎ-কোষ। অনেকগুলো thermocoupleকে ঠিকমতো সাজিয়ে জোড়া দিলে তৈরি হয় thermopile, যার সাহায্যে বিকিরণ-প্রদানকারী কোনো উত্তপ্ত উৎসের তাপমান নির্ণয় করা যায় উত্তপ্ত বস্তুটির গাত্রস্পর্শ না করেও।

বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিদ্যুৎ পরিবাহিতার ধারণাটি। কেন-না, বিদ্যুৎ যদি পরিবাহিত না হয় তাহলে 'কারেন্ট' বা 'প্রবাহ' শব্দটাই তো অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং conductivity বা পরিবাহিতা সম্বন্ধে কিছু কথা জ্ঞাতব্য। পদার্থের কোন্ গুণধর্মের আশ্রয়ে বিদ্যুতের পরিবহণ ঘটে, পদার্থমধ্যে চলবিদ্যুৎ কোনো গতিরোধ বা অবরোধের সম্মুখীন হয় কিনা, এবং এই রোধ বা resistance-এর মাত্রা কিসের উপর নির্ভরশীল, এ-সকল প্রশ্ন তাত্ত্বিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ।

G. S. Ohm (1787—1858) নামক জনৈক বিজ্ঞানী বিদ্যুৎপ্রবাহ সম্পর্কে একটি সরল সূত্র উদ্ভাবন করেন। কোনো বিদ্যুৎবাহী পদার্থের বা conductor-এর মধ্যে দিয়ে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন ঐ পদার্থের জন্য যেটুকু বাধা বা প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয় বিদ্যুৎকে, তার নাম রোধ বা resistance। এই রোধ যতো প্রবল হবে, প্রবাহ ততোই দুর্বল হয়ে পড়বে, এ-ধারণা সহজবোধ্য। উপমার সাহায্যে বুঝতে অসুবিধা হয় না, জলস্রোতের প্রখরতা একদিকে যেমন

নির্ভর করে প্রপাত-চাপের উপর অন্যদিকে তেমনি তা প্রতিহত হয় প্রতিরোধের জন্য। বিদ্যুৎ-প্রবাহের অনুকূলে থাকে বিভব-পার্থক্য আর প্রতিকূলে থাকে পদার্থের রোধ। ওহম সাহেবের সূত্রটি* সেই স্বাভাবিক অনুমানকে পরিপুষ্ট করে। তাঁর নাম অনুযায়ী বৈদ্যুতিক রোধের একক-কে বলা হয় 'ওহম'। এরূপ একক নির্বাচনের সরলার্থ, এক ভোল্ট পরিমিত বিভব-পার্থক্যে যদি এক আম্পিয়ার কারেণ্ট যায় তাহলে বুঝতে হবে বিদ্যুৎবাহী বস্তুটির রোধের পরিমাণ এক 'ওহম'।

বৈদ্যুতিক রোধ কিসের উপর নির্ভরশীল? পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কোনো পরিবাহী তার যতো লম্বা হবে ততই তার রোধ বাড়বে। আবার তারটি যতো মোটা হবে (cross-section যতো বেশী হবে) ততই কম হবে তার রোধ। তাছাড়া রোধ নির্ভর করে তারটি যে-পদার্থ দিয়ে নির্মিত তার উপর।** উদাহরণস্বরূপ, তামা (copper) অপেক্ষা এল্যুমিনিয়াম (aluminium) তারের রোধ প্রায় দ্বিগুণ। একই পদার্থনির্মিত তার যতো মিহি বা সরু হবে ততই তার রোধ-ক্ষমতা বাড়বে।

কোনো পদার্থের বৈদ্যুতিক রোধ ক্ষমতা শুধু যে পদার্থটির গুণধর্ম (resistivity) ও আয়তনাদির উভর নির্ভরশীল তা নয়। পদার্থটির তাপমাত্রার উপরেও তা নির্ভরশীল। সাধারণতঃ দেখা যায়, অধিকাংশ পদার্থের বেলায় তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটালে রোধ বা resistance-এর হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম আছে; কার্বনের তাপমান বাড়ালে তার রোধ কমে যায়। তাপমানের সঙ্গে বৈদ্যুতিক রোধের এরূপ পরিবর্তনের হার যদিও তেমন বেশী নয়, তথাপি এ দুয়ের সম্পর্ক বিশেষভাবে বিবেচ্য। তাপমান যদি খুব কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কি বৈদ্যুতিক রোধ খুব কমে যাবে? এমন অবস্থা কি হতে পারে যখন সেই রোধ প্রায় শূন্যে গিয়ে দাঁড়াবে? বাস্তব পরীক্ষায় দেখা গেছে, এ ঘটনা ঘটে। পারদ −২৬৯°C নিম্নতাপমানে রোধশূন্য হয়ে যায়, সীসা −২৬৬°C-এ অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় ঐ অবস্থাকে বলা হয় superconducting stage.

---

* অঙ্কের ভাষায় $I=\frac{V}{R}$

যেখানে I=current strength in ampere (প্রবাহ-প্রবাল্য)
V=p.d in volt (বিভব-পার্থক্য)
R=resistance in Ohm (রোধ)

** $R=\text{Const}\times\frac{l}{\alpha}$ (l=length, α=cross-section)

সাম্প্রতিককালে superconductor সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপী অনুশীলন চলছে। সীসা, টিন, ভানাডিয়ম ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর এবং কোনো কোনো alloy বা মিশ্রধাতুর এরূপ গুণধর্ম দেখে বৈজ্ঞানিকগণ ভাবছেন, এমন কোনো মিশ্রধাতুর সন্ধান পাওয়া যায় কিনা যেটি সাধারণ তাপমাত্রায় অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় অতিবাহী superconductor) হয়ে দাঁড়াবে। যদি সে-সন্ধান মেলে তাহলে বিজ্ঞানিগণ হাতে চাঁদ পাবেন, কেন-না, নিম্ন-তাপমান সৃষ্টির ঝামেলা এড়িয়ে সাধারণ তাপমাত্রাতেই তখন পাওয়া যাবে বিদ্যুৎ-প্রবাহের একটা অফুরন্ত উৎস, বিনা ক্ষয়ব্যয়ে পরিবাহিত হবে বিদ্যুৎ-শক্তি।

বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা গুণের স্বল্পতা বা আধিক্য অনুযায়ী পদার্থসমূহ চিহ্নিত হয়ে থাকে। যে-সকল পদার্থমধ্যে বিদ্যুৎ আদৌ প্রবাহিত হয় না সেগুলিকে বলা হয় non-conductor বা অপরিবাহী। শুকনো কাঠ, বাতাস, কাচ, চীনামাটি, রাবার, বেকেলাইট ইত্যাদি তার উদাহরণ। এইসব পদার্থ insulator নামে পরিচিত। যে-সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাদের নাম good conductor (বা শুধু conductor)। ধাতব পদার্থ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোনো conductor বা পরিবাহী বস্তুতে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করলে সেই বিদ্যুৎ নিমেষমধ্যে বস্তুটির সর্বগাত্রে ছড়িয়ে পড়ে। তাত্ত্বিক বিচারে অনুমিত হয় যে, ঐ পদার্থমধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন free বা স্বচ্ছন্দচারী অবস্থায় থাকে। সামান্যমাত্র বিভব-পার্থক্যে সেগুলি ধাবমান হয় এবং সেই কারণে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে। সুতরাং বুঝতে হবে, বিদ্যুৎ-পরিবাহিতার কারণস্বরূপ হচ্ছে পদার্থমধ্যে অবস্থিত free ইলেক্‌ট্রনসমূহের স্বচ্ছন্দচারিতা।

পরিবাহী ও অপরিবাহী ব্যতীত আরেক শ্রেণীর পদার্থ আছে যেগুলিকে বলা হয় semiconductor বা আধা-পরিবাহী। বিদ্যুৎবহন ব্যাপারে এদের আচরণ কোনো অবস্থায় পরিবাহীর মতো, কোনো অবস্থায় অপরিবাহীর মতো। লোহা, ইস্পাত, তামা, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি পরিবাহী পদার্থের তাপমাত্রা বাড়ালে তাদের রোধ (resistance) বেড়ে যায়। এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সিলিকন, জার্মেনিয়ম, সেলেনিয়ম ইত্যাদির বেলায় উল্টো ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ তাদের তাপমান বাড়ালে রোধ কমে যায়। অতি নিম্ন তাপমাত্রায় এদের রোধ এতো বেড়ে যায় যে, তখন এগুলি প্রায় অপরিবাহী হয়ে ওঠে।

কেন এমন ঘটে সে-বিষয়ে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, ঐসব পদার্থমধ্যে থাকে অসংখ্য covalent crystals যেগুলিতে

ইলেক্‌ট্রনসমূহ অতিশয় সুসংবদ্ধ। তাদের সহসা স্থানচ্যুত করা যায় না। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে তারা কিছুটা বন্ধনমুক্ত হয়ে আংশিকভাবে পরিবাহিতা সৃষ্টি করে। কোনো ক্রস্ট্যালমধ্যে ইলেক্‌ট্রনের স্থান-চ্যুতি ঘটলে তাদের অভ্যন্তরে যেন একটা **hole** বা ছিদ্র উপজাত হয়। ঐ ছিদ্রগুলির আচরণ বড়ই জটিল। তবু অনুমিত হয় যে, ইলেক্‌ট্রন-বিরহিত অবস্থায় ছিদ্রগুলি যেন পজিটিভ বিদ্যুতের এক-একটা উৎস।

বাইরে থেকে এহেন আধা-পরিবাহী পদার্থের উপর বিদ্যুৎ-বিভব প্রযুক্ত হলে আভ্যন্তরীণ ইলেক্‌ট্রনসমূহের কিয়দংশ (যেগুলি বন্ধনমুক্ত) চলমান হয়ে সৃষ্টি করে পারিবাহিতা, বিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম N-type **conductivity**। অপরপক্ষে ইলেক্‌ট্রন বিচ্যুতির ফলে সৃষ্ট ছিদ্রগুলি চলমান হয়ে তৈরি করবে পজিটিভ বিদ্যুতের একটি প্রবাহ যাকে বলা হচ্ছে P-type **conductivity**-র পরিচায়ক। এই দুই রকম প্রবাহের সংযুক্ত ফলের উপর নির্ভর করে পদার্থটির মোট পরিবাহিতা।

পদার্থসমূহের বৈচিত্র্যময় আচরণকে কাজে লাগানোর অপর নাম প্রযুক্তি। সেই বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে মানুষ কতো নব নব যন্ত্র-কৌশল উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছে, তার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে **transistor** প্রভৃতি নির্মাণে **semiconductor** সমূহের বহুল ব্যবহার।

প্রবাদবাক্য আছে, যথা প্রয়োজন তথা উদ্ভাবন, প্রয়োজনের তাগিদেই নব নব উদ্ভাবন। বর্তমান বিজ্ঞানপ্রগতির যুগে পদে পদে প্রয়োজন হয় **rapid calculation** বা অতি-দ্রুত হিসাবনিকাশ। এককালে একাজ সম্পাদিত হোত মনসাঙ্ক প্রক্রিয়ায়। মনই সেক্ষেত্রে কাজ করত যন্ত্রগণকের। কিন্তু সে-যুগ অতিক্রান্ত। কল্পনা করুন, এ-যুগের মহাকাশ অভিযান। দূরদূরান্তে অবস্থিত মহাকাশযানের সবকিছু নিয়ন্ত্রণকল্পে মুহুর্মুহু পাঠাতে হবে নানাবিধ সংকেত। বহুবিধ তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে নিমেষমধ্যে। গণনা হওয়া চাই সম্পূর্ণ নির্ভুল। সুতরাং **computor** বা যন্ত্রগণককে সম্পন্ন করতে হবে সেই জটিল কাজ।

যন্ত্রগণকের মূলকথা হচ্ছে এমন এক বৈদ্যুতিক কৌশল উদ্ভাবন বা **electronic device** যা দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে সংকেত জ্ঞাপন সম্ভবপর হয়। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, বৈজ্ঞানিকগণ একাজে অর্জন করেছেন অসাধারণ সাফল্য, যার মূলে আছে বিদ্যুতের তত্ত্বকথা ও তৎসম্পর্কিত জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরলস অনুশীলন।

১৩

বিজ্ঞান দর্শন

জড়পদার্থের গুণাগুণ, গতিপ্রকৃতি, গঠনতন্ত্র এবং অবস্থাভেদে তাদের বিভিন্ন আচরণ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে সায়েন্স, যাকে বাংলায় বলা হয় জড়-বিজ্ঞান। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের স্বভাবধর্ম ও বিচিত্র গুণাবলী সম্বন্ধে আহৃত তথ্যের ভিত্তিতে অনুরূপভাবে বিকাশলাভ করেছে সায়েন্সের অপর এক শাখা যার নাম জীবন-বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের এই দুই বিভাগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহুবিধ শাখা যথা ভূ-বিজ্ঞান, আকাশ-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি। শেষোক্ত বিজ্ঞানের পরিধি প্রায় অপরিসীম কেন-না, যে-সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত আমাদের পৃথিবী, তার মতো কোটি কোটি জগৎ ও তদতিরিক্ত বহু সত্তা মহাশূন্যে বিরাজমান। তাদের সকলকে নিয়ে মহাবিশ্ব। মানুষ তাদের সম্বন্ধে যথাসম্ভব জ্ঞানলাভে আগ্রহী। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সহায়ে, চর্মচক্ষে নিরীক্ষণের চাইতেও অনেক বেশী প্রত্যক্ষ অবলোকন সম্ভবপর হয়েছে। অভিনব বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশল জ্যোতির্বিজ্ঞানকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধতর করেছে।

জড়জগৎ ও জীবজগৎ সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্যভিত্তিক জ্ঞানার্জনের মধ্যে চমৎকারিত্ব নিশ্চয় আছে, তবু একথা মানতে হবে যে বস্তু ও প্রাণী সম্পর্কে নিরীক্ষণ-পরীক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ। মানুষের সবচেয়ে নিকটস্থ যে মন, যে বুদ্ধিবৃত্তি, যে সচেতনতা তার রাজ্য সুবিস্তৃত এবং অনেকাংশে অপরিজ্ঞাত। তাদের অস্তিত্বের প্রকাশভঙ্গি বড়ই বিচিত্র! চিন্তন, অনুভূতি ও সংকল্পাদির বহিঃপ্রকাশ যথেষ্ট জ্ঞানোদ্দীপক সন্দেহ নেই, তবু এ-সবের গভীরে যেটি ক্রিয়াশীল তার সন্ধান ও অনুশীলন কোনো অংশে কম থ্রিলিং বা রোমাঞ্চকর নয়।

কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে চিন্তাশীলতার উন্মেষের সময় থেকে মানুষের মনে এ-সব বিষয়ে জিজ্ঞাসার উদ্রেক হয়েছিল। বিভিন্ন যুগের মনীষিবৃন্দ আপন আপন বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী জীবপ্রকৃতি ও জাগতিক ঘটনা সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের চিন্তা-ভাবনা বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায় এক-একটি দার্শনিক মতবাদ রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। কল্পনা-বিস্তার ও যুক্তিপ্রয়োগের মেলবন্ধনে গড়ে-ওঠা এইসব মতবাদের মূলে ছিল appearance থেকে reality-তে, বা আপাতদৃষ্ট থেকে বাস্তব সত্যে উপনীত হবার নিরন্তর প্রয়াস।

যথার্থ সত্য কী, শুধু জ্ঞানবিচার দিয়ে তাকে অবগত হওয়া যায় কিনা, চরম-সত্যকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভূতির সাহায্যে প্রকাশ করা যায় কিনা, এ-সব প্রশ্ন

দার্শনিকদের মনকে বারংবার আলোড়িত করেছে। পদার্থের গুণধর্ম সন্ধানে নিয়ত বৈজ্ঞানিকগণকে এ-সব মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই সায়েন্স ও ও ফিলসফির মধ্যে একটা নৈকট্য আপনা থেকেই এসে পড়েছে। সম্ভবতঃ সেই কারণে তাদের নামকরণে সাদৃশ্য, সায়েন্স অর্থে to know এবং ফিলসফি অর্থে sophia philos বা জ্ঞানপ্রিয়তা।

ভারতীয় দর্শনের চিন্তাধারা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। সেই সূত্রে পরা ও অপরা বিদ্যার পার্থক্য স্পষ্টীকৃত। কোন্ বস্তুটি সুবিদিত হলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয় এ প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলেছেন 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে······পরা চৈবাপরা চ।'* চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, এ-সবই অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। 'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে' অর্থাৎ যে-বিদ্যা দিয়ে 'অক্ষর'কে জ্ঞাত হওয়া যায় তার নাম পরাবিদ্যা। উক্ত উপনিষদের পরবর্তী সূত্রে অক্ষর শব্দের তাৎপর্য নিরূপিত। সেটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য ইত্যাদি। অথচ সেটি নিত্য, সর্বব্যাপী, সুসূক্ষ্ম, অব্যয় এবং ভূতবর্গের কারণ। মনে হতে পারে, এতগুলো বিশেষণে লক্ষণাক্রান্ত ঐ 'অক্ষর' একটা অনুমান মাত্র। কিন্তু ঐ সূত্রের শেষাংশে বলা আছে, যে বিদ্যার সহায়ে ভূতবর্গের কারণকে 'পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ' অর্থাৎ বিবেকীরা সর্বতোভাবে দর্শন করেন, তাই হচ্ছে পরাবিদ্যা। এখানে 'পরিপশ্যন্তি' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এরই অপর নাম বিজ্ঞান। সুতরাং সায়েন্স হচ্ছে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞান বা ঐহিক জ্ঞান। আর বিজ্ঞান হচ্ছে অপরোক্ষ জ্ঞান (অনুভূতিপ্রযুক্ত জ্ঞান) যা দিয়ে জগৎ-প্রপঞ্চের মূলীভূত কারণ জানা যায়। তাই, ভারতীয় দর্শনে বিজ্ঞান নামক শব্দটির দ্যোতনা অতীব গভীর। সায়েন্স বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝে থাকি, বিজ্ঞান আদৌ তার সমার্থক নয়। তথাপি এরূপ পারিভাষিক প্রচলন সমর্থনযোগ্য হতে পারে যদি দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি সহায়ে আধুনিক বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্যকে কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত করে নেওয়া যায়।

দর্শন চিন্তা ও বিজ্ঞানচিন্তার মধ্যে এরূপ একটা সমন্বয় সাধন করতে, অথবা দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈজ্ঞানিক মূলনীতিসমূহের মূল্যায়ন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন একাধিক চিন্তাবিদ্। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ লেখকবৃন্দ এ-বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছিলেন অনেকখানি। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানও কম নয়। উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণ-স্পন্দন ও অভিঘাত-সচেতনতা আবিষ্কারপূর্বক বিজ্ঞানের মধ্যে একটা দার্শনিক উপলব্ধি জাগাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

---

* মুণ্ডক উপনিষদ—১/১/৫

বিজ্ঞান-সচেতন যুগে দার্শনিক দৃষ্টিবোধ সহায়ে জীবন ও পরিবেশকে প্রত্যক্ষ করতে কাব্য ও সাহিত্য যে কতো উপযোগী হতে পারে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রচিত সাহিত্যে বিজ্ঞানের তত্ত্বাবলী চমৎকার ভাবে অনুপ্রবিষ্ট। কি পরমাণুবাদ, কি মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব, কি বিবর্তনবাদ, কি তরঙ্গ-তত্ত্ব অবলীলাক্রমে প্রবেশ লাভ করেছে তাঁর কবিতাবলী ও প্রবন্ধগুচ্ছে। বিশ্বপ্রকৃতির উদার উন্মুক্ত অঙ্গনে কোনো-কিছুর তো 'প্রবেশ নিষেধ' থাকতে পারে না। সুতরাং সায়েন্স সাহিত্যক্ষেত্রে অপাংক্তেয় হয়ে থাকবে কেন? রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকবর্গের কাছে এ-সব কথা অবিদিত নয়। 'বিশ্ব পরিচয়' নামক গ্রন্থের উপসংহারে এই নবচেতনার ইঙ্গিত প্রদান করেছেন তিনি অতি সুন্দরভাবে।

দর্শনের ইতিহাস বড়ই সুখপাঠ্য। জীব ও জগৎ সম্বন্ধে কে কি ভেবেছেন, আপন আপন যুক্তিজাল বিস্তারপূর্বক সত্যানুসন্ধানের পথে কে কতোটুকু অগ্রসর হতে পেরেছেন তার ইতিবৃত্তে রচিত হয় চমৎকার এক sequence বা চিন্তা-ক্রম। প্রাচীন যুগে বৈজ্ঞানিকদের তুলনায় দার্শনিক বা তাত্ত্বিকদের সংখ্যা ছিল বেশী। কেন-না, পরীক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান অবলম্বনে বিজ্ঞানচর্চার সম্ভাব্যতা সে-যুগে ছিল কম। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিজ্ঞানের উন্মেষ তখন আদৌ ঘটেনি। ঘটেছিল নিশ্চয়, নতুবা atomic theory-র পথিকৃৎ জন ডাল্টনের নামের সঙ্গে গ্রীক দার্শনিক Democritus (খৃষ্টপূর্ব ৪৬০-৩৭০)-এর নাম উচ্চারিত হয় কেন? অনুরূপভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন Pythagoras। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত গণিতবিদ্, তাঁর নামাঙ্কিত theorem (উপপাদ্য) জ্যামিতিতে সুবিদিত, তাঁর গণিত-চিন্তা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বিশ্ব-প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি ধারণা উপস্থিত করতে। সেগুলির মধ্যে দু-একটি যথেষ্ট দূরদর্শী, কেন-না, আধুনিক বিজ্ঞানদর্শনের বীজ তাতে নিহিত ছিল বলা চলে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের এই গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতের প্রত্যয়সূচক কয়েকটি অনুমান। তন্মধ্যে একটির মর্মার্থ, জাগতিক যা-কিছু তা সবই সংখ্যা দিয়ে প্রকাশিত, নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত।*

মনে হতে পারে, এ এক গণিতবিদের অতিশয়োক্তি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়ে বিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্বসমূহের আলোকে যখন দেখা যায়, পদার্থের গুণাবলী ও গঠনতন্ত্র চিহ্নিত হয় এক-একটি সংখ্যা দিয়ে (যার নাম atomic number), পরমাণুমধ্যে অবস্থিত ইলেকট্রনের বৈশিষ্ট্য কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী

* Pythagoras : All is number, that is, all things of the world consist of numbers. Number is the form by which the constitution of things is determined. It is also their substance and matter.

—World Philosophy, Vol II—Swami Satyananda

ব্যাখ্যাত হয় চতুর্বিধ মৌলিক সংখ্যা দিয়ে (যাদের বলা হয় quantum numbers) তখন নিশ্চয় বলে উঠতে পারি, সাবাস পিথাগোরাস, ধন্য তোমার দূরদর্শিতা !

পিথাগোরাস অনুমান করেছিলেন পরস্পর বিপরীত গুণযুক্ত দশটি category-র কথা। এটি দর্শনে doctrine of opposites নামে খ্যাত। জোড়-বিজোড়, সসীম-অসীম, এক-বহু, দ্বৈত-অদ্বৈত, দক্ষিণ-বাম, আলোক-অন্ধকার ইত্যাদি বিরুদ্ধধর্মী সত্তার অবতারণাপূর্বক তিনি বলতে চেয়েছিলেন, প্রকৃতিরাজ্যে সব-কিছু এরূপ বিরুদ্ধযুগলের সমাহারে গঠিত। জাগতিক ঘটনাসমূহের অন্তর্নিহিত ঐক্য বা harmony of nature আজ বহুজন-স্বীকৃত হলেও সে-যুগে এটি ছিল দার্শনিকের কল্পনাবিলাস মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে যখন দেখি পদার্থ-সমূহ বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন ইলেক্‌ট্রন ও পজিট্রনের খেলায় মত্ত, অথবা তরঙ্গমাত্রই উচ্চাবস্থা ও নিম্নাবস্থার চঞ্চলতা, এবং anti-particle ও anti-matter-এর ধারণা বিজ্ঞান-বহির্ভূত নয় তখন কি মনে পড়ে না পিথাগোরাসের কথা ? মনে কি হয় না, দর্শনচিন্তা অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানচিন্তার জনক ?

যাই হোক সে-যুগ অতিক্রান্ত, যখন জ্ঞানার্জনের মুখ্য অবলম্বন ছিল কল্পনা-বিস্তার। পরবর্তী যুগে পরীক্ষণ বা experimentation প্রাধান্য পেয়েছে ঐহিক জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে। আর সেই সঙ্গে এসেছে বাস্তব যুক্তিপ্রয়োগের যুগ। অনেকে মনে করেন সে-যুগের সূচনা করেন Bacon (1561-1626)। তাঁকে বিজ্ঞান দর্শনের অন্যতম পথিকৃৎ বলা চলে, কেন-না, পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞানরাজ্যে facts বা আহৃত তথ্যরাজি থেকে laws বা নিয়মসূত্রের উপনীত হবার পথপ্রদর্শক তিনি।

বেকন সাহেবের প্রায় সমসাময়িক দুই চিন্তাবিদের নাম উল্লেখযোগ্য এই প্রসঙ্গে। তাঁরা হলেন Galileo (1564-1642) এবং Descartes (1596-1650)। প্রথম জনের নাম দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবনের সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয় জন Cartesian coordinate system বা স্থানাঙ্ক নিরূপণ পদ্ধতির আবিষ্কারকর্তারূপে গণিত-শাস্ত্রে পরিচিত। এঁরা দুজনেই ছিলেন গণিতবিদ্। তাঁদের ধারণা ছিল প্রকৃতি পরিচয়ের প্রকৃষ্ট অবলম্বন হচ্ছে গণিত। গ্যালিলিও সাহেব ভাবতেন, the entire system of creation is mathematical অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি-প্রকরণ গাণিতিক নিয়মে আবদ্ধ। ডেকার্টে ভাবতেন, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনা কতকগুলো mechanical laws দ্বারা যন্ত্রবৎ পরিচালিত।

বিজ্ঞান দর্শনে এই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রারম্ভ গ্যালিলিও-ডেকার্টের যুগ থেকে,

একথা বলা চলে। স্যার আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) বল, ভরবেগ, শক্তি ইত্যাদি গাণিতিক ধারণার রূপকার। তাঁর উদ্ভাবিত মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব প্রকৃতিরাজ্যের অনেক ঘটনাকে গণিতসূত্রে আবদ্ধ করে। শুধু গণিতজ্ঞ নয়, পদার্থবিদ্যাবিশারদ রূপেও তিনি বিখ্যাত। তাঁর প্রতিভাবলে বহু তথ্য প্রাকৃতিক নিয়মসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল সত্য, তথাপি একথাও বুঝতে হবে যে, যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অত্যধিক আসক্তির ফলে সে-যুগে বিজ্ঞানচিন্তায় যে একদেশদর্শিতা উপজাত হয়েছিল তার নিরসনকল্পে বৈজ্ঞানিকগণকে নূতনতর পথের সন্ধানে ব্যাপৃত হতে হয়েছিল নিশ্চয়।

অনিবার্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানচিন্তায় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এককালের নিশ্চয়াত্মক মতবাদ পরবর্তী কালের নবাবিষ্কৃত তথ্যের ধাক্কায় পরিত্যক্ত, এ-ঘটনা বিজ্ঞানে বারংবার ঘটেছে। তাতে দুঃখিত বোধ করার কিছু নেই, কেন-না, সত্যানুসন্ধানের পথে ভ্রান্তি-বিমোচনের জন্য যখনই ধারণা-সংশোধনের প্রয়োজন হয় তখনই সে-পথে এগিয়ে যাওয়ার নাম প্রগতি। নিউটন নিজে এ-বিষয়ে যথেষ্ট নিরহঙ্কার ছিলেন। জ্ঞানসমুদ্রের তীরে এসে উপলখণ্ডমাত্র সংগ্রহ করেছি, তাঁর এই বিনম্র উক্তি যথার্থই জ্ঞানিজনোচিত।

পদার্থবিদ্যায় গণিত-প্রয়োগের সাফল্য নিউটন-যুগে বিজ্ঞানচিন্তায় অগ্রগতি অনেকখানি ঘটিয়েছিল। এখন প্রশ্ন ওঠে, এই গণিত-প্রয়োগের উপযুক্ততা কতোটুকু? অর্থাৎ সত্যাসত্য নির্ণয়ে অঙ্কের দৌড় কতদূর? প্রশ্ন দুটি মৌলিক। সুতরাং দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার কিঞ্চিৎ বিচার-বিবেচনা আবশ্যক। পদার্থ-বিদ্যায় গণিত-প্রয়োগের প্রক্রিয়া প্রধানতঃ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত।

(১) কোনো physical concept বা বস্তুগত ধারণাকে mathematical concept-এ বা আঙ্কিক ধারণায় রূপান্তরিত করা।

(২) আঙ্কিক সত্তাগুলির মধ্যে সম্পর্কাদি নিরূপণপূর্বক তার উপর অঙ্কপাত করা।

(৩) আঙ্কিক ফলসমূহকে পুনরায় physical concept-এ পরিণত করা ও তা থেকে বাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

শেষোক্ত পর্যায়ের নাম interpretation—সঠিক অর্থ নিরূপণ। বিজ্ঞানীদের কাছে এটাই সমধিক মূল্যবান। দ্বিতীয় পর্যায়ে কোনো গোলমাল নেই। কেন না, সেখানে বিশুদ্ধ গণিতের সূত্রাদি অবশ্যই প্রযোজ্য। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে অনেক অনুমানের ভিড়। তাছাড়া আছে approximation ও averaging অর্থাৎ একটা মোটামুটি অথবা গড় ধরে নেবার ব্যাপার। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, একটা পাত্রে আবদ্ধ গ্যাসের কথা। Kinetic theory অনুযায়ী প্রথমেই একগুচ্ছ অনুমান।

গ্যাসীয় অবস্থায় পাত্রস্থিত পদার্থটির অসংখ্য অণু যেন এক-একটি গতিশীল জড়বিন্দু, যাদের অবস্থান আছে অথচ আয়তন নেই। প্রচণ্ডভাবে তাদের মধ্যে collision বা ঠোকাঠুকি হচ্ছে। পাত্রটির গাত্রে বারংবার ধাক্কা লাগায় একটা চাপ সৃষ্ট হচ্ছে। ধাক্কা লাগার আগে ও পরে অণুগুলি সরলপথে ধাবমান। ধাক্কার পর তাদের ভরবেগের কোনো অপব্যয় হয় না, ইত্যাদি। সবই ঘটছে যেন একটা আদর্শ পরিস্থিতিতে। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, এতোগুলি অনুমানের নির্গলিত অর্থ হচ্ছে বস্তুগত ধারণাসমূহকে আদর্শ ধারণায় পর্যবসিত করা। এই কাজ করতে গিয়ে যতটুকু approximation-এর আশ্রয় নিতে হয় ও বাস্তব থেকে বিচ্যুতি ঘটে ততটুকুর প্রতিফলন ঘটে গণিত-প্রয়োগের লব্ধি বা ফলাফলে।

প্রকৃতিবিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলা পরিজ্ঞাত হবার জন্য গণিতের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় কিন্তু এ-বিষয়ে গণিতের সীমাবদ্ধতার কথাও মনে রাখতে হবে। সকল সত্তাকে আঙ্কিক সত্তায় পরিণত করা যায় না। যেটুকু পারা যায় ততটুকু দিয়েই গণিত-প্রয়োগের সম্ভাব্যতা। এ নিয়ে ক্ষুণ্ণবোধ করার কিছু নেই। কেন-না, জ্ঞান অনন্তপ্রসারী। শুধু পরিমাপযোগ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। স্থান ও কালের বোধ-নির্ভর পরিমাপ দিয়ে যে ঐহিক জ্ঞান অর্জিত হয় তা বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কতোটুকু! যতোটুকু জানা যায় ততটুকুই হৃষ্টমনে গ্রহণপূর্বক ভাবতে হবে ততঃ কিম্। ধারণা প্রসারিত করার পর যদি আরো কিছু পাওয়া যায় উত্তম কথা। যদি না পাওয়া যায় তাহলে ঐ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণে রেখে দার্শনিক অনুভূতির পথে অগ্রসর হতে হবে।

মহামতি আইনস্টাইন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্। তিনি ছিলেন একাধারে গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তাঁর আপেক্ষিকতাতত্ত্ব (theory of relativity) বিজ্ঞানজগতে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল। বাস্তব পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই-করা এই তত্ত্ব অনুসরণপূর্বক বহু বৈজ্ঞানিক নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। আজও করে চলেছেন। তাঁদের চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে একীকৃত হয়েছে। আইনস্টাইন স্বয়ং বিশ্বাস করতেন, 'without the belief in the inner harmony of our world, there could be no science' অর্থাৎ বিশ্বের অন্তর্নিহিত ছন্দোবদ্ধতার উপর বিশ্বাস (বা আস্থা) না থাকলে কোনো বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন, তত্ত্ববিচার সহায়ে (তাঁর ভাষায় theoretical construction দিয়ে) বস্তুজগৎকে জানা যায়। এই বিশ্বাসের অপর নাম দার্শনিক প্রত্যয়। Outer harmony দেখে আমরা উল্লসিত হই, গজ ফিতা দিয়ে তাকে মাপতে অগ্রসর হই, কিন্তু inner harmony-র আনন্দ আস্বাদ পেতে হলে দর্শনের গভীরে ডুব দিতে হয়, আত্মজ জ্ঞানের বা intuition-এর আশ্রয় নিতে হয়। এই বিশ্বাস ও জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সেতুবন্ধনের ভিত্তিভূমি।
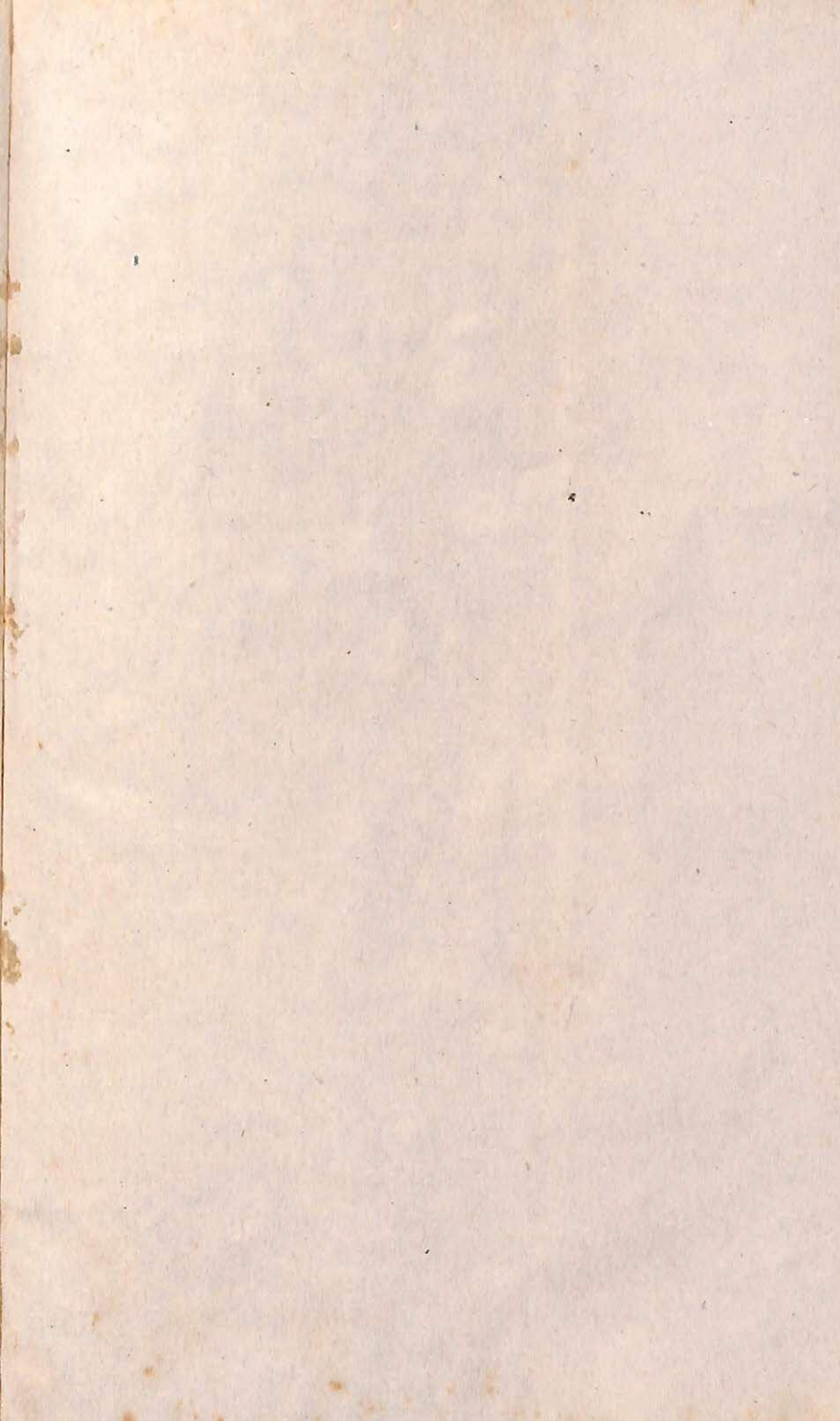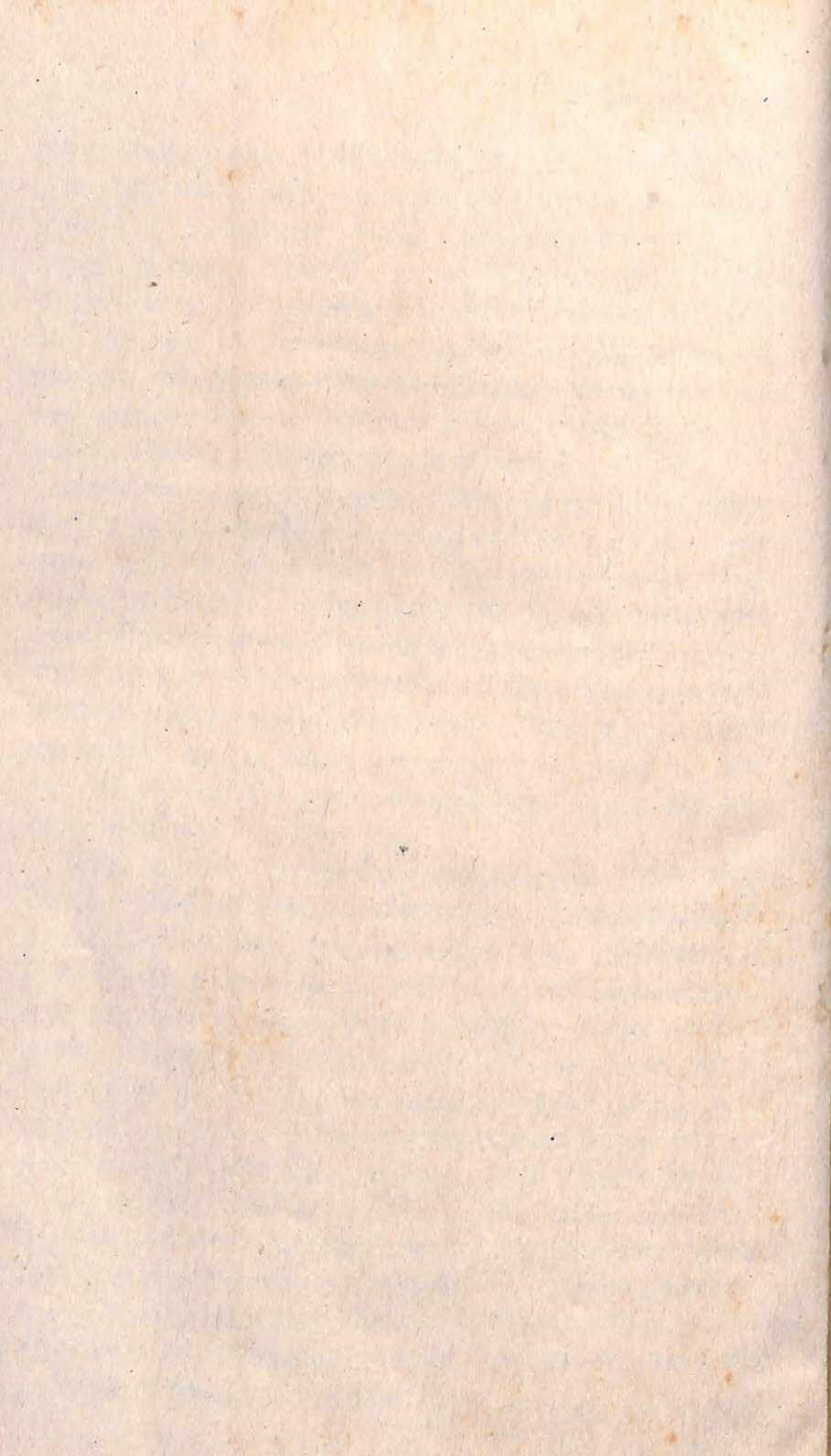
জ্ঞানসম্পুট গ্রন্থমালা

সম্পাদনা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের আয়ু পরিমিত, জ্ঞান সীমাহীন। তাই সাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞান, রসতত্ত্ব, শৈলীবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, লোকসংস্কৃতি, অর্থনীতি, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়কে সাধারণ পাঠকের গোচরীভূত করার অভিপ্রায়ে স্বল্পপরিসরের মধ্যে এই পুস্তিকাগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং দুরূহ ও চিন্তাগ্রাহ্য বিষয়কে রসসংবেদ্য করে তোলার দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

১. ভাষাবিজ্ঞানের গোড়ার কথা—ড. মোহিতকুমার রায়
২. সাহিত্য-তত্ত্বের কথা—ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
৩. বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভূমিকা (১ম খণ্ড)—ড. সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৪. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার চার দশক—শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য
৫. শৈলীবিজ্ঞান—ড. অপূর্বকুমার রায়
৬. সাহিত্য-আন্দোলনের কথা—ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
৭. লোকসংস্কৃতির কথা—ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়
৮. সহজ কথায় বিজ্ঞান—অধ্যাপক সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩